Unicode PDF Version 1.

শাহবাগ থেকে হেফাজত

রাজসাক্ষীর জবানবন্দি

শাহবাগ থেকে হেফাজত

রাজসাক্ষীর জবানবন্দি

জিয়া হাসান



আদর্শ ॥ ২০১৪

শাহবাগ থেকে হেফাজত: রাজসাক্ষীর জবানবন্দি

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪২০, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

প্রকাশক ॥ মামুন অর রশিদ

আদর্শ ॥ ১৭৬ ফকিরের পুল ঢাকা ১০০০

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র ॥ ৩৮ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

(০১১৯১ ২৩২৭৭২/৪, ০১৭১২ ২৯১৬৪৪

প্রচ্ছদ ॥ মামুন হোসাইন

ব্যবস্থাপনা ॥ খাইরুল ইসলাম, আদর্শ সার্ভিস

মুদ্রণ ॥ শিহাব উদ্দিন কর্তৃক আদর্শ প্রিন্টিংস

বাংলাদেশে মুদ্রিত ও বাঁধাইকৃত

মূল্য ৪০০ টাকা

Shahbag Theke Hefazat : Rajsakkhir Jabanbandi

(collection of social-political critics)

by Zia Hassan

Published by Mamun Or Rashid of Adarsha

176 Fakirerpool (3rd floor), Motijheel, Dhaka-1000

https://www.adarshabd.com

e-mail adarshabd@gmail.com

First Published February 2014

Price Tk. 400 :: US$ 20

ISBN 978 984 8875 83 4

উৎসর্গ

আমার জন্মদাত্রী মাতা এবং জন্মদাতা পিতা
যারা আমাকে শিখিয়েছেন শর্টকাট রাস্তায় কিছু অর্জনের চিন্তা
না করতে এবং চিন্তায়, কথায় এবং কাজে সৎ থাকতে।

এবং আমার স্ত্রী ইফফাত, সন্তান যুগভেরীকে
যাদের অনেক অনেক, অনেক, অনেক, অনেক আত্মত্যাগ
এবং কেড়ে নেয়া সময়ের বিনিময়ে এই বই

সূচি

ভূমিকা

এই বইয়ের নামটা হয়তো ভুল। এই নামকরণের প্রধান কারণ আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এইটার নাম হতে পারত 'ফেসবুক থেকে যেভাবে শাহবাগকে দেখেছি' অথবা 'একজন বাংলা পরীক্ষার দিন অর্থনীতি পরীক্ষা দিতে চাওয়া শাহবাগীর চোখে শাহবাগ এবং হেফাজত' জাতীয় কোনোকিছু! কিন্তু একবার যখন হাতে নিয়েই ফেলেছেন বইটা, কিনে ফেলুন, নিয়ে বাসায় যান, বাসায় গিয়ে পড়েন। অনেক মোটা বই, বুকস্টলে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ ধরে পড়লে দোকানি রাগ করতে পারে এবং আপনাকে গালিও দিতে পারে। সামনাসামনি হয়তো দেবে না কিন্তু চলে যাওয়ার পরে দেবে বা মনে মনে দেবে! আর খেয়াল রাখবেন, বই কিনে কেউ কখনও দেউলিয়া হয় নাই!

বইটা আপনি কেন পড়বেন?

কারণ, এই বইয়ে আমি সজ্ঞানে একটাও মিথ্যা কথা বলি নাই, এই জন্যে। আমার ফেসবুকের লেখাগুলোকে বানান ভুল ঠিক করা বা অল্প কিছু সংযোজন ছাড়া তেমন কোনো ক্রিটিকাল কাটাছেঁড়া করি নাই।

যার ফলে সেই সময়ে ওই ইস্যুগুলোর যে পারস্পেক্টিভ ছিল সেটাই আপনি দেখতে পারবেন। এবং তার সাথে আজকে ২০১৪ সালে এসে, আজকের প্রেক্ষাপটে, ২০১৩ সালে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে কিভাবে দেখতে পাচ্ছি তারও ব্যাখ্যা পাবেন একই জায়গায়। ফলে সেই সময়কার প্রেক্ষাপট এবং আজকের প্রেক্ষাপটে সেই সময়কে কেমন লাগছে এই দুটোই আপনি মিলিয়ে দেখতে পারবেন।

ফলে আপনি এই বইটাকে ইতিহাস বই হিসেবেও ব্যবহার করতে পারবেন এবং একই সাথে ইতিহাসের ব্যাখ্যা হিসেবেও পড়তে পারবেন।

যদিও আদ্যপাদান্ত মূল ইস্যু হচ্ছে অ্যানালিসিস। এবং অ্যানালিসিসের বিপদ হচ্ছে, অ্যানালিসিস একটা ব্যক্তিগত বিষয়। আমার অ্যানালিসিসের সাথে আপনার ভাবনা মিলবে না। যেখানে মিলবে সেখানে আপনি মারহাবা দিবেন, যেখানে মিলবে না আপনার মনে হবে, 'আরে, এই শালা তো একটা দালাল!'

এই জন্যে, আমি আগে থেকেই কিছু লোককে অনুরোধ করতে চাই এই বই না পড়তে। এবং পড়লেও টাকা দিয়ে কিনে না পড়তে, কারণ, পয়সা খরচ করে পড়লে আপনার ক্ষোভ বেশি হবে।

কে কে এই বইটা কিনে পড়বেন না

আপনি যদি মনে করেন, ৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কোন গণহত্যা হয় নাই বা পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার সাথে জামায়াতে ইসলামীর কোন সম্পর্ক নাই, সেক্ষেত্রে এই বইটা পড়ে আপনার মনঃকষ্ট হতে পারে। এটা আপনার না পড়াই ভালো। কেনা তো অনেক দূরের বিষয়।

আপনি যদি মনে করেন, শাহবাগের গণজাগরণ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ধরনের বিক্ষোভ এবং সংঘর্ষের সময়ে পুলিশের গুলিতে যেভাবে মানুষ মারা হয়েছে সেটা ঠিক আছে এবং এই দেশকে শুদ্ধ করতে হলে আরো প্রায় দেড় থেকে দুই লাখ স্বাধীনতা বিরোধী মেরে ফেলতে হবে তাহলেও এই বইটা পড়তে গিয়ে আপনি পরতে পরতে ক্ষুব্ধ হবেন। ফলে এই বই পড়া আপনার একদমই ঠিক হবে না। কারণ জেনেশুনে নিজেকে টর্চার করাটা ঠিক না!

যাই হোক, পড়া যখন শুরু করেছেন তখন এটাও জেনে রাখা ভালো, শাহবাগ নিয়ে লিখছি বটে, কিন্তু আমি শাহবাগের ইনার সার্কেলের লোক না, এবং হেফাজতে ইসলাম সম্পর্কে আমার জ্ঞান এবং ধারনা ২০১৩ সালের বিভিন্ন পেপার পত্রিকা থেকে জানা।

আমি শাহবাগকে দেখেছি ফেসবুকে বিভিন্ন ব্লগারের নোটে এবং আলোচনায় এবং অল্প কিছু বন্ধুর সাথে কথাবার্তার ভিত্তিতে। এই বন্ধুদের অনেকেই শাহবাগের ইনার সার্কেলের সাথে ছিল বিভিন্ন পর্যায়ে। তাদের সাথে অল্প কিছু কথাবার্তায় যা শুনেছি তার ভিত্তিতে শাহবাগকে জানা আর বোঝার চেষ্টা করেছি।

আর হেফাজত-এ-ইসলামকে বোঝার চেষ্টা সম্পূর্ণই আমার পেপার পড়া আর

অবজারভেশন থেকে। এই বইটা মূলত শাহবাগকে নিয়ে বই। এই বইয়ে হেফাজতে ইসলামের প্রসঙ্গ এসেছে শাহবাগের ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হিসেবে। ফলে এই রিঅ্যাকশনারি শক্তির অ্যাকশন রিঅ্যাকশন এই বইয়ে আলোচিত হয়েছে। হেফাজতকে হেফাজতের ইতিহাস, হেফাজতে বিশ্বাস এবং অন্যসব এঙ্গেল থেকে আমি যাচাই করিনি।

শাহবাগের আমি বার কয়েক গিয়েছি। এবং সেই সময় এই বন্ধুদের কয়েকজনের সাথে দেখা হয়। প্রফেশনাল কারণে শাহবাগে দিনরাত্রি কাটানো আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুযোগ থাকলে অবশ্যই শাহবাগে দিনাতিপাত করতাম। কিন্তু দূরে থেকেও নোট এবং ব্লগ লিখে শাহবাগের সাথে আমি খুব ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল, শাহবাগের মূল প্রণেতাদের নামধাম দিয়ে, সবার ইন্টারভিউ নিয়ে সেইগুলো দিয়ে বিশাল গ্রন্থ রচনা করব। কিন্তু, আমার জীবনের অসংখ্য ফেইল প্রজেক্টের মধ্যে সেটা একটা। এটা করা হয়ে ওঠে নাই।

আমার সব চেয়ে বড় প্রবলেম, যেহেতু ডেইলি আমি শাহবাগে ছিলাম না, ফলে মঞ্চ কিভাবে হয়েছে এবং কে কিভাবে অপারেট করছে, কে মুখ্য ভূমিকায় ছিল সেটা সম্পর্কে ডিটেলস বলা আমার পক্ষে সম্ভব না। কিন্তু, শাহবাগ কিভাবে ডিসিশান নিত এবং কিভাবে শাহবাগের মূল ঘটনাগুলো ঘটেছে তা সম্পর্কে আমার আগ্রহ ছিল প্রচুর। আমার মনে হয়েছিল, শাহবাগ পুরো রাষ্ট্রকে পালটে দিচ্ছে।

আমি সামনাসামনি দেখি নাই বলে যে কিছুই দেখি নাই, তা কিন্তু না। বরং দূর থেকে শাহবাগের সাথে জড়িত বন্ধুদের ফেসবুকে স্ট্যাটাস, নিউজ পেপারের রিপোর্ট এবং অল্প কিছু বন্ধুদের সাথে কথা বার্তার সুবাদে আমি অনেক কিছু দেখেছি। তাছাড়া রেগুলার নোট লেখার সুবাদে অন্য লেখকদের সাথেও কমেন্টে বা মেসেজে আলাপ হত।

এটা হয়তো আমার একটা শক্তি। কারণ, কাছ থেকে দেখলে, আমার দৃষ্টি সীমিত হত, আবেগ তৈরি হত। চোখের সামনে ঘটা ছোট ছোট ঘটনাগুলো মনে হত আকাশের সমান বড়।

এটা নাকি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের ক্ষেত্রে হয়। একটা ট্রেঞ্চে রাইফেল হাতে ধরা সৈনিক, সারাদিন বসে চিন্তা করতে থাকে তাকে ঘিরেই যুদ্ধ। সেই এই যুদ্ধের

নেতা, প্রণেতা, তার উপরেই পুরো যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করে। কিন্তু বড় স্কোপ থেকে দেখতে গেলে, সেই যুদ্ধের আরো ২০,০০০ হাজার সৈন্যের মতো সে একজন রাইফেল-ধারী মাত্র।

তাছাড়া দূর থেকে দেখলে অনেক বেশি দেখা যায়। মনে করেন, পাহাড়ের উপরে একটা বনকে আপনি দেখছেন। সেই পাহাড়ের উপর থেকে আপনি দেখতে পাবেন বনের শুরু কোথায়, শেষ কোথায়, নদী কোথায়।

কিন্তু যদি কাছ থেকে দেখেন তাহলে দেখবেন, গাছ। এবং শুধুমাত্র সামনের সারির গাছকে পেরিয়ে ভেতরে কি আছে তা আপনি দেখতে পারবেন না। এটা দূর থেকে দেখার সুবিধা।

ফলে শাহবাগের ছোট ছোট ঘটনাবলি না দেখার কারণে হয়তো আমার সুবিধাই হয়েছে। আমি বিগার পারস্পেক্টিভ থেকে শাহবাগকে দেখতে পেরেছি। নিজের কার্যক্রমকে পুরো রাষ্ট্র-যন্ত্রের আলোড়নের মূল ঘটনা মনে করে ডিলিউশানড হই নাই। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব, এই ভ্রম শাহবাগের কিছু আয়োজকদের মধ্যে হয়েছিল। ফলে, হয়তো শাহবাগকে নিত্যদিন কাছ থেকে না দেখাতে আমি আরো নৈর্ব্যক্তিকভাবে আমার পর্যবেক্ষণগুলো করতে পেরেছি, হয়তো।

সেই ভিত্তিতেই আমার শাহবাগ নিয়ে ম্যাক্রো-অ্যানালিসিস। খেয়াল করবেন, এটা ইতিহাস-এর দিনপঞ্জি না। এটা অ্যানালিসিস। অ্যানালিসিস ভুল হতে পারে। কিন্তু দেখবেন আমি কিছু কনক্রিট এভিডেন্স দিব যার ভিত্তিতে আমার অ্যানালিসিসটা ভুল হওয়ার কথা না।

শাহবাগের গণজাগরণের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াতে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলিতে পরের এক বছরে নিম্নে ৫০০ এবং ঊর্ধ্বে ১,০০০ লোক-এর মৃত্যু এবং প্রায় ২০,০০০ লোক-এর উপরে মানুষ গুলিবিদ্ধ ও সংঘাতে আহত হয়। এবং বাংলাদেশের সমাজের মধ্যে একটা আদর্শিক বিভাজন আরও বিস্তৃত হয় এবং আওয়ামী লীগ সাফল্যের সাথে একটা জনশূন্য নির্বাচন করে বাংলাদেশের নেতৃত্বের দল পাল্টে দেয়ার ধারাবাহিকতা থেকে বেরিয়ে নতুন সরকার গঠন করে ২০১৪ সালের জানুয়ারি ৫ তারিখে। এইগুলোর দায় শাহবাগের নয়, কিন্তু প্রভাব নিশ্চয়ই আছে।

ফলে ফিউচার বাংলাদেশ এবং ইমেডিয়েট বাংলাদেশ উভয় ক্ষেত্রেই

শাহবাগের ভূমিকা ব্যাপক। এ জন্যে শাহবাগকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হবে। দুঃখজনক-ভাবে আমি যেমন চেয়েছি তেমন চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারিনি সময়ের কারণে এবং একই সাথে আমার অজ্ঞতার কারণে।

কিন্তু, আমি এই পর্যায়ে আবার ১০০% কনফিডেন্সের সাথে বলতে চাই, আমার অ্যানালিসিস ১০০% ঠিক সেটা আমি দাবি করছি না।

এটাও জানা প্রয়োজন, সঠিক রিসার্চ মেথড ব্যবহার করে, কোন মেথডিকাল এনালিসিস এই বইয়ে করা হয় নাই। এই বইয়ের বেশিরভাগ কথাবার্তা পারসেপটরি বা ধারণামূলক এবং আমার অবজার্ভেশনের ভিত্তিতে অ্যানালিসিস।

এইখানেও একটা বিপদ আছে। একজন মানুষ তার অ্যানালিসিস করে তার নিজস্ব ভিউ-পয়েন্ট থেকে। শাহবাগের ব্যাপারে আমার ভিউ হচ্ছে, শাহবাগ একটা অ্যান্টিএস্টাবলিশমেন্ট মুভমেন্ট যাকে এস্টাব্লিশ্মেন্ট শেষ পর্যন্ত দখল করে। এবং বর্তমান এস্টাব্লিশ্মেন্টের চালক হিসেবে সেই দায় আওয়ামী লীগের উপরেই বেশি বর্তায়। ফলে, আপনি আমার অ্যানালিসিসে এই ভিউটারই বিশ্লেষণ পাবেন। ফলে আপনার বিশ্বাস যদি হয় শাহবাগে শুধু বাংলা পরীক্ষা দেয়ার কথা আর কিছু করার কথা না, তাহলেও আমার অ্যানালিসিস আপনার কাছে আপত্তিকর ঠেকতে পারে। এই সমালোচনার মধ্যে থেকেও আবার একটা সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সেইটা হলো শাহবাগকে নিয়ে একটা মীথ দাড় করানো হচ্ছে যে, শাহবাগ আওয়ামী লীগের সাজানো বা ইন্ডিয়ার ষড়যন্ত্র সেইটাও আশা করি দূর হবে।

তবুও, কেউ যদি আমার ব্যাখ্যার কোনো অংশের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন, আমি অনুরোধ করব আমাকে সেটা জানান। আমার ফেসবুক আইডি www.facebook.com/zia.hassan.rupu

আমাকে মেসেজ করেন। বলেন, কোথায় ভুলটা হচ্ছে এবং সেখানে যদি আপনার সাথে আমার না মেলে আমি আপনাকে জানাবো। এবং সুযোগ সময় অনুসারে, আমরা দু'জনে মিলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হব, তার ভিত্তিতে শুধরে নেব দ্বিতীয় পর্ব, স্বীকারোক্তিসহ।

এই বইটা যেভাবে পড়তে হবে

এই বইয়ের মোট তিনটা পর্ব—

পর্ব ১. শাহবাগের প্রেক্ষাপট

পর্ব ২. শাহবাগের গণজাগরণ

পর্ব ৩. হেফাজতের উত্থান

এই তিনটি পর্বের মধ্যে সবচেয়ে বোরিং পর্ব হইল একদম শুরুর শাহবাগের প্রেক্ষাপট বা প্রি শাহবাগ স্টেজ (১৩-৫৮ পৃষ্ঠা)। এই পর্বে আছে—কিভাবে বাংলা ব্লগের ক্যাচাল থেকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পর্কে অনলাইনে সচেতনতা সৃষ্টি হইল। কিভাবে, সেলিব্রেটি ব্লগাররা যুদ্ধাপরাধের বিচারের ইস্যুটা মানুষের সামনে নিয়ে আসেন এবং জানুয়ারি ২০১৩ সালে কিভাবে শিবিরের সাথে পুলিশের সংঘর্ষে ধারাবাহিকতা ভেঙে হঠাৎ ফেব্রুয়ারি মাস থেকে পুলিশ আর শিবির ভাই ভাই হয়ে গেল এবং জনমনে সন্দেহ ঢুকল যে, সরকারের সাথে জামায়াতের আঁতাত হইছে। এই প্রেক্ষাপটে কাদের মোল্লার রায়ের পর শাহবাগ গণজাগরণ হইল। শাহবাগকে বুঝতে হলে, এইটা একটা জরুরি পার্ট। কিন্তু, এই পর্বে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যে অনেক ধরনের ব্যাখ্যা দেয়া হইছে যা আপনার বোরিং লাগতে পারে। এবং যদি বোরিং লাগে, তাহলে ডাইরেক্ট চলে যাবেন, দ্বিতীয় পর্বে।

দ্বিতীয় পর্ব: শাহবাগের গণজাগরণ (৫৯-১৫৯ পৃষ্ঠা)। এই পার্টটা আপনার ইন্টারেস্টিং লাগবে। বিফলে মূল্য ফেরত।

আর দ্বিতীয় পার্ট যদি আপনার ভালো লাগে, তৃতীয় পর্ব: হেফাজতের উত্থান (১৬১-২২৪ পৃষ্ঠা)। অংশে আপনি অটোমেটিক ঢুকে যাবেন।

আসুন, শুরু করি, শাহবাগ থেকে হেফাজত: রাজসাক্ষীর জবানবন্দি...

প্রথম পর্ব: শাহবাগের প্রেক্ষাপট বা প্রি-শাহবাগ স্টেজ

চ্যাপ্টার ১. বাংলা ব্লগের ক্যাচালের গল্প ও শাহবাগের জন্ম-কথা

শাহবাগের আন্দোলনকে কয়েকটি স্টেজে ভাগ করা যায়:

১. প্রি-শাহবাগ স্টেজ

২. স্ফুলিঙ্গ স্টেজ

৩. কনফিউশন-স্বাতন্ত্র্য স্টেজ

৪. মঞ্চ ক্যাপচার স্টেজ

৫. রাজীব হত্যার পর ফাঁদে পড়ার স্টেজ

৬. মাহমুদুর রহমানের কাউন্টার রেভোল্যুশান প্রোপাগান্ডা স্টেজ

৭. শাহবাগে সিটইন বিক্ষোভের সমাপ্তি স্টেজ

৮. কাউন্টার রেভলিউশান—সংঘাত স্টেজ

৯. কাউন্টার রেভলিউশান—দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর রায়ের পরে সংঘাত বৃদ্ধির স্টেজ

১০. রুমি স্কোয়াড: শাহবাগের ভেতরের ক্ষীণ প্রতিরোধের স্টেজ

এখানে আমরা শুরু করব প্রি-শাহবাগ স্টেজ থেকে

শাহবাগের গণজাগরণ হঠাৎ করে একদিনে হয় নাই। এর একটা প্রেক্ষাপট আছে। কাদের মোল্লার ফাঁসির রায় না হওয়ার বিষয়টা একটা ট্রিগার ইভেন্ট মাত্র। এবং এটা সত্যই ট্রিগার করা হয়েছে অনলাইন জগত থেকে। এই জন্যেই শাহবাগকে বলা হয়, ব্লগারদের অর্গানাইজ করা। ‘ব্লগার’ কি জিনিস সেটা বেশিরভাগ মানুষ শাহবাগের আগে জানত না। এবং বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষের লোকচক্ষুর অন্তরালে, অজান্তেই বাংলা সাইবারস্পেস জমে উঠেছিল। এবং এই জমাট বাঁধা সাইবারস্পেসে বেশ কয়েক বছর ধরেই চলে আসছিল বাংলাদেশের আদর্শিক রাজনীতির পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে তুমুল ক্যাচাল।

এই ক্যাচালগুলোর হাত ধরে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে কিছু ব্লগার। এই জনপ্রিয় ব্লগারদের অনেকেই মূলত শাহবাগ আন্দোলন গড়ে তোলার নেপথ্য কারিগর। এবং শাহবাগের উত্থানের (আর পতনের) সাথে বাংলা ব্লগের উত্থানের (আর

পতনের) ইতিহাসও জড়িত।

এইজন্যে শাহবাগের পর্যালোচনা করতে গিয়ে বাংলা ব্লগের জন্মের ইতিহাসটাও একটু সমঝে নেয়া দরকার।

বাংলা ব্লগের উত্থান হয়েছিল একটা প্রয়োজনের হাত ধরে।

আমাদের দেশে সবকিছুই গ্রিডে চলে। আপনি কিছু লিখতে চান, আপনাকে পেপার-পত্রিকায় কিছু মামা-চাচা-ভাই-ব্রাদারের সাথে পরিচয় থাকতে হবে। একটা বই বের করতে চান, আপনাকে চিনতে হবে প্রকাশনা সংস্থার লোকদের। ক্ষেত্র-বিশেষে ঢালার মতো কিছু টাকাও থাকতে হবে। সেই লিংক-আপ সবার থাকে না। কিন্তু ৫৫,৫৫৫ বর্গমাইল এলাকায় ১৬ কোটি মানুষের অনেক কিছু বলার আছে, অনেক ভাবনা শেয়ার করার আছে। এই ভাবনাগুলো প্রকাশ করার ইচ্ছা থেকেই বাংলা ব্লগের জন্ম এবং বেড়ে ওঠা।

বাংলাদেশে আইডিয়া মিথস্ক্রিয়ার স্পেসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ব্লগ। এখানে কোনো ভাই-ব্রাদার নাই, কোনো মামা-চাচা নাই। আপনাকে একটা লেখা দিয়েই সামনে আসতে হবে। এখানে কেউ জানবে না আপনার কত টাকা আছে, আপনার চেহারা সুন্দর না বদখৎ। আপনার যে লেখাটা পোস্ট করবেন সেই লেখার মেরিটেই আপনাকে যাচাই করা হবে। এবং এর ফলে যেটা হয়েছে, সময়ের সাথে বাংলা ব্লগ হতে কিছু ভালো লেখক বেরিয়ে এসেছে।

যদিও তাদের অনেকেই সময়ের সাথে সাথে হারিয়ে গেছেন, অনেকে বর্তমানে ইন্টেলেকচুয়াল স্পেসে যোগ করছেন নতুন ভাবনা। অনেকে পৃষ্ঠপোষকতা না পেয়ে ব্লগোস্ফিয়ার থেকে বেরোতে পারেন নাই। কিন্তু বাংলা ব্লগের মধ্যে একটা জিনিস সৃষ্টি হয়। তা হলো সেলিব্রেটি ব্লগার। সেলিব্রেটি ব্লগার হলো সেই ব্লগার যিনি তার লেখার মাধ্যমে মানুষের নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছেন এবং তার লেখা অনেকে অনুসরণ করে। এবং সেলিব্রেটি ব্লগার হলো সেই ব্লগার যিনি এখন ছাইপাঁশ লিখলেও ‘বস, জোশ হয়েছে!’, ‘সেইরাম হয়েছে!’ বলার মতো অনেক ভক্ত তৈরি হয়ে আছে। এই সেলিব্রেটি ব্লগারদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা হলো, যেহেতু তাদের লেখা অনেকেই ফলো করে সেহেতু তারা কোনো বিষয়ে কথা বললে তা আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, এ কারণেই ‘ট্রেন্ড সেটার’ হিসেবেও তাদের একটা ভূমিকা রয়েছে।

বাংলা ব্লগ কিন্তু পুরো পৃথিবীতে অনন্য। এখানে ব্লগিং কালচারটা গড়ে উঠেছে

কমিউনিটি কালচার ভিত্তিক। বাকি পৃথিবীতে, বিশেষত ইংরেজি ভাষায় জনপ্রিয় ব্লগাররা মূলত ব্যক্তিগতভাবে নিজের ফলোয়ার গড়ে তুলছেন। এবং তারা নিজের সাইটে ব্লগিং করেন।

যদিও পরবর্তীতে ফেসবুক জনপ্রিয় হওয়ার পর ব্যক্তিগত ব্লগগুলো জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু ফেসবুক ঠিক ব্লগ না, যদিও ফেসবুক থেকেও ব্লগিং করা যায়। যাহোক, ফেসবুক হোক আর কমিউনিটি ব্লগ হোক, ব্লগ মানেই ক্যাচালের জায়গা, তা সে সামু, আমু, নাগু, সচল, ফেবু যেটাই হোক।

ফলে ব্লগের একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো মিথষ্ক্রিয়া, ক্যাচাল আর নাগরিক মনের সাথে সংযোগ ঘটায় এমন সব ইস্যুর ব্যাপক প্রচারণা।

অনলাইন জগতের সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্লগ-সাইট ছিল সামহোয়ারইনব্লগ ওরফে সামু। বাংলা ব্লগের যারা প্রতিষ্ঠিত ব্লগার আছেন তাদের ৯০% কোনো না কোনো সময় সামুতে লিখতেন। সামুর জন্ম ২০০৬ সালে। ২০১২ সালের শুরুর দিকে সামুতে প্রায় ১ লক্ষ ব্লগার অথবা পাঠক রেজিস্টার্ড অবস্থায় ছিল।

সামু একটা মেইনস্ট্রিম ব্লগ। এখানে যে কেউ যে কোনো বিষয়ে লিখতে পারে। এবং ব্লগে যখনই একটা ক্যাচাল লাগত, এক পক্ষের ব্লগাররা দলবদ্ধ হয়ে বিপক্ষকে আক্রমণ শুরু করত। যেহেতু সামু ওপেন ব্লগিং প্ল্যাটফর্ম, সেহেতু এই আক্রমণ ঠেকানো যেত না। এই ব্যক্তি আক্রমণ এবং দলবদ্ধ আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে নির্দিষ্ট গ্রুপের লোকজন পরবর্তীতে নিজেদের জন্যে আলাদা ব্লগিং প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে। এগুলোর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হচ্ছে, সচলায়তন: অতি বাম ঘরানার ব্লগ, আমার ব্লগ: আওয়ামী ঘরানার ব্লগ, সদালাপ: ধর্মীয় মৌলবাদে বিশ্বাসীদের ব্লগ, মুক্তমনা: সেকুলারদের ব্লগ (আমি যত দূর জানি, সামুর আগের ব্লগ) এবং সোনার বাংলা: জামায়াত এবং ধর্মীয় গোঁড়াদের ব্লগ। এটা ছাড়াও আছে নাগরিক ব্লগ এবং চতুর্মাত্রিক এবং আরও কিছু ব্লগ। এসবও সামুর মতোই বারোয়ারী ব্লগ। যে কেউ যে কোনো কিছু লিখতে পারে। এর সাথে সাথে কিছু ইংরেজি ব্লগ ছিল যেগুলোর একটা নির্দিষ্ট শ্রেণির পাঠক ছিল।

২০০৯/১০ সালের দিকে ব্লগের সাথে আমার পরিচয় হয় সামুর সুবাদে। এর আগে পরিচয় ছিল, কিন্তু সেই পরিচয় এতো ঘনিষ্ঠ ছিল না। আমার কাছে মনে হয়েছিল, সামুর পুরনো লেখাগুলো বাংলা ভাষায় লেখা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য

আলোচনা। ব্লগারদের প্রিয় পোস্টে যে লেখাগুলো আছে সেগুলো খুঁজে খুঁজে আমি পড়তাম। বলতে দ্বিধা নেই, একসময় নিজে যে ধরনের লেখা পড়তে চাই বাংলা ভাষায় তেমন লেখার খোঁজ না পেয়ে বাংলা পড়ার প্রতি আমার আগ্রহ প্রায় হারিয়েই গিয়েছিল। ব্লগারদের প্রিয় পোস্ট ফিচারটার মাধ্যমে সামুর পুরনো লেখাগুলো আবিষ্কার করে আমার মনে হল, বাংলা ভাষায় পড়ার মতো কিছু থাকলে এটাই সেটা। কোনো একটা বিষয়ের ভাবনায়, বৈচিত্র্যে এই লেখাগুলো নিউজপেপারের বোরিং, চর্বিতচর্বণ থেকে অনেক বেশি আধুনিক, সমসাময়িক এবং আমাদের মধ্যবিত্ত শহুরে ভাবনার সাথে সাযুজ্য-পূর্ণ। আমি নিজে এই শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করি। স্বাভাবিকভাবেই আমি এমন কিছু পড়তে চাই যা আমার ভাবনা এবং সময়কে প্রতিনিধিত্ব করে।

২০১২ সালে এসে ব্লগগুলো ধীরে ধীরে তাদের কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলতে থাকে। কারণ সময়ের চাহিদা অনুসারে ব্লগগুলো তাদের তেমন কোনো টেকনিক্যাল উন্নয়ন ঘটায় নাই। আর ব্লগে এত বেশি লেখা আসত যে একজন ব্লগারের পক্ষে একটা লেখাকে সামনে আনা মুশকিল হয়ে পড়ে এবং অনেক সেলিব্রেটি ব্লগার ব্লগ ছেড়ে ধীরে ধীরে ফেসবুকের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ফেসবুকে তখন সাবস্ক্রিপশন নামে একটা ফিচার ছিল যেটা এখন ফলো হিসেবে পরিচিত। এই সাবস্ক্রিপশনের কারণে অনেক সেলিব্রেটি ব্লগার ধীরে ধীরে ব্লগ ছেড়ে ফেসবুকে অধিক সংখ্যক পাঠকের কাছে পৌঁছাতে শুরু করে। ফেসবুকের আর একটা সুবিধা হলো, এখানে ব্লগাররা তাদের ব্যক্তিগত পরিচয়কে বৃহত্তর কমিউনিটির সাথে কানেক্ট করানোর সুযোগ পায় এবং ব্লগারদের পরিবার ও বন্ধুবান্ধব তাদের লেখার সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়। এর ফলে অনেক ব্লগার ফেসবুকে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

তাছাড়া ব্লগে যে কোনো আইডিয়াকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়তে হয়। বিতর্কিত কিছু লিখলে যে কেউ সমালোচনা করতে পারে, ভুল ধরতে পারে। ফেসবুকে সেই ঝামেলা নেই। যারা সমালোচনা করে তাদের ব্লক করে দিলেই হলো। এবং সেলিব্রেটি ব্লগারদের একটা সমস্যা হলো, তাদের ফলোয়ার এত বেশি যে সবাইকে উত্তর দেয়া তাদের জন্যে মুশকিল হয়ে ওঠে। এবং নিজের লেখা নিয়ে এত ক্যাচাল করার আগ্রহও থাকে না তাদের।

ফলে, ২০১১ বা ২০১২ সালের দিকে এসে ব্লগের চেয়ে ফেসবুকে ব্যক্তিগত

ব্লগিং এবং গ্রুপগুলো জনপ্রিয় হতে থাকে। ফেসবুক সমমনাদের সাথে সংযোগের যে সুযোগ করে দেয় সেটা ব্লগে কোনোভাবে পারা যায় না। ফলে ফেসবুক ভিত্তিক বেশ কিছু গ্রুপ জন্ম নেয়, আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয় ধরনের। ব্লগের ভেতরের বা বাহিরের এই গ্রুপগুলোও নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার জন্যে দ্রুতই বিভিন্ন রকম ক্যাচালে জড়িয়ে পড়ে পূর্বের ধারাবাহিকতায়।

যদিও এতক্ষণ ধরে অনলাইন জগতের এত গুণগান গাইলাম কিন্তু অনলাইন জগতেও বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে ডিবেটে নিজের মতকে হেজিমনি বা সর্বসাধারণের মত হিসেবে প্রকাশ করা এবং বিপক্ষ মতকে সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয় হিসেবে দেখানোর একটা প্রবণতা ছিল। এখানে ব্যাপক গালি-গালাজ এবং চ-বর্গীয় শব্দ ব্যবহার করার একটা অশ্লীল প্রবণতা শুরু হয়। এটা তারা মুক্ত ব্লগে করার সুযোগ পান নাই। কারণ, সেখানে কিছুটা হলেও অ্যাডমিন কর্তৃক মডারেশন হয়ে থাকে। কিন্তু ফেসবুকে যেহেতু কোনো মডারেশন নাই, তাই যারা ব্লগ থেকে ধীরে ধীরে ফেসবুকে চলে যান তাদের মধ্যে কেউ কেউ এটার চর্চা আরম্ভ করেন। যার কারণে এই স্পেসটাও কলুষিত হয় এবং এই অভ্যাসটা এখনও অনেকে চালু রেখেছেন। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। এই চর্চা অনেক ক্ষেত্রে অনলাইন বিতর্কের মানকে অনেক নিচে নামিয়ে আনে।

যাই হোক, ব্লগের লেখাগুলো পড়তে গিয়ে বাংলা ব্লগের ক্যাচালগুলোর সাথে আমি পরিচিত হই, পরবর্তীতে যা ব্লগ ছাড়িয়ে ফেসবুকেও ছড়িয়ে পড়ে। আমার কাছে মনে হয়েছে, যদিও খুচরা আড্ডার মতো করেই ফেসবুকের স্ট্যাটাস এবং ব্লগে মানুষ নিজের মনের ভাব প্রকাশ করে তবুও এসব খুচরা আলোচনার একটা ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে।

কারণ, বাংলাদেশের মিডিয়ার বয়ান আমাদের দেশের জনমানুষের সমসাময়িক ভাবনার সাথে প্রাসঙ্গিক নয়। মিডিয়ায় সব কিছু ফিল্টার করা হয় এবং তারা কারো না কারো ন্যারেটিভ মেনে চলে, কারো না কারো স্বার্থ সিদ্ধি করে। নিউজপেপার হোক, ভিজুয়াল মিডিয়া হোক, এমন কি কর্পোরেট অনলাইন নিউজপেপার হোক প্রতিটি মিডিয়া একজন জনপ্রিয় সাংবাদিক-ব্লগারের ভাষায়, 'কারো না কারো খুঁটিতে বাঁধা'।

আমাদের মেইনস্ট্রিম মিডিয়ার ৯০ শতাংশই কালো টাকায় গড়া। ইন্টারেস্টিংলি

আপনি জানবেন, প্রতিটা পেপার যা আপনার হাতে পৌঁছায় তা কাগজের দামে একটা বড় অঙ্কের লস দেয়। এই লস নিতে পারে শুধুমাত্র কালো টাকার মালিকেরা। যদিও অল্প কিছু পেপার বিজ্ঞাপন দিয়ে সেই লস কাভার দেয় কিন্তু বেশিরভাগ পেপারই মূলত লসে চলে। এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দুর্নীতিবাজ শাসকেরা মডেলটা এমনভাবে সাজিয়েছে যে, কালো টাকা এবং খরচ করার মতো টাকা বা অতিরিক্ত টাকা না থাকলে কেউ কোনো পেপার বের করতে পারবে না। ফলে এখন বাংলাদেশের মিডিয়া ৯৯ শতাংশই ধান্দাবাজি অথবা কালো টাকার প্রতিনিধিত্ব করে। এই জন্যে এই ধান্দাবাজি বা কালো টাকায় গড়া মিডিয়া থেকে মৌলিক কিছু পাওয়া আমার কাছে অসম্ভব মনে হয়েছে। এই মিডিয়া তাই সবসময়ে একটা প্রো-এস্টাবলিশমেন্ট বয়ানকেই সামনে ধরে রাখে, এখনও রেখে যাচ্ছে এবং আগামীতেও রেখে যাবে।

তাছাড়া বাংলা ব্লগ অত্যন্ত কম্পিটিটিভ একটা জায়গা। এখানে একটা লেখা দিয়ে জায়গা করা এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করা খুব কঠিন কাজ। কথার কথা হিসেবে বলি, সামুতে একটা পোস্ট একসময় মাত্র ২ থেকে ৬ ঘন্টা ফ্রন্ট-পেজে থাকত। এই সময়ের মধ্যেই যদি আপনার লেখাটা বাকিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পারে, তো ধাক্কা মেরে আপনার লেখা পেছনে ফেলে অন্য কোনো লেখা চলে আসবে ফ্রন্টপেজে। আর আপনার লেখা হারিয়ে যাবে কালের গহীনে।

তাই একটা ভালো লেখাকে কমেন্ট দিয়ে, নির্বাচিত হয়ে, পছন্দের ব্লগ বা সহ ব্লগারদের মাধ্যমে অনুসরিত হয়ে সামনে থাকতে হয়। ফলে নিজেদের লেখার প্রতি অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে লেখকদেরকে নিজেদের মান বাড়াতে হয়েছে। এবং এর ফলে বাংলাদেশে যতপ্রকার প্রাসঙ্গিক ইস্যু আছে তার সবগুলো নিয়েই ব্লগে ভালো লেখা আসছে। যে ধরনের লেখা কখনোই কোনো নিউজপেপার বা অন্য কোনো মিডিয়াতে আসে নাই, বা এই ধরনের মুক্ত মতামত তারা প্রকাশও করতে পারবে না, তাদের খুঁটিতে বাঁধা রশির কারণে।

এই জন্যে আমার মনে হয়েছিল এই ব্লগ, এই ফেসবুকের খুচরা তর্ক-বিতর্কই আগামী বাংলাদেশকে মুক্তির পথ দেখাবে। অনেকে বলতে পারেন, এই বক্তব্যের মাধ্যমে আমি ফেসবুকের খুচরা আলাপ এবং ব্লগের এলেবেলে মানুষের ভাবনাকে গ্লোরিফাই করছি। কারণ, এক একটা ফেসবুক স্ট্যাটাস বা ব্লগের ভাবনা ৫ থেকে ২০০ বা খুব বেশি হলে ১,০০০-এর বেশি পাঠকের কাছে

পৌঁছে না (অবশ্য এখন পৌঁছাচ্ছে)।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, একই বিষয়ে অনেকের আলোচনার সামগ্রিক ইমপ্যাক্ট কম নয়। এটা অনেকটা এমএলএম মার্কেটিংয়ের মতো। আপনার ভাবনা ১০ জন শেয়ার করছে। তাদের ভাবনা আরো দশজন করে ১০০ জন শেয়ার করছে। এই ১০০ জনের ভাবনা ১,০০০ জন শেয়ার করছে। এই ১,০০০ জন আলোচনাটা শেয়ার করবে তাদের অফিসের কলিগ বা বন্ধুদের সাথে কোনো আড্ডায়।

ফলে কোনো ইস্যু যখন ব্লগ এবং ফেসবুকে মানুষের আগ্রহ তৈরি করে তখন তার দরুন একটা প্রেশার তৈরি হয়। এবং ইতোপূর্বে বেশ কিছু ইস্যুতে দেখা গেছে মেইনস্ট্রিম মিডিয়া ধান্দাবাজির জন্যে বা রাজনৈতিক ভাবে কাউকে খুশি করতে বা সেনসিটিভিটির কারণে বা পয়সা খেয়ে কোনো ঘটনা ধামাচাপা দিয়ে গেছে। কিন্তু ব্লগার, ফেসবুকার এবং অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টরা সম্মিলিতভাবে সমালোচনা করে, ইস্যুটা নিয়ে ক্রমাগত লিখে যাওয়ার কারণে এক পর্যায়ে মেইনস্ট্রিম মিডিয়া এবং নীতিনির্ধারকরাও সে ব্যাপারে সচেতন হতে বাধ্য হয়েছে।

এর মধ্যে সাম্প্রতিক দুটি ঘটনা হলো, পার্লার হাউজ পারসনা'র ভিডিও ফুটেজ কেলেঙ্কারি এবং ভিকারুন্নেসা স্কুলের শিক্ষক পরিমলের নারী নির্যাতনের ঘটনা।

ফলে অনলাইন স্পেসে যেভাবে আইডিয়ার মিথষ্ক্রিয়া ঘটে আমার মনে হয়েছে, এই চর্চার মধ্যে মধ্যে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে।

এবং আমার এই ভাবনাটাকে সত্য প্রমাণ করে দিয়ে অনলাইন ক্যাচাল নিয়ে আমার প্রথম লেখার মাত্র ৪ মাসের মধ্যে জন্ম নেয় শাহবাগ।

চ্যাপ্টার ২. ব্লগের ক্যাচাল—নাস্তিক বনাম তাবলীগ

ব্লগের ক্যাচাল নিয়ে আমার প্রথম সিরিয়াস লেখা ছিল নাস্তিক এবং তাবলীগ নিয়ে। এইটা পোস্ট করেছিলাম ২৮ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে। লেখাটা তখন আমি ইংরেজিতে লিখেছিলাম যেটা এই বইয়ে অনুবাদ করে দেয়া হয়েছে।

এই আলোচনায় আমি নাস্তিকদের উত্থানের কথা যেটা লিখেছি, তাকে কাউন্টার

করেছে যে গ্রুপ তাদের পরিচয়ে বলেছি যে, এরা মূলত তাবলীগ মনোভাব সম্পন্ন এবং শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্ত একটি গ্রুপ। এই গ্রুপটি জামায়াত-শিবিরকে পছন্দ করে না। এবং এরা সুযোগ পেলেই ইউরোপে মাইগ্রেট করে।

আজকে ২০১৪ সালে এসে এখন মনে হতে পারে এই লেখাটা জামায়াত-শিবিরকে রক্ষা করার স্পিরিটে লেখা। কারণ, ২০১২ সালের শেষ মাস থেকে আজকে ২০১৪ সালের বাংলাদেশ রাষ্ট্রে একটা মৌলিক পরিবর্তন এসেছে।

আজকে ২০১৪ সালে আমার অবজারভেশন হচ্ছে, ২০১৩ ছিল শহুরে মধ্যবিত্তের একটা বড় অংশের মধ্যে জামায়াত-শিবিরের প্রতি মৌন সমর্থনের উত্থানের বছর। কিন্তু ২০১২ সালের শেষ মাসে এসে আমার অবজারভেশন ছিল, শহুরে মধ্যবিত্তের মধ্যে জামায়াত-শিবির সাপোর্ট করাটা ছিল একটা চরম নিন্দনীয় ব্যাপার। এবং সেই সময়ে শহুরে মধ্যবিত্তের মধ্যে জামায়াত-শিবির এতই অনুপস্থিত ছিল যে, মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিত্বকারী বাংলা ব্লগের ক্যাচালে নাস্তিকতার ইস্যুটাকে কাউন্টার করত কেবল শহুরে মধ্যবিত্তের মধ্যে থাকা তাবলীগ ঘরানার লোকজন বা হিজবুত তাহরির টাইপের ছেলেপেলে যারা জামায়াত-শিবির সমর্থক নয়। অবশ্য তাদের মধ্যে জামায়াত সমর্থক-গোষ্ঠীও ছিল, কিন্তু আমার অবজারভেশনে তারা মেইনস্ট্রিম ছিল না।

এইটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অবজারভেশন। এই অবজারভেশনে আপনি একমত নাও হতে পারেন।

কিন্তু আমি আবার উচ্চারণ করছি, ২০১২ সালে জামায়াত-শিবির ছিল সমাজের মধ্যে সম্পূর্ণ ডিলেজিটিমাইজড বা অবৈধ একটা শক্তি। কিন্তু ২০১৩ সালের বিভিন্ন ঘটনাবলি বিশেষত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করতে গিয়ে জামায়াত-শিবিরের প্রতি সমর্থন বা সিম্পাথাইজ করার কাজটা অনেকটাই মেইনস্ট্রিম করে দিয়েছে সরকার।

তাই আমাদের একটু দেখতে হবে ২০১২ সালের শেষ দিকে কেন জামায়াত-শিবিরকে বিলীয়মান শক্তি হিসেবে দেখিয়েছিলাম এবং অনলাইন ক্যাচালে নাস্তিকদের কাউন্টার করার শক্তি হিসেবে জামায়াত-শিবিরকে না দেখিয়ে তাবলীগ বা হিজবুত তাহরীরকে দেখিয়েছিলাম। আমি তখন হেফাজতে ইসলামের নাম শুনেছি কিন্তু ধরে নিয়েছিলাম বাংলাদেশের অনেকগুলো ছোট ইসলামি দলের মধ্যে হেফাজতে ইসলাম ও একটি। সামাজিক বা রাজনৈতিক

শক্তি হিসেবে তাদের শক্তিশালী অবস্থানের কথা আমার জানা ছিল না। এর কারণ, বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে হেফাজতে ইসলামের শক্তিশালী অবস্থান আমার কখনই চোখে পড়েনি। কারণ, সেইটা কখনোই ছিল না।

মধ্যবিত্ত সমাজে জামায়াত-শিবিরের প্রভাব না থাকার কারণ কি তার ব্যাখ্যায় আমি প্রাথমিক ক্রেডিট দিয়েছিলাম প্রথম আলোকে, অন্য একটা লেখায়।

প্রথম আলোর প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬ সালে। প্রকাশের এক বছরের মধ্যেই পত্রিকাটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা নিয়ে শহুরে মধ্যবিত্তের ডি-ফ্যাক্টো মুখপাত্র হয়ে ওঠে। যুদ্ধাপরাধের বিচার এবং যুদ্ধাপরাধের জন্যে দায়ী দল জামায়াতের বিরুদ্ধে সবসময় সরব ছিল প্রথম আলো। ফলে ১৯৯৬ সাল থেকে ২০১০ সাল, এই ১৪ বছরে প্রথম আলো পড়ুয়া শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা জামায়াতে ইসলামীকে পরিষ্কারভাবে ঘৃণা করতে শিখে।

এখানে ব্যাপক ভূমিকা রাখে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির মুভমেন্ট। নির্মূল কমিটি যদিও ১৯৯৪ সালে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তুলতে সমর্থ হয়, কিন্তু আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় টার্ম ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত তেমন কোনো মুভমেন্ট করেনি তারা। বিশেষত ১৯৯৮ সালের জুনে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের মৃত্যুর পর তারা সম্পূর্ণভাবেই নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে। কিন্তু ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সেই আন্দোলনের অনেকগুলো সুদূরপ্রসারী প্রভাব ছিল।

তার প্রথম হচ্ছে শাহবাগের সংগঠক যেই জেনারেশান তাদের মধ্যে ঘাতক-দালালদের বিচারের ব্যাপারে সচেতনতা গড়ে ওঠে।

দ্বিতীয়টা একটু প্রচ্ছন্ন। নির্মূল কমিটির সাথে জড়িত সংস্কৃতিকর্মীরা অনেকেই পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশের প্রথম টেরেস্ট্রিয়াল নেটওয়ার্ক একুশে টিভি-র সাথে জড়িত হয়। একুশে টিভি বন্ধ করে দেয়ার পরবর্তীতে বিভিন্ন নতুন চ্যানেলেও সিনিয়র পর্যায়ে যোগদান করেন একুশে টিভির কর্মীরা। এর ফলে ভিজুয়াল মিডিয়া তার জন্মের পর থেকেই জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে সরব থাকে। এতে যে কালচারাল আবহ তৈরি হয় সেই প্রেক্ষাপটে জামায়াত-শিবিরের প্রতি সহানুভূতি নিয়ে বড় হওয়া শহুরে মিডল-ক্লাসের জন্যে অলমোস্ট অসম্ভব হয়ে ওঠে বলেই মনে করি।

এ ছাড়া, আওয়ামী লীগের প্রথম টার্মে জামায়াত এবং শিবির একটা সংগঠিত

অবস্থায় ছিল। দেশের বিভিন্ন হলে তাদের একটা শক্ত অবস্থান ছিল। যদিও যতদূর জানি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা কখনোই ঢুকতে পারে নাই। এবং তাদের রিক্রুটমেন্ট নেটওয়ার্ক ছিল অনেকদূর বিস্তৃত। দেশের শীর্ষস্থানীয় বেশ কিছু কোচিং সেন্টার ছিল মূলত জামায়াত এবং শিবিরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং নিয়ন্ত্রিত। বাংলাদেশ স্কুল পর্যায়ে রাজনীতি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে মূলত কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি ভর্তি কোচিং থেকেই রিক্রুট করত তারা।

সেই সময় শিবির একই সাথে দুটি গ্রুপ মেইনটেইন করত। একটা গ্রুপে থাকতো খুবই আদর্শিক এবং সমাজের আইডল হিসেবে পরিচিতি পাওয়ার মতো চারিত্রিক গুণাবলীসম্পন্ন কিছু মেইনস্ট্রিম কর্মী। এবং দ্বিতীয় গ্রুপটি ছিল অত্যন্ত নৃশংস আর্মস ক্যাডার। প্রথম গ্রুপ পরিচালনা করত সাংগঠনিক কার্যকলাপ এবং দ্বিতীয় গ্রুপটি চালাত হল দখলদারি আর শত্রু বিনাশের কাজ।

কিন্তু আওয়ামী লীগের প্রথম টার্মে শিবিরের এই নেটওয়ার্কগুলো ভেঙে দেয়া হয়। এ অবস্থান থেকে শিবির আর কখনই ভালোমতো উঠে দাঁড়াতে পারে নাই। এবং শিবির থেকে নিয়মিত ক্যাডার এবং কর্মী সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে জামায়াতও ধীরে ধীরে আগের চেয়ে সাংগঠনিক-ভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে।

কিন্তু ১৯৯৬ সালের পূর্বে ব্যাপারটা এই রকম ছিল না। শহুরে মধ্যবিত্ত সোশ্যাল স্পেসে জামায়াতের প্রতি সিমপ্যাথি, জামায়াত-শিবির সমর্থক জনগোষ্ঠী এবং শিবিরের কর্মীরাও ছিল বিরাজমান। তখন পেপার ছিল মূলত দুটি—ইত্তেফাক এবং ইনকিলাব। ইত্তেফাক ছিল মূলত বারোয়ারি নিউজপেপার। তাদের কোনো অ্যাকটিভিজম ছিল না, যেটা পরবর্তীতে প্রথম আলো এবং অন্যান্য পত্রিকার মধ্যেও দেখা যায়।

ইনকিলাব ছিল মূলধারার জিহাদি জোশের পেপার। প্যালেস্টাইন থেকে কাশ্মীর এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জিওনিস্টদের মুসলিমবিরোধী যে যুদ্ধ চলে আসছে তার বিরুদ্ধে অত্যন্ত অ্যাকটিভ ছিল ইনকিলাব। এবং একইসাথে সূক্ষ্ম ও প্রকাশ্য উভয় প্রকারেই যুদ্ধাপরাধী দল জামায়াতকে সিমপ্যাথাইজ করত ইনকিলাব।

সেই সময় এত টিভিও ছিল না এত এফএম রেডিও ছিল না। ফলে একটা মেইনস্ট্রিম নিউজপেপারের সাপোর্ট এবং তার সাথে ব্যক্তিগতভাবে সৎ এবং পরিশ্রমী কর্মীদের দলীয় কার্যক্রমের কারণে আরবান মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে

জামায়াত এবং শিবিরের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

কিন্তু আগেই বলেছি ১৯৯৬ সালের পরে জামায়াত এবং শিবির দুর্বল হতে থাকে। এবং ২০০০ সালের পরে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, নিউ মিডিয়া এবং প্রথম আলোর অব্যাহত অ্যাকটিভিজমের প্রভাবে জামায়াত-শিবিরের প্রতি সমর্থন সমাজ থেকে বিলীন হয়ে যেতে থাকে।

ফলে ২০১২ সালে এসে যখন সাইবার স্পেসে ক্যাচাল নিয়ে লিখতে বসি তখন নাস্তিকতাকে কাউন্টার করতে যে এনটিটিগুলো দেখি তারা শহুরে আরবান মিডল ক্লাস, যার মধ্যে অনেকে হয়তো তাবলীগ, অনেকে আবার হিজবুত তাহরীরের সাথে সংযুক্ত এবং বেশির ভাগ অংশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট এনটিটি। কিন্তু জামায়াত-শিবিরের কর্মীদের সেভাবে দেখিনি। আমি দেখতে পেলাম নতুন প্রজন্মের ইসলামিস্টরা জামায়াতকে তার যুদ্ধাপরাধী ভূমিকার জন্যে ঘৃণা করে। এবং ঘৃণাটা সে প্রায় ১৫ বছরের সচেতন প্রচেষ্টায় করতে শিখেছে। এবং জামায়াতকে পলিটিক্যাল ইসলামের প্রধান প্রতিনিধি দল হিসেবে আবিষ্কার করে অ্যাপলিটিক্যাল বা অরাজনৈতিক ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং এই জন্যে তাবলীগের অনুসারী বা সমর্থক হয়েছে, অথবা ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্যাল বা র‍্যাডিক্যাল ইসলামিক মুভমেন্ট-এর সাথে নিজেকে জড়িত করেছে বা করতে চেয়েছে। আবার সেটাও খুব ভালোভাবে করতে পারেনি তারা, কেননা, এক পর্যায়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়ে যায় বাংলাদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী আন্তর্জাতিক র‍্যাডিক্যাল ইসলামিক মুভমেন্ট—হিজবুত তাহরীর। ফলে অনেক ক্ষেত্রে নিজেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট সত্তা হিসেবে লোকাল সোশ্যাল, কালচারাল, ইসলামিক বোধগুলো একত্র করে একটা বিশেষ ব্রান্ডের গোঁড়া বাংলাদেশি বাঙালি মুসলমান হিসেবে আবির্ভূত হয় নতুন প্রজন্মের শহুরে মধ্যবিত্ত ইসলামিস্টরা।

চলেন আমরা লেখাটা পড়ি।

১। ভূমিকা: র‍্যাডিক্যাল নাস্তিকের আবির্ভাব এবং তাবলীগের সংগ্রাম

(প্রকাশ: ২৮ অক্টোবর ২০১৩)

Fault lines within our society–Story of the Epic Kechals in cyberworld.

পর্ব-১

আমাদের সমাজের বেশিরভাগ মানুষ বাঙালি বলে একজন ভেবে নিতেই পারে যে আমাদের মাঝে বর্ণ বা জাতিগত কোনো দ্বন্দ্ব নেই। আমরা সবাই জানি যে, সামাজিক অবস্থানে বিভিন্ন বিভক্তি থেকে সমাজে কিছু বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু এই বিভাজনগুলো আদর্শিক নয়। যেমন, শহুরে না গ্রাম্য, কুল না ক্ষ্যাত, বড়লোক না গরিব, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের সমাজে খুব স্বাভাবিকভাবেই ধর্মভিত্তিক বিভাজন রয়েছে কিন্তু, এই পরিচয়গুলোকে ছাপিয়ে বাঙালি পরিচয় একটা অদৃশ্য সুতার বন্ধনে আমাদের সবাইকে আবদ্ধ করে।

এর মধ্যে বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমান তার ধর্মীয় আইডেন্টিটি এবং বাঙালি আইডেনটিটি নিয়ে একটা ভারসাম্য সৃষ্টি করে নিয়েছে। এইটা ভালো বোঝা যায় জাতীয় পত্রিকায় একজন আরেফিন রুমি দুইজন স্ত্রী নিয়ে বীরের ভঙ্গিতে ছবি ছাপানোর পর সম্মিলিত বিরক্তি থেকে। যদিও ৮০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত দেশে ইসলামের নিয়মে প্রথম স্ত্রীর মত নিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করা যায় তবু এই নিরীহ ছবিটি প্রকাশ হওয়ার পরে সবাই একে কটাক্ষ করেছে। এটি এসেছে আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি থেকে যেখানে ধর্মে অনুমতি দিলেও একাধিক বিয়েকে কখনই রুচিশীল হিসেবে দেখা হয়নি।

এই উদাহরণ অনেকের কাছে পছন্দ না হলেও স্বীকার করতেই হবে যে, অদৃশ্য এক বাঙালি পরিচয়ের সুতায় আমরা সবাই বাঁধা। এখানে বলে রাখা ভালো যে, আমাদের দেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে, তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় রয়েছে যা বাঙালি পরিচয় থেকে আলাদা। তাদের এই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য দেশ হিসেবে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছে। এবং সেই পরিচয়কেও আবার এক সুতোয় বাধে, আমাদের বাংলাদেশি সত্তা।

কিন্তু এই সাম্য থাকা সত্ত্বেও আপনি যদি ব্লগগুলো এবং ফেসবুকের সাধারণ মানুষের স্ট্যাটাস আপডেট দেখেন তাহলে খেয়াল করবেন আমরা এখন জাতি হিসেবে ক্রমাগত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছি। যদি রাস্তায় কারো সাথে কথা বলেন বা কোনো আড্ডায় অংশগ্রহণ করেন তাহলে দেখবেন একই সুতায় বাঁধা এই বিশাল জনগোষ্ঠীর মাঝে একটা চরম বিভক্তির রেশ দেখা দিয়েছে। বাঙালি এবং ইসলামিক পরিচয়ের মাত্রা, যুদ্ধাপরাধীর বিচার, সামাজিক মূল্যবোধ, রোহিঙ্গাদের প্রতি মনোভাব, অর্থনৈতিক অবস্থান, ড. ইউনুস এবং মাইক্রোক্রেডিট, আ.লীগ-বিএনপি এই সবগুলো নিয়েই আমরা ধীরে ধীরে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাচ্ছি।

যদিও আরেফিন রুমির দ্বিতীয় বিয়েকে ধিক্কার দিতে অধিকাংশকেই একমত দেখা যায়।

প্রতিনিয়ত এই বিভক্তির চিহ্ন গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। অনেকের কাছেই এর মাত্রা অত্যন্ত চরম, তারা তাদের বিরোধী গ্রুপের কাছ থেকে তাদের মতের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক—কোনো কথাই শুনতে রাজি নয়। একপক্ষ অন্যদের এতটাই বিপরীতে যে তারা তাদের প্রতিপক্ষের দেশাত্মবোধ শূন্য এবং তাদের দেশদ্রোহী বলে বিবেচনা করে।

তাদের মতে এই দেশদ্রোহীদের দেশ থেকে বিতাড়ন করা উচিত এবং তাদেরকে নিজ নিজ মতাদর্শের উৎসস্থলে পাঠিয়ে দেয়া উচিত।

এই বিভক্তি একুশ শতকের মোকাবেলায় একক জাতিসত্তা হিসেবে দেশের উন্নয়নের পথে বাধা বলেই মনে হয়।

মজার ব্যাপার হচ্ছে একই দলের মাঝে আবার দেখা যায়, এক একজন বিভিন্ন ইস্যুতে বিভিন্ন মতাদর্শ সমর্থন করছেন। এবং একই পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন ইস্যুতে এক এক জন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান নিচ্ছেন। এখান থেকে বোঝা যায়, এই বিভক্তি কেবল নিজস্ব মতাদর্শের ওপর ভিত্তি করেই তৈরি করা, কোন জাতিগত পরিচয় বা সামাজিক অবস্থান থেকে এই পার্থক্যগুলো গড়ে ওঠেনি। সমাজের মানুষের মাঝে বৈচিত্র্য এবং একাধিক মতাদর্শ থাকলে সেটা দেশের জন্যে ভাল, কিন্তু কেউ যদি তার মতের ব্যাপারে চরমপন্থি অবস্থান অবলম্বন করেন তা অবশ্যই আমাদের বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য, বাঙালিয়ানা এবং বাংলাদেশি চেতনাকে হুমকির মুখে ঠেলে দেবে।

এই গ্রুপগুলোর বেশিরভাগই এখন ইন্টারনেটে বেশ সক্রিয়। নিজের নামকে লুকানোর সুযোগ থাকার কারণে ইন্টারনেটে অনেকেই গোপন পরিচয় দিয়ে তাদের মত দ্বিধাহীন ভাবে প্রকাশ করতে পারছে যা হয়তো আবদ্ধ, দমনমূলক এবং প্রতিক্রিয়াশীল সমাজে সম্ভব হত না। আমার এই লেখায় আমি দ্বন্দ্বগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করব। এর মধ্যে যারা ইন্টারনেটে ব্লগ, ফেসবুক এবং অন্যান্য গণমাধ্যমে এ নিয়ে কথা বলেন তাদের উপরেই ফোকাসটা থাকবে। কিন্তু এই পর্যবেক্ষণ পুরো সমাজের জন্যেই প্রযোজ্য কারণ ইন্টারনেট জগত দেশের সামগ্রিক জনসমষ্টির প্রতিনিধিত্ব করে।

র‍্যাডিক্যাল নাস্তিকের আবির্ভাব

আমাদের সমাজে র‍্যাডিক্যাল নাস্তিক গ্রুপের আবির্ভাব খুবই সাম্প্রতিক ঘটনা। এই গ্রুপের লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচার-আচরণ পূর্ববর্তী নাস্তিকদের থেকে অনেকটাই আলাদা। ইতিপূর্বে মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান সমাজে নাস্তিক্যের মূলধারা এসেছিল কমিউনিজম এবং বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে। যারা ধর্মকে সমাজের বহু অশুভ কাজের জন্য দায়ী মনে করতেন। তাই তারা সমাজকে নতুনভাবে গড়ার জন্যে ধর্মহীন সমাজের কথা বলতেন। কিন্তু তাদের একটা বৈশিষ্ট্য হলো তারা তাদের ধর্মহীনতা নিয়ে বেশি উচ্চবাচ্য করতেন না এবং খুব কম সংখ্যকই তাদের ধর্মীয় মতাদর্শ নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করতেন। তারা নিজেদের মানবধর্মের অনুসারী বলে পরিচয় দিতেন এবং বামপন্থী রাজনীতিতে বা সামাজিক একটিভিজম করে জীবন কাটাতেন। তাদের এই নাস্তিক অবস্থানটির কারণে কমিউনিজম ভিত্তিক বামপন্থা এখনও সামাজিক বাধার সম্মুখীন হয়ে রাজনীতিতে মেইনস্ট্রিম হতে পারছে না।

বর্তমান প্রজন্মের নাস্তিকদের বড় একটা অংশ আবার একটু প্রতিক্রিয়াশীল। তাদের মতাদর্শে এতটাই কঠোর যে, তারা নাস্তিকতা নিয়ে অত্যন্ত আগ্রাসী মনোভাব পোষণ করেন। প্রায়ই তারা এমন কট্টরপন্থীদের মতো আচরণ করেন যে অন্য কোনো মতাদর্শই তারা শুনতে নারাজ। বাংলা ব্লগের প্রথম জেনারেশান নাস্তিকদের মধ্যেও এই প্রবণতাটি দেখা দেয়নি। বাংলা ব্লগের প্রথম জেনারেশান নাস্তিকেরাও স্রষ্টার অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বা বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের জায়গাগুলোকে আক্রমণ করতেন। কিন্তু ২০১২ সালের শেষদিকে এসে আমি যে নাস্তিকদের আবিষ্কার করলাম তাদের মধ্যে অনেককেই দেখলাম অস্তিত্বে বিশ্বাসীদেরকেই তারা ক্রমাগত আক্রমণ করে এবং নবীদের জীবন নিয়ে অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ কথা বলে। সামাজিক সমস্যাগুলো তাদের কাছে গণ্য নয় এবং স্রষ্টার অস্তিত্ব নিয়ে যে আস্তিক এবং নাস্তিকদের মৌলিক বিতর্ক সেইদিকেও তাদের আগ্রহ নেই। তারা ধর্ম বিশ্বাসীদেরকে আক্রমণ করা এবং ধর্মের নবী রাসুলদের আক্রমণ করায় আগ্রহী। যদিও তারা সংখ্যায় অল্প কিন্তু বাংলাদেশের সামাজিক স্পেসে এই ধরনের লেখা আমাকে বিস্মিত করেছিল। কারণ, শুধু ধর্মীয় মৌলবাদী নয় বাংলাদেশের সামাজিক স্পেসের অধার্মিক মানুষের কাছেও তাদের এই ধরনের কথাবার্তা খুবই গর্হিত অপরাধ বলে

বিবেচিত হবে বলে আমার মনে হয়েছিল। এবং এইগুলো প্রকাশ হলে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হবে সেইটা ভেবেও আমি শঙ্কিত ছিলাম। স্বাভাবিক ভাবেই, তাদের মধ্যে অনেকেই গোপন নাম নিয়ে লিখত।

বাংলা ব্লগের প্রথম প্রজন্মের নাস্তিকদের একটা বড় সাফল্য হচ্ছে, ধর্ম নিয়ে মুক্ত আলোচনা করা যাবে না, এই প্রথাটি তারা সাইবার জগতে ভেঙে দিয়েছিলেন। ফলাফল কি হতে পারে জেনেও তারা ধর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে মুক্তভাবে প্রশ্ন তুলতেন এবং বিতর্কের সৃষ্টি করতেন। যদিও তাদের কিছু বর্ণনা অনেক ক্ষেত্রেই খুবই বিভ্রান্তিকর তবুও অনলাইন-বাংলাভাষীদের জগতটা 'বাক-স্বাধীনতায়' সহনশীল করে তোলার কৃতিত্বটা তাদের প্রাপ্য।

তাবলীগ-জামায়াত এবং ধর্মমনা মধ্য এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত

বাংলা ব্লগে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নাস্তিকদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা বা বিবৃতির প্রতিক্রিয়া দিতে দেখা যায় তাবলীগ জামায়াত বা ধর্মমনা শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের একাংশকে। এই গ্রুপের মানুষেরা বেশিরভাগই ধর্ম বিষয়ক বিভিন্ন ফোরাম, ইন্টারনেটের আনুষঙ্গিক সোর্স দ্বারা ধর্মীয়ভাবে স্ব-শিক্ষিত। এদের অনেকেই ছাত্র জীবনের শেষে এসে ধর্মীয় দিকে ঝোঁকা শুরু করেন। এরা মূলত প্রথম আলোর পাঠক (একক গ্রুপ হিসেবে এটি মধ্যবিত্ত সমাজের সবচেয়ে বড় অংশ), যারা ছাত্র জীবনে তুলনামূলক কম ধর্মীয় মনোভাব থেকে ধীরে ধীরে ধর্মীয় দিকে ঝুঁকতে থাকেন।

এর বিশাল একটি অংশ তাবলীগ জামায়াত, পুরো দেশেই যাদের কার্যক্রম বেশ ছড়ানো। তারা রাজনীতিমুক্ত ধর্মীয় মুভমেন্টে বিশ্বাসী। নাস্তিকদের করা ধর্মীয় মানহানি, কুৎসা, ইত্যাদির বিরুদ্ধে এদেরকেই সবচেয়ে বেশি সোচ্চার পাওয়া যায় বাংলা ব্লগে। বেশিরভাগ তাবলীগ এবং শিক্ষিত ধার্মিক মানুষ ওহাবি আন্দোলন, যা জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামি ছাত্র শিবিরের আদি মতাদর্শ, তা এড়িয়ে চলেন। এই গ্রুপের অনেকেই সমাজের প্রতিষ্ঠিত পরিবার থেকে এসেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে চাকরি করছেন। পশ্চিমাবিরোধী মনোভাবের জন্যও এরা পরিচিত, তবে সুযোগ পেলে এরা ঠিকই পশ্চিমে পাড়ি জমান। সামাজিক প্রেক্ষিতে ধর্মীয় অনুশাসনের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার নয়। তারা চান তাদের স্ত্রী বোরখা পরুক কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা তাদের

স্ত্রীদের জোরাজুরি করেন না। এরা বাঙালি এবং ধর্মীয় মতাদর্শের মাঝখানে আটকে ন এবং সারাজীবন আর এই দ্বন্দ্ব থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন না। তবুও বাংলা ব্লগে জামায়াত-শিবির বা তাদের সমর্থক একেবারেই ছিল না যে তা না। ছিল, অবশ্যই ছিল। কিন্তু, তারা মেনসট্রিম ছিল না। এবং সেটা ছিল সাইবার স্পেসে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্যাচাল, ছাগু-ভাদা ক্যাচাল।

চ্যাপ্টার ৩. ব্লগের ক্যাচাল—ছাগু ও ভাদা

ছাগু কি?

ছাগু একটা ব্লগীয় টার্ম। বাংলা ব্লগের যুদ্ধাপরাধী নিয়ে ক্যাচাল থেকে ছাগু শব্দের উৎপত্তি। যারা যুদ্ধাপরাধের জন্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সমর্থন করেন বা তাদের পক্ষে ক্যাচাল করেন তাদেরকে ‘ছাগু’ বলে গালি দেয়া হয়ে থাকে।

যদিও আমি বলেছি, ২০১২ সালের শেষ নাগাদ এসে বাংলা ব্লগে আমি জামায়াত-শিবির সমর্থকদের দুর্বল অবস্থায় পেয়েছি। বাংলা ব্লগ জনপ্রিয় হওয়ার প্রথম দিকে ব্যাপারটা অন্যরকম ছিল।

সামহোয়ারইনব্লগের জন্মের পরপরই জামায়াত সমর্থন করা এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে ক্যাচাল শুরু হয়। সেই সময় আলবদর নেতা কামরুজ্জামানের পুত্র ওয়ালি, ওয়ামিসহ অনেকেই সামুতে যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষে প্রচারণা শুরু করেন। এই ক্যাচালে সামুতে তর্ক-বিতর্ক জমে ওঠে। এই সময়ে, ত্রিভুজ নামের একজন ব্লগার যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে আলোচিত হয়ে ওঠেন। ত্রিভুজ নামের এই ব্লগারের কিছু লেখা টার্গেট করে বেশ কিছু পোস্ট এর মধ্যে ব্লগার অরূপ প্রথম একটি স্যাটায়ার ছড়া লিখে এবং ছবিসহ ব্লগ পোস্ট করে।

http://www.somewhereinblog.net/blog/arupblog/9677

এইটার প্রকাশ ২১ মে ২০০৬। ছড়ার সাথে নিচের ছবিটা দেয়া হয়।



এই ছিল ছড়াটা—

ছাগলাদ্য

রামছাগলের শিংয়ের গুঁতো খেয়েছি শৈশবে!
ভাবতে পারিনি কো ছাগল আবার দেখা হবে!!
বসে ছিলাম কীবোর্ড নিয়ে, কখন দেখি হায়
মনিটরের ভিতর বড় ছাগল দেখা যায়
বন্ধ করে পিসি, ফোনে ডায়াল করি আমি
সেথায় দেখি ছাগল আমার করছে যে ভাঁড়ামি
মনের দুঃখে টিভি খুলে হেলিয়ে দিয়ে গা!
তাতেও দেখি ছাগল নাচে, পাচ্ছে বাহবা!
রাত পোহালো, অফিস গেলাম, করব শুরু কাজ
বসের বদলে রামছাগলে ডিউটি করে আজ!
হেথায় ছাগল, হোথায় ছাগল, ছাগল সর্বময়
মনের দুঃখে চেঁচিয়ে বলি, রামছাগলের জয়।

এই ছড়াটি যুদ্ধাপরাধের সমর্থকদের ছাগল বা সেই ধরনের নামকরণের প্রথম ব্যবহারের নিদর্শন এবং এখান থেকেই ছাগু শব্দের উৎপত্তি যা পরে ব্লগারদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এবং যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষের লোকদেরকে রেফার করতে ছাগু শব্দটি ধীরে ধীরে ডিফ্যাক্টো গালি হয়ে ওঠে।

(তথ্য সূত্র: http://www.sachalayatan.com/suman/47877)

একটা কথা বুঝতে হবে, সামহোয়ার ব্লগের মডারেটররা ব্লগে অতিরিক্ত নোংরা ভাষা ব্যবহার করলে, সেই পোস্ট ডিলিট করে দিত। ফলে আলোচনার প্রয়োজনেই এমন কিছু গালি উদ্ভাবনের প্রয়োজন পড়ে যেগুলো মডারেটর

শাব্দিক অশ্লীলতার জন্যে আপত্তি করবে না। ছাগু সেই ধরনের একটা গালি। কিন্তু ছাগু শব্দটিকে একটা সময় খুব সেনসিটিভ গালি হিসেবে দেখা হত।

এই গালি খাওয়া মানে আপনি জামায়াত এবং যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষের শক্তি। এবং শহুরে মধ্যবিত্তের মধ্যে জামায়াত হয়ে যাওয়া একটা চরম আপত্তিকর সামাজিক অবস্থান। ফলে যুদ্ধাপরাধের শাস্তি-পন্থীরা যখন কাউকে ছাগু গালি দিত, তাদের জন্যে মান-সম্মান নিয়ে ব্লগীয় সমাজে টিকে থাকাই মুশকিল হয়ে দাঁড়াত।

এবং একবার যে ছাগু গালি খেয়েছে তাকে, মান-সম্মান থাকলে, ওই নিকটা চেঞ্জ করে অন্য নিকে আসতে হয়েছে। ব্লগে অনেকে মাল্টি নিক নিয়ে লেখার এইটাও একটা কারণ এবং মাল্টি-নিক অধিকারীরা এক এক জায়গায় এক ধরনের পারসোনালিটি মেইনটেইন করত।

ইন্টারেস্টিংলি এই ছাগু গালিটার আরো কিছু অপভ্রংশ দাঁড়ায়—যেমন ছুপা ছাগু, বাম ছাগু, কর্পোরেট ছাগু। এর মধ্যে ছুপা ছাগুটা সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। এর মানে হলো সে গোপনে জামায়াতের সমর্থক। কিন্তু সামনা সামনি দেখায় বিচার সমর্থন করছে। যদিও তার মূল উদ্দেশ্য যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষা করা।

ছুপা ছাগুটা, ছাগু থেকে আসা অত্যন্ত হেজিমনিক একটা গালি। ছাগু গালি একজনকে আইডেনটিফাই করে জামায়াত সমর্থক হিসেবে। কিন্তু ছুপা ছাগু ক্লিয়ার করে বলে দেয় আপনি কোনো অবস্থান থেকেই জামায়াতকে সিমপ্যাথি দেখাতে পারবেন না। এমনকি যদি তারা কোনো ধরনের অন্যায়ের শিকার হয় তাহলেও না। এটা স্বীকার করে নেয় যে, কোনোভাবে সামান্যতম জামায়াতকে সিমপ্যাথি দেখানো মানেই আপনি ডিলিজিটিমাইজড রাজাকার হয়ে গেলেন। এমনকি আওয়ামী লীগকে সমালোচনা করতে গিয়ে যদি কোনোমতে আপনার ভাবনায় জামায়াতের পক্ষের মনোভাব প্রকাশ পায় তাহলেও আপনি জামায়াত।

ছুপা ছাগু গালিটার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল। জামায়াতকে লেজিটিমাইজ করার জন্য ভিক্টিমহুড তৈরি করা একটা ট্যাকটিক হিসেবে ব্যবহার করত অনেকে। ফলে কেউ সিমপ্যাথি দেখালে কেন সে সিমপ্যাথি দেখালো সেটা খুঁজে দেখার জন্যে এই গালিটা উদ্ভবের প্রয়োজন পরে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে টার্মটার অপব্যবহার করা শুরু হয়।

২০১২ সালের শেষের দিকে, ছুপা ছাগু ছিল বহুল ব্যবহৃত গালি। ছাগু এবং ছুপা

ছাগু অত্যন্ত অপমানজনক অবস্থান। এবং অনলাইন ডিবেটে কেউ যদি কাউকে এই গালি দেয়, তাহলে সেটা তার জন্যে চ-বর্গীয় গালি খাওয়া থেকেও অনেক বেশি অপমানজনক হিসেবে গণ্য করা হত।

এইখানে একটু বলে রাখি। বাংলা ব্লগের বেশ কয়েকজন সেলিব্রেটি ব্লগার, এই ছাগু ফাইট করতে গিয়ে সেলিব্রেটি হয়ে ওঠেন। এই ছাগুদেরকে মোকাবেলা করার জন্যে শক্তিশালী কিছু ব্লগার এক হয়ে গঠন করেন, এ টিম। যারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ব্লগার ভাষায় ছাগু পিটাত। এই 'এ-টিম' তাদের দুর্দান্ত যুক্তি এবং উপস্থাপনার জন্যে বাংলা ব্লগের কিংবদন্তী হয়ে আছে। এই এটিমের আক্রমণের তোড়ে ব্লগ থেকে যুদ্ধাপরাধীদের সমর্থন ধীরে ধীরে অনেক কমে আসে। এবং বাংলা ব্লগে যুদ্ধাপরাধীদের সমর্থন একটি গর্হিত অবস্থান হিসেবে উপস্থাপিত হয়। যার ফলে নতুন জেনারেশানের অনেকেই যুদ্ধাপরাধের বিচারের পক্ষে প্রভাবিত হয়। ২০১২ সালে এসে বাংলা ব্লগে যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষের লোকজনদেরকে মিন মিন করতে দেখার অন্যতম কারণ এ-টিম।

ছাগু গালির কাউন্টার দেয়ার জন্যে উদ্ভব হয় যে গালি তা হচ্ছে, ভাদা। এর অর্থ ভারতের দালাল। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির যে পলিটিক্স সেখানে আওয়ামী এলিমেন্ট যাদের আছে, তাদের মধ্যে ভারত ভক্তি যেটা দেখা যায় সেই দুর্বলতাকে আক্রমণ করে ভাদা গালিটার উদ্ভাবন হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধপন্থীদের অনেকের আওয়ামী দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে মূল তর্ককে ৭১ সাল থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ভারত-বাংলাদেশ টার্ফে এনে ফেলা হত কারণ, এই টার্ফে তাদের হারানো সহজ ছিল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধপন্থীর মধ্যে যারা আওয়ামী লীগার না তাদের মধ্যে এই ট্রেন্ডটা আর এক ধরণের দেশবাদী অবস্থান তৈরি করতে সাহায্য করেছিল। ভারতকে নতুন শোষক এবং ভারত-প্রেমীদের আর এক ধরণের রাজাকার হিসাবে চিহ্নিত করার মাধ্যমে ভারত প্রেমকে রাজাকার প্রেম সমতুল্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এই টার্মটার মাধ্যমে।

তাছাড়া এই ক্যাচালটা যে সময় চলছে তার বড় একটা সময় ধরে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায়। এই সময়ে বেশ কিছু ইস্যুতে যেমন, তিতাস নদীর উপর বাধ দিয়ে ভারতীয় দ্রব্য এক্সপোর্ট, ট্রানজিট, রামপালসহ অনেক ইস্যুতে সরকারের ভারত-পন্থী আচরণ, ফেলানির মৃত্যু, বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশি

যুবকের উপর টর্চার, এই সব ইস্যুতে আওয়ামী সমর্থক গোষ্ঠীর অনলাইনে নীরবতা এবং ডিফেন্সিভ মনোভাব তাদেরকে এই গালি খাওয়ার সুযোগ করে দেয়।

এই আলাপগুলো কেন করলাম?

কারণ শাহবাগের জন্মের একটা প্রেক্ষাপট আছে। অনলাইনে ছাগু-ভাদা ক্যাচাল এবং যুদ্ধাপরাধ নিয়ে অনেক ক্যাচাল ছিল। এবং এই ক্যাচালগুলোই অনলাইনের কর্মী এবং অ্যাকটিভিস্টদের মধ্যে যুদ্ধাপরাধের বিচার সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে দেয়। কারণ অনলাইনের সবচেয়ে বড় গোষ্ঠী হচ্ছে পাঠকরা যারা কিছু লেখে না, কিন্তু পড়ে। ব্লগ পড়ে, ফেসবুক স্ট্যাটাস পড়ে। কিন্তু কোনো কমেন্ট দেয় না। এরা সাইলেন্ট মেজরিটি। অনলাইনের ক্যাচালগুলো এই বিশাল সাইলেন্ট মেজরিটির মাইন্ড সেট গড়তে বিশাল ভূমিকা রাখে।

মানুষ স্বাভাবিকভাবেই যে কোনো ঝগড়া হলে দাঁড়িয়ে দেখে। এটা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। ফলে যাদের যুদ্ধাপরাধের বিচার নিয়ে তেমন কোনো মাথাব্যথা নাই তারাও অনলাইনের এই ক্যাচালগুলোর সাথে জড়িত হয়, বা না হলেও ক্যাচাল-গুলোয় কে কি বলছে তা খেয়াল করে। এবং ছাগু-ভাদা, গালাগালি, গলাগলি এইসব ইস্যু নিয়ে মধ্যবিত্ত অনলাইন কমিউনিটির মধ্যে যুদ্ধাপরাধের বিচার নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে একটা বিশাল সচেতনতা সৃষ্টি হয় শাহবাগ সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে। বিশেষত ২০১২ সালে যখন থেকে বিচার নিয়ে আওয়ামী লীগ সিরিয়াসলি 'মুভ' শুরু করে।

এই প্রভাবকগুলো শাহবাগের জন্ম দেয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বলার অপেক্ষা রাখে না অনলাইনের ক্যাচাল বাস্তব জগতের একটা এক্সটেনশন মাত্র। নিজের থেকে গড়ে ওঠা কিছু না।

চ্যাপ্টার ৪. শাহবাগের প্রেক্ষাপট—তোমরা যারা জাফর ইকবাল কর

এই যুদ্ধাপরাধের বিচারের পাশাপাশি এর সাথে জড়িত অন্যতম একটা ইস্যু ছিল জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধ করার দাবি। এই দাবির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি ডক্টর মুহম্মদ জাফর ইকবাল। ডক্টর জাফর ইকবাল বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধের বিচারের পক্ষের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁকে তার বিপক্ষের লোকজন হতে

শুরু করে সকলেই শ্রদ্ধা করেন।

২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে ৭ তারিখে তিনি প্রথম আলোতে একটা উপসম্পাদকীয় লিখেন, যার টাইটেল ছিল, ‘তোমরা যারা শিবির করো’। যেটা অনলাইন, অফলাইনে ব্যাপক আলোচিত হয়। এই সম্পাদকীয়তে শিবিরের মতো অগ্রহণযোগ্য একটা শক্তির পক্ষে যারা আছে তাদের ডক্টর জাফর ইকবাল মুক্তচিন্তার পথে ফিরে আসতে বলেন এবং যুদ্ধাপরাধী দল থেকে বের হয়ে আসার আহবান জানান। তার এই লেখা সেই সময় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

এই লেখার বিপক্ষে শিবিরের পক্ষে তানভির মোহাম্মদ আর্জেল নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র ‘তোমরা যারা ছাত্রলীগ কর’ বলে একটা উত্তর লেখে যা সেই সময় অনলাইনে প্রচুর আলোচনার জন্ম দেয়। এই যুবককে পরে ছাত্রলীগের ছেলেরা পেটায় যা অনলাইন জগতে আলোচিত হয়।

একদিকে জামায়াত শিবির এবং যুদ্ধাপরাধের পক্ষ। আরেক দিকে ডক্টর মুহম্মদ জাফর ইকবালের যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষে কোনো ‘ইফ কিন্তু বাট’ ছাড়া অবস্থান পক্ষ।

ডক্টর মুহম্মদ জাফর ইকবালের এই লেখাটা আমিও একটি ফেসবুক নোটের মাধ্যমে ক্রিটিক করি। সেই নোটটা এখানে দিলাম।

এটা আমার দ্বিতীয় সিরিয়াস অ্যানালিটিকাল লেখা। প্রথমটা ছিল, অনন্ত জলিল নিয়ে। সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে লেখাটা ছুপা ছাগু টাইপ লেখা হিসেবে গণ্য হয়। এবং আমার বন্ধুমহলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পক্ষের অনেকেই লেখাটার কড়া সমালোচনা করেন। অনেকে সমর্থন জানান।

লেখাটা পড়েন। কারণ এই লেখায় ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে, শাহবাগের জন্মের মাত্র দুই মাস পূর্বে যুদ্ধাপরাধের বিচার এবং শাহবাগের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন পক্ষের অবস্থান সম্পর্কে একটা ধারণা পাবেন।

জাফর ইকবাল স্যারের মূল লেখাটা কপিরাইটের কারণে আমি দিতে পারছি না। বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি বলেছেন, জামায়াত-শিবির সম্পূর্ণ বাতিল শক্তি এবং তাদের সমর্থন করা উচিত না এবং বাংলাদেশের মানুষের প্রধান ইস্যু যুদ্ধাপরাধের বিচার।

পড়েন।

নোট ২: তোমরা যারা জাফর ইকবাল করো

(প্রকাশ: ১৫ ডিসেম্বর ২০১২)

স্যার

সালাম নেবেন। আপনাকে অনেক শ্রদ্ধা করি। আপনার আর আপনার ভাইয়ের বই পড়ে আমরা বড় হয়েছি। আজকে আপনি আমাদের কাছে জাতির বিবেকের মতো। তাই দুঃসাহস নিয়ে কিছু কথা যদি বলে ফেলি, তাহলে সেটা নির্বোধের ভুল মনে করে মাফ করবেন আশা করি। কিছু দিন আগে ‘তোমরা যারা শিবির করো’ নামে আপনার একটা লেখা প্রথম আলোতে ছাপা হয়েছে। আপনার লেখাটা নিয়ে চারিদিকে অনেক আলোচনার জন্ম নিয়েছে। এটি বোঝা যায় যারা শিবির করে, তাদের প্রতিক্রিয়া দেখে। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে শিবির-ভক্ত একটা ছেলে আপনার লেখার বিরুদ্ধে, ‘তোমরা যারা ছাত্রলীগ করো’ বলে একটা লেখা লিখে গণধোলাই খেয়েছে বলেও শুনতে পেয়েছি।

আপনাকে আমরা এই জাতির বিবেক হিসেবে দেখি। এবং আপনার এই লেখা অনেকটা যুগ সন্ধিক্ষণের একটা লেখা। কারণ এখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চলছে। বিচারে রায় যেটাই হোক বেশির ভাগ যুদ্ধাপরাধী আগামী দশ বছরে হয় ফাঁসি ঝুলে, নয় কারাগারে, নয় বাংলার মানুষের ঘৃণা সয়ে মরে যাবে, তাদের আয়ু ফুরিয়ে যাওয়ার কারণে। তখন বাংলার মাটি হবে যুদ্ধাপরাধী-মুক্ত। কিন্তু তখন রয়ে যাবে শিবির। এই শিবিরকে আমরা কি দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখব, আপনার লেখায় তার একটা দর্শন পাওয়া যায়। তাই আপনার লেখাটিকে শুধু শিবিরীয় অ্যাঙ্গেল থেকে নয়, আরো বিবিধ অ্যাঙ্গেল থেকে পর্যালোচনা করা উচিত।

নতুন পৃথিবীর সোশ্যাল অর্ডার

স্যার, আমার কাছে আপনার লেখার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটা ছিল তৃতীয় ভাগে যেখানে আপনি লিখেছেন,

‘আজ থেকে কয়েক যুগ আগেও এই পৃথিবী যে রকম ছিল, এখন সেই পৃথিবী নেই। এই পৃথিবী অনেক পাল্টে গেছে। নতুন পৃথিবী তালেবান বা লস্কর-ই-তাইয়েবার পৃথিবী নয়। জামায়াতে ইসলামী বা শিবসেনার পৃথিবীও নয়। নতুন পৃথিবী হচ্ছে মুক্তচিন্তার পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক একটা পৃথিবী। এই নতুন

পৃথিবীর মানুষেরা অসাধারণ। তারা একে অন্যের ধর্মকে সম্মান করতে শিখেছে, একে অন্যের সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যকে উপভোগ করতে শিখেছে, একে অন্যের চিন্তাকে মূল্য দিতে শিখেছে। এই নতুন পৃথিবীতে মানুষে মানুষে কোনো বিভাজন নেই। দেশ-জাতির সীমারেখা পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

তাই এই নতুন পৃথিবীতে যখন কেউ ধর্ম দিয়ে মানুষকে বিভাজন করে রাজনীতি করতে চায়, পৃথিবীর মানুষ তখন তাকে পরিত্যাগ করে। নতুন মানুষের কাছে বাতিল হয়ে যাচ্ছে জামায়াতে ইসলামীর মতো বা শিবসেনার মতো রাজনৈতিক দল। নতুন পৃথিবীতে এই দলগুলোর কোনো ভবিষ্যৎ নেই।'

এই লাইনগুলো আমাকে ব্যাপক চিন্তার মধ্যে ফেলে। আসলে কি সম্ভব স্যার? যেখানে ধর্ম মানুষের এত বড় একটা চেতনা সেখানে এটা কি সম্ভব যে ষোল কোটি মানুষের মধ্যে কেউ তার রাজনৈতিক চেতনায় তার ধর্মীয় বোধগুলোর প্রতিফলন দেখতে চাইবে না?

আর আপনি যে সোশ্যাল অর্ডারটা গড়তে চাচ্ছেন সেটা কি পৃথিবীতে কোথাও হয়েছে, যে দেশে সবাই সেক্যুলার, সবাই মুক্ত চিন্তার পথিক, সবাই প্রগ্রেসিভ, কোনো ধর্মীয় মৌলবাদী নাই, সাম্প্রদায়িক চেতনার মানুষ নাই?

আজকে আমাদের বাস্তবতা হচ্ছে, অধিকাংশ রাজনৈতিক গোঁড়া ধর্মীয় মৌলবাদী ধরনের লোকজন হয় জামায়াত-শিবির করে, নয় তাদের প্রতি সিমপ্যাথেটিক। কারণ তারা মনে করে জামায়াত বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের স্বার্থ রক্ষা করে। যদিও বাংলাদেশে আরো অনেক ইসলামি দল আছে কিন্তু ধর্মভিত্তিক মূল দলটি জামায়াত এবং শিবির। একদিকে তাদের যুদ্ধাপরাধ অন্য দিকে মওদুদী ভাবনা ও গোঁড়া সাম্প্রদায়িকতার দোসর এই দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি জামায়াত-শিবির সহ সকল সাম্প্রদায়িক শক্তিকে বর্জন করেন।

আপনি আমাদের জাতির বিবেক। আপনি এবং আপনিসহ আরো অনেকের থেকে মোরাল সাপোর্টটা পেয়ে আওয়ামী লীগের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইতিমধ্যে আহবান জানিয়েছেন যেখানেই শিবির সেখানেই প্রতিরোধ করার জন্যে। তিনি ছাত্রলীগকে পুলিশের সাথে হাত মিলিয়ে শিবির নিধনে নামার আহবান জানিয়েছেন।

ফলে গত দুই মাস ধরে যেখানেই ছাত্র শিবির মিছিল করতে গেছে পুলিশ তাদেরকে বাধা দিয়েছে। শিবির অনেক জায়গায় পুলিশ পিটিয়েছে, এবং

পুলিশের অস্ত্র পর্যন্ত কেড়ে নেয়ার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। অন্যদিকে শিবির সন্দেহে একজন পথচারীকে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে মারার দৃশ্য আমরা দেখেছি টিভিতে, যা নিয়ে ফেসবুক গরম আছে অনেক দিন ধরে।

দৃশ্যতই দেশ অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে এবং এই ঘাত-প্রত্যাঘাত কোথায় থামবে তা কেউ বলতে পারছে না।

ফ্রিডম অব স্পিচ আর ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন ও পরমত সহিষ্ণুতা

কিন্তু আমার কাছে একটা জিনিস মনে হয়েছে। আপনি দুটি বিষয় লিখেছেন ‘মুক্তচিন্তা’ এবং ‘একে অন্যের চিন্তাকে মূল্য দেয়া’ যা উপরের কোটেই আছে। আমি তার সাথে আর একটা ভাবনা যোগ করতে চাই তা হল ফ্রিডম অব স্পিচ আর ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন। আমরা জানি ধর্মীয় মৌলবাদ ফ্রিডম অব স্পিচ আর ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন সহ্য করতে পারে না। ধর্মীয় মৌলবাদীরা চায়, আমাদের উপর খুব গোঁড়া কিছু ধর্মীয় অনুশাসন চাপিয়ে দিতে যার ফলে দেখা যাবে তাদের নিয়মে চললে আমরা আর গান করতে পারব না, আমাদের মা বোনেরা আর শাড়ি পড়তে পারবে না, সবাইকে বোরখা পরে চলতে হবে, সেটা তাদের চাওয়া হোক বা না হোক। আমরা আর নাটক-গান-কবিতা সৃষ্টি করতে পারব না বা রবীন্দ্রনাথ পড়তে আমাদেরকে বাধা দেবে ওরা, একটা ছেলে একটা মেয়ের হাত ধরে রাস্তায় হাঁটতে পারবে না। এইসব খুব ভয়ংকর ব্যাপার। তাই আমাদের ফ্রিডম অব স্পিচ আর ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশনকে রক্ষা করার জন্যে মৌলবাদকে ঠেকানো খুব জরুরি।

এই সাথে স্যার আপনার এও কি মনে হয় না, এই যে শিবির বা এই যে মৌলবাদী দল জামায়াত, আমরা যাদের মিছিল করতে দেখলেই পুলিশ দিয়ে পিটানো জায়েজ মনে করছি, আমরা তাদের ফ্রিডম অব স্পিচ আর ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশনে বাধা দিচ্ছি এবং তাদের চিন্তা করার অধিকারের প্রতি ব্যাপক অসহনশীলতা দেখাচ্ছি?

রাষ্ট্রের কাছে ফ্রিডম অব স্পিচ আর ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন আর লিবার্টি এই ভ্যালুগুলো অ্যাবসলিউট এবং ইন্ডিসপোজেবল জিনিস হওয়া উচিত। যে রাষ্ট্র প্রগেসিভ এবং লিবারেল সে রাষ্ট্রকে এই ভ্যালুগুলোকে সব ধরনের পলিটিক্যাল কারেক্টনেসের উপরে স্থান দিতে হয়।

এই কথাটা বোধহয় ভলতেয়ার বলেছিলেন,

'আমি তোমার সাথে একমত না হতে পারি, কিন্তু তোমার মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্যে আমি আমার জীবন দিতে পারি।'

আজকে স্যার আপনার কাছে প্রশ্ন, এই ভ্যালুগুলো কি শুধুমাত্র প্রগ্রেসিভ, সেক্যুলার বা লিবারেলদের জন্যে প্রযোজ্য? এটা কি একজন গোঁড়া ধর্মীয় মৌলবাদী শিবির-এর জন্যে প্রযোজ্য নয়? আমাদের সংবিধান তো বলে, রাষ্ট্র তার প্রতিটি নাগরিকের এই অধিকার নিশ্চিত করবে যতক্ষণ না পর্যন্ত সে দেশের প্রচলিত আইন ভাঙছে বা সন্ত্রাসকে উস্কানি দিচ্ছে বা সন্ত্রাসে অংশ নিচ্ছে।

যদি আমরা তাদের এই মত প্রকাশের জায়গা না দেই, তাহলে বিপদটা কোথায়? বিপদটা হচ্ছে, সুযোগটা না দিলে তারা হয়ে যাবে চরমপন্থী। তারা বোমা ফাটাবে, রাস্তা-ঘাটে গাড়ি পোড়াবে। এটা তো কাম্য নয়।

এটা খুব কমন হিউমেন বিহেভিয়ার যে, যার আর কোনো উপায় থাকে না সে তখন টেরোরিজমের দিকে এগোয়। আর আপনি যদি ওদের একটা ব্রিদিং স্পেস দেন, মত প্রকাশের জায়গা দেন, তখন আমরা তাদেরকে সামাজিকভাবে মুখোমুখি হয়ে মোকাবেলা করতে পারি, যুক্তি দিয়ে তাদেরকে বোঝাতে পারি, আমাদের দেশের সামগ্রিক স্বপ্নের সাথে মিলিয়ে তাদেরকে দেখাতে পারি যে, তারা যা করছে তা দেশের জন্যে ক্ষতিকর এবং তাদের অন্য আরো অনেক ভাবেই ডিমোটিভেট করতে পারি।

আমরা ভীত নই

গত ১৫ বছরে প্রথম আলো পত্রিকা মৌলবাদের বিরুদ্ধে যে ফাইট দিয়েছে সেই ফাইট অনেকটাই সফল। আমরা মুসলমান দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম রেডিক্যাল কান্ট্রি। আজকে মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়াসহ যে কোনো দেশের সাথে তুলনা করলে আমাদের সমাজে ধর্মীয় এক্সট্রিমিজম সবচেয়ে কম। কারণ আমাদের অনেক বড় একটা শক্তি হচ্ছে আমাদের ভেতরে হাজার ধরে প্রোথিত বাঙালি জাতিসত্তা।

আজ ষোল কোটি মানুষের দেশ থেকে আপনি সব মৌলবাদী, বা জামায়াত সিমপ্যাথাইজারদের সম্পূর্ণ দূর করে দেবেন সেই চিন্তা করাটা বোকামি। তবুও

বলা যায় আমাদের রিস্ক এখন অনেক কম। কারণ আমাদের দেশের মিডল ক্লাসকে একটা লো-ডোজ লিবারেল আইডিয়া খাওয়ানো হয়েছে প্রথম আলোর নেতৃত্বে প্রায় ১৫ বছর ধরে। আশির দশক থেকে শুরু করে ৯০ দশকের শেষ পর্যন্ত শিবিরের ব্যাপক কার্যক্রম ছিল। হাজার হাজার ছাত্রকে তারা ব্রেইন ওয়াশ করেছিল। তখন কেউ তাদের আইডিয়াকে কনটেস্ট করেনি। কিন্তু বিংশ শতকের প্রথম দশকে এসে আমরা দেখছি শিবিরের প্রভাব অনেক কমে আসছে। বাংলাদেশের মানুষ ওদের ভণ্ডামি বুঝতে পারছে। এমন কি বিএনপির দ্বিতীয় সেশনে জামায়াত ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও তারা সামাজিকভাবে তাদের সাম্প্রদায়িক মুভমেন্টকে তেমন এগিয়ে নিতে পারে নাই।

অন্যদিকে দেখা যায়, বিশ শতকের শুরুর দিকে প্রচুর মানুষ তাবলীগ জামায়াতের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কারণ মানুষ তাদের ধর্মীয় চেতনাকে প্রকাশ করতে চায়। ফলে মানুষ যখন দেখে যে জামায়াত-শিবির আসলে ভণ্ড তখন তারা অন্য একটা নন-পলিটিসাইজড ইসলামিক অ্যাকটিভিজমের পথ খুঁজে নেয়।

আমি তাই এখন সোসাইটিতে তেমন কোনো জামায়াত দেখি না, শিবির দেখি না। কিন্তু সাধারণ মুসলমানের মধ্যে প্রচুর তাবলীগ জামায়াত দেখতে পাই। শিবিরের সে প্রভাব আর নেই। কারণ এখন মানুষ প্রশ্ন করতে শিখেছে। যুক্তি দিয়ে ওদেরকে মোকাবেলা করা হয়েছে।

যখন মুক্তমনারা নেয় ফ্যাসিবাদীর ভূমিকা

কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে আপনার এবং আপনার মতো অনেকের কাছ থেকে নৈতিক সমর্থন পেয়ে সরকার চলে গেছে সম্পূর্ণ ফ্যাসিবাদী ভূমিকায়। বলা হচ্ছে, তাদেরকে যেখানে দেখবে সেখানেই মার দিতে হবে। ছাত্রলীগকে লেলিয়ে দেয়া হচ্ছে, তাদেরকে রাস্তায় নামলেই পেটানো হচ্ছে। ধর্মীয় বইসহ পেলে জঙ্গিবাদী বইসহ পাওয়া গেছে বলে মামলা দিয়ে দেয়া হচ্ছে। যে কোনো অজুহাতে দাড়িওয়ালা লোকদের পুলিশ ধরে নিয়ে জঙ্গি সিল মেরে দেয়া হচ্ছে। স্যরি স্যার। এই সোসাইটি আমরা চাই নাই। এটাকে আমরা মুক্তবুদ্ধি বলি না। ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতার মতো এটাও হলো সেকুলার কূপমণ্ডুকতা।

এবং আপনি যদি এই ভ্যালুগুলোকে রক্ষা না করেন তখন ওদের দিন যখন

আসবে, ওরাও বলবে, আমরা যখন শুধু রাস্তায় মিছিল করার অপরাধে মার খেয়েছিলাম, তখন কোথায় ছিল তোমাদের ফ্রিডম অব স্পিচ আর ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন?

ইস্যুটা হচ্ছে, জাতির বিবেক হিসেবে আপনাকে ফেয়ার হতে হবে, এবং রাষ্ট্রকে ফেয়ার হতে হবে। রাষ্ট্র বায়াসড হতে পারে না। স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি বলে শিবিরের ছেলেদের রাস্তায় দেখলেই মার দিতে হবে, পুলিশ দিয়ে পিটাতে হবে, স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি হলেই ছাত্রলীগের সোনার ছেলেরা কুপিয়ে মানুষ মেরে ফেলতে পারবে, সেটা কখনো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হতে পারে না।

কিছুদিন আগে ছাত্রলীগের জান্তব শিবির নিধন উৎসবে বিশ্বজিতের মতো নিরপরাধ পথচারীকে বার বার বলতে হয়েছে, আমি হিন্দু, আমি শিবির না। কিন্তু সেটা বলেও বিশ্বজিত চাপাতি-লীগের ছুরির হাত থেকে মুক্তি পায় নাই।

স্বাধীনতা যুদ্ধের বিখ্যাত একটা ছবিতে আমরা দেখেছি, একজন পাকসেনা একজন মানুষের লুঙ্গি খুলে দেখছে সে হিন্দু না মুসলিম।

(এটা আমি পরে জেনেছি ভুল। তথ্য নোট/০১/২০১৪)

বিশ্বাস করেন, ওই ছবিটা আর বিশ্বজিতের রক্তাক্ত শরীরে 'আমি হিন্দু' বলার আকৃতির সাথে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। আজ এমন বাংলাদেশ আমরা চাই না যেখানে আবার লুঙ্গি বা প্যান্ট খুলে আমাদের প্রমাণ করতে হবে, আমরা হিন্দু কি হিন্দু নই, বা দাড়ি কেটে কোনো নিরপরাধ ধার্মিক মুসলমানকে প্রমাণ করতে হবে, সে শিবির কি শিবির নয়।

ধর্ম আর রাষ্ট্রের বিভাজন

হ্যাঁ, একটা জায়গা আছে, যেইখান থেকে আপনি বলতে পারেন, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি শেষ পর্যন্ত কূপমণ্ডুকতা সৃষ্টি করে এবং মানুষের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেয়, তাই রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে বিযুক্ত করা বাঞ্ছনীয়।

এই ব্যাপারে আপনার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। রাষ্ট্রের কোনো ধর্ম থাকতে পারে না। রাষ্ট্র নামাজ পড়ে না, রাষ্ট্র মন্দিরে যায় না। নামাজ পড়ে বা মন্দিরে যায় মানুষ। এবং রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য হলো হিন্দু-মুসলমান, চাকমা-মুরং, গোপালগঞ্জ-নোয়াখালি, মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেটধারীর নাতি-নাতনি এবং সলিমুদ্দিন-কলিমুদ্দিনসহ সবাইকে একই চোখে দেখা।

একই সাথে রাষ্ট্রের মূল দায়িত্ব, রাষ্ট্রের প্রতিটা নাগরিকের সাথে সমান আচরণ করা। সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করার মাধ্যমে আমাদের রাষ্ট্র সেই জায়গায় আঘাত দিয়েছে। রাষ্ট্র সাংবিধানিক ভাবে অমুসলিমদের অধিকার হরণ করছে।

ইতিহাস থেকে আমরা দেখি ইসরায়েল দ্বারা প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের উপর বর্ণবাদ, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, আফগানিস্তানে তালেবান, ইরাকে মার্কিন খ্রিশ্চান মৌলবাদী সমর্থিত হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে অনেক অন্যায়-অত্যাচার হয়েছে ধর্মের নামে। তাই রাষ্ট্রের নীতি রাজনীতির সাথে ধর্মের মিলন ঘটানোটা খুব ভয়ংকর হয়ে ওঠে। কারণ ধর্মীয় চেতনা মানুষের খুবই মৌলিক এবং প্রচণ্ড ইনফ্লেক্সিবল একটা বোধ। পক্ষান্তরে রাষ্ট্র ও সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল দুটি এনটিটি।

তাই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে অনেক দেশ সাংবিধানিকভাবে ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করে রেখেছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম একটা চেতনাও ছিল রাষ্ট্র থেকে ধর্মের এই বিভাজন।

তাই আমাদের দেশেও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করাটা প্রয়োজন। এবং করলে জামায়াতে ইসলামী বা শিবির যেমন রাজনীতি করতে পারবে না ওলামা লীগ বা ইসলামী ঐক্যজোটও পারবে না। এবং আপনাদের শিবিরফোবিয়া বন্ধ করতে হবে।

আজকে তাই বিতর্ক হওয়া প্রয়োজন, ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করার বা না করার বিষয়ে। সেই তর্কে এমনকি জামায়াত শিবিরকেও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। একদিকে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ফাইনাল গন্তব্য গোঁড়া মৌলবাদ মাইনরিটির উপর, সংস্কৃতির উপর, যা মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর আঘাত নিয়ে আসে, যা সভ্যতাকে থমকে দেয়। অন্যদিকে, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার অনেক খারাপ প্রভাবও আছে। কারণ, ধর্ম মানুষকে মূল্যবোধ আর সামাজিক অনুশাসন শেখায়, যা থেকে বিযুক্ত হয়ে মানুষ স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে, যাতে ভেঙে পড়ে সামাজিক বন্ধন। তাছাড়া আমাদের দেশের মানুষের রাজনৈতিক ম্যাচুরিটি ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার জন্যে প্রস্ত্তত কিনা এবং একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে দেশের অধিকাংশ মানুষ সেইটা চাচ্ছে কিনা সেইটাও আপনাকে দেখতে হবে। (এই লাইনটি পরে সংযোজিত)।

এটা অনেক জটিল থিয়োলজিক্যাল একটা বিতর্ক যেটা আপনারা কখনো করেন না।

কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ধর্মভিত্তিক রাজনীতি অবৈধ না করা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রকে জামায়াত-শিবিরের ফ্রিডম অব স্পিচ আর ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশনের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এটা আপনার কথিত 'মুক্তচিন্তা' এবং 'একে অন্যের চিন্তাকে মূল্য দেয়ার' একটা দায়।

প্রশ্ন হলো, আপনাদের নৈতিক আদর্শের ধ্বজাধারী সরকার তো এখন ব্রুট মেজরিটির সংসদ চালাচ্ছে। এই সংসদে সংবিধান সংশোধন করে আমাদের মতো গোঁড়া অ্যানার্কিক ক্যাপিটালিস্ট দেশকে 'সোশ্যালিস্ট' বানিয়ে দেয়া হয়েছে মাত্র ৩০ মিনিটে।

আজ আপনাদের প্রিয় দলটিকে কেন আপনি ধর্ম থেকে রাষ্ট্রকে সেপারেট করার সাংবিধানিক সংশোধনী আনতে চাপ দিচ্ছেন না?

আজ কেন ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করে শিবিরকে বা জামায়াতকে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে না? আওয়ামী লীগের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেখানে ছাত্রলীগকে শিবির নিধনের আহবান জানাচ্ছেন, আপনি যখন কলাম লিখছেন 'তোমরা যারা শিবির করো' আওয়ামী লীগের সৈয়দ বংশের সম্পাদক তখন বলছেন জামায়াত শিবিরকে নিষিদ্ধ করার কোনো প্ল্যান নেই। হোয়াই দিস কোলাবেরি ডি, স্যার?

যে ক্ষতস্থানে গ্যাংগ্রিন হয়েছে তাকে অপারেশান করে কেটে না ফেলে, কেন আপনি রোগীকে ব্যথার ওষুধ ক্লোফেনাক খাওয়াচ্ছেন?

এখানেই স্যার আপনাদের হিপোক্রেসিটা ধরা পড়ে যায়। এখানেই সাঈদীর সাথে আপনার কোনো পার্থক্য থাকে না। সাঈদী ধর্ম বেচার আড়তদার, আর আপনি হয়ে ওঠেন আড়ং বা নন্দনের মতো সেক্যুলারিজম বেচার সুন্দর সাজানো ওয়েল ব্র্যান্ডেড মুদির দোকান। দুইটার ধান্দা একই, ধর্মকে বেচা। আপনারটা একটু পশ, এই যা।

এখন আসে দ্বিতীয় আরগুমেন্ট

ধর্মভিত্তিক রাজনীতি যদি নিষিদ্ধ নাও করা হয়, মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি হিসেবে কি জামায়াত বা শিবির রাজনীতি করার অধিকার রাখে? সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পর কি নাজিরা রাজনীতি করতে পেরেছিল? তাহলে জামায়াত কেন পারবে? তাদের আ-াবাচ্চা শিবির কেন পারবে?

গুড কোশ্চেন! তাহলে নিষিদ্ধ করেন না কেন স্যার? নিষিদ্ধ তো আপনারা করছেন না। ওদেরকে নিষিদ্ধ না করে, আপনারা সমস্যাটা জিইয়ে রাখছেন এবং জিইয়ে রাখার পর তারা যখন হৃষ্টপুষ্ট হয়ে কিছু একটা করছে তখন আপনারা ঐ অজুহাতে সমাজকে ডিভাইড করছেন, রাষ্ট্রকে একটা কনফ্রন্টেশনাল সিচুয়শানে ঠেলে দিচ্ছেন।

আজ আপনার কাছে প্রশ্ন, কেন করছেন না? কেন আপনার আদর্শে বিশ্বাসীদেরকে উদ্দেশে আপনি লিখছেন না,

'তোমরা যারা আওয়ামী লীগ করো, ব্রুট মেজরিটির সংসদে জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ না করলে, তার সকল দায় তোমাদের উপর আসে। নো মোর বুলশিটিং!'

এই দেশে তো বাংলাভাই নিষিদ্ধ করা হয়েছে, হিযবুত-তাহরীর নিষিদ্ধ করা হয়েছে, পুর্ব বাংলা জনযুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ওদেরকে পেলেই ধরা হচ্ছে। আমরা তো তার বিরুদ্ধে কিছু বলছি না। জামায়াত শিবিরকে নিষিদ্ধ করেন, আমরা আপনার পাশে দাঁড়াব। যেখানে জামায়াত-শিবির দেখব ঠেঙিয়ে পুলিশে দেবো।

কিন্তু আপনারা যেটা করছেন তা হলো, আপনারা জামায়াত শিবিরকে কালসাপের মতো পালছেন। আবার ঐ সাপ দিয়ে ছোবল মেরে শত্রুনিধন করছেন, আবার মানুষকে ভয় দেখাচ্ছেন 'সাপ, সাপ, পালাও পালাও' বলে। এরপর আবার সাপের বিষ-এর ভ্যাকসিনও বিক্রি করছেন কলাম লিখে। এটা শুধু ডবল স্ট্যান্ডার্ড না, ট্রিপল-কোয়াড্রাপোল স্ট্যান্ডার্ড হয়ে যাচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর অ্যাবসোলিউট নয়

আমি জানি স্যার, এতক্ষণে আপনি এবং আপনার অনুসারীরা আমার বা আমার মতো অনেকে যারা এই ধারণাগুলো সমর্থন করি তাদের উপর চেতে গেছেন। আপনি চিন্তা করছেন ৩০ লাখ শহীদের রক্ত, আর লক্ষ লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আমরা প্রশ্ন করছি।

জ্বি স্যার। আমরা সৈয়দ আশরাফের নষ্ট প্রজন্ম, হ্যালোইন পালন করে বড় হওয়া প্রজন্ম না। মাসুদ রানা, মিসির আলি পড়ে বড় হওয়া প্রজন্ম। আমরা মুক্তিযুদ্ধ দেখি নাই, মুক্তিযুদ্ধ আমাদের কাছে অদ্ভুত একটা ফ্যাসিনেশান, যখন

সময়ের কিছু সূর্যসৈনিক নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ করে আমাদের জন্যে বাংলাদেশ নামের এই দেশটার জন্ম দিয়েছে।। আমরা তাঁদের নত হয়ে সালাম জানাই।

কিন্তু যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আপনারা আমাদের গলার মধ্যে 'বাবু, খাও' বলে গেলান, সেই চেতনাকে আমরা এখন প্রশ্ন করি। কারণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নামের এই 'কুল' এইডটাকে এমনভাবে পলিটিসাইজ করা হয়েছে যে এটা আমরা আর অ্যাবসোলিউট হিসেবে মেনে নিতে রাজি না।

চোখের সামনে আমাদের এই খুব কোমল ভ্যালুটাকে রেপড হতে দেখতে দেখতে, সেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হতে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ অন্যায়ের জন্ম হতে দেখার পরেও কেন আপনি মনে করছেন যে দেশপ্রেমে বুঁদ হয়ে অন্ধ আর বধিরের মতো আপনারা যা বলবেন তাই বিশ্বাস করব আমরা? কেন আমরা নিজের চোখ আর কানকে অস্বীকার করব শুধুমাত্র আপনার মতো বিবেকদের মুখের কথায়?

আপনারা যখন পেপারে লেখালেখি করেন, ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতা নিয়ে, আমাদের অনেকের তখন মনে হয় আপনাদের সুশীল-সেক্যুলার কূপমণ্ডুকতা নিয়ে লেখাটাও প্রয়োজন।

এই লেখাটা অনেক ভয়ে লিখছি। এরপর কী ধরনের ব্যক্তি-আক্রমণ শুরু হয়ে যায় সেই ভয়ে। মুক্ত চিন্তার পথে ভয় দেখিয়ে বাধা সৃষ্টি করে ধর্মীয় মৌলবাদীরা। ওদের সাথে আপনাদের পার্থক্য এখন মাত্র আড়াই ইঞ্চি। সেটাও দিন দিন ঘুচে যাচ্ছে।

দেশপ্রেমের সহজ তরিকা ও সময়ের প্রয়োজন

স্যার, আপনার লেখাটায় আজকে দেশকে ভালোবাসার সাথে আপনি এক করছেন শহীদ মিনারে যাওয়া, স্মৃতিসৌধে মালা দেয়া, রবীন্দ্র সঙ্গীত গাওয়া আর পয়লা বৈশাখে পান্তা ভাত খাওয়ার সাথে। দ্বিমত পোষণ করার জন্যে দুঃখিত, স্যার। এত সহজে যদি মানুষ দেশপ্রেমিক হয়ে যায় তাহলে দেশের জন্যে ব্যক্তিগত স্যাক্রিফাইস করবে কে?

আজকে স্যার আমাদের ডিকশনারি থেকে দেশপ্রেম শব্দটা বরং তুলে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। ওটা একটা ভূঁয়া শব্দ। ওই দেশপ্রেমের নামেই আজ সব অন্যায়,

লুটপাট আর অবিচার করা হচ্ছে।
দেশকে কে কত বেশি ভালবাসে আর কে দালাল, সেটা এখন আর কার দেশপ্রেম কত বেশি সেই উত্তরে নির্ধারিত হবে না। তা নির্ধারিত হবে সময়ের প্রয়োজনে দেশের প্রতি যার যে কর্তব্য তা কে করছে কে করছে না, সেই উত্তর দিয়ে।
জহির রায়হান তার সময়ের প্রয়োজনে লেখায় বলেছিলেন ঠিক এই কথা। তাঁরা অস্ত্র ধরেছিলেন সময়ের প্রয়োজনে।
আজ আমাদের সময়ের প্রয়োজন হচ্ছে, নিজেদের শিক্ষিত করে তোলা, ট্যাক্স দেয়ার সময় সরকার আমাদের জন্যে কী করছে তা জিজ্ঞাসা লেখায় করা, রাস্তায় সিরিয়াল না ভেঙে রং-সাইড দিয়ে সবাইকে ফেলে সামনে চলে না যাওয়া, ফিক্সড প্রাইস গ্যাস চুলার আগুন দিয়ে আন্ডারওয়ার না শুকানো, সবাই ঘুষ খাচ্ছে দেখেও নিজেকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা, দুর্নীতি না করা, পরিশ্রম করে মেধা দিয়ে বিশ্ববাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো যোগ্য মানুষ হয়ে দেশের জন্যে কিছু করা, ভারতীয় সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ থেকে নিজেকে আর নিজের পরিবারকে রক্ষা করা, তেল-গ্যাস রক্ষা কমিটির মিটিং-এ গিয়ে সরকারকে দেশের সম্পদ বিদেশিদের হাতে তুলে দিতে বাধা দেয়া। আজকের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক চেতনা এইগুলো।
এই কাজগুলো যে করে, তার ধর্মীয় বিশ্বাস যদি মৌলবাদীও হয় তবুও সেই যুবক, যে দেশপ্রেমিক ১৬ ডিসেম্বরে দলবল নিয়ে স্মৃতিসৌধে ফুল দেয় আর হরতালে বিশ্বজিতদের মতো নিরপরাধ নাগরিকদের 'টেক্সাস চেইন স মাসাকারে'র মতো ছুরি দিয়ে কেটে ফালা-ফালা করে তার চেয়ে বড় দেশপ্রেমিক।
আজ আপনি দেশপ্রেমের যে সহজ তরিকা দেখিয়ে দিচ্ছেন, তত সহজেই যদি দেশপ্রেমিক হওয়া যায় তাহলে তো আর কয়দিন পর দেশের জন্যে পার্সোনাল স্যাক্রিফাইস করার লোক পাওয়া যাবে না। সবাই দেশের পেছন দিক থেকে মেরে দিয়ে, স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে, দুই লাইন রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে দেশপ্রেমিক হয়ে যাবে।
এমন লক্ষ লক্ষ সার্টিফিকেটধারী দেশপ্রেমিকের ছবি আপনি পেপার খুললেই পাবেন, টিভি খুললেই পাবেন।

এই দেশপ্রেমিকেরা এবং কনফ্রন্টেশনাল রাজনীতি দেশকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তার একটা ছোট্ট উদাহরণ দেই। ভিয়েতনাম ১৯৯৬ সালে তার গৃহযুদ্ধ থেকে বের হয়ে আসে। এই সময়ে তারা আমাদের থেকে কম উন্নত একটা দেশ ছিল। এই ১৮ বছরে তারা তাদের ইলেক্ট্রিসিটি ক্যাপাসিটি ২,০০০ গিগাওয়াট থেকে আজ নিয়ে গেছে ২৫,০০০ গিগাওয়াটে। বোঝেন তারা কী পরিমাণ এগিয়েছে। আর আমরা একই সময়ে ২,০০০ থেকে পৌঁছেছি ৬,০০০ গিগাওয়াটে। দেখেন, এই বিভাজনের রাজনীতি আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? কেন আপনারা আজ আরো বেশি বিভাজন আর বিভক্তি সাজেস্ট করছেন? আমাদের সবার তো আমেরিকার ভিসা নাই, স্যার।
সবশেষে আমার বেয়াদবির জন্য আবার ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আপনাকে অনেক শ্রদ্ধা করি। আপনি জাতির বিবেক। আমাদের অনেকের কাছে 'নিয়ার পারফেক্ট' একটা মানুষ। কিন্তু আপনার চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করি আপনার বড় ভাইকে, যিনি ভুলে ভরা একটা মানুষ কিন্তু সারা জীবনে হিপোক্রেসি করেন নাই।
ভুল-ত্রুটি, বেয়াদবি আপন মহানুভবতায় মাফ করে দেবেন। এই আশায়।
জিয়া হাসান
(এই নোটটা লেখার পর স্বাভাবিকভাবেই সমালোচনার মুখে পড়ি বেশকিছু ফেসবুক বন্ধুদের। কারণ শুদ্ধতম একটা এনটিটি হিসেবে ধরা হয়। উনার সমালোচনা করাটাও অনেকটা ব্লাসফেমির মতো একটা ব্যাপার।)

চ্যাপ্টার ৫. ২০১৩-তে যা কিছু হয়েছে তা ২০১২ বা ২০১১-তে হয় নাই কেন?

ডক্টর জাফর ইকবালকে নিয়ে লেখা নোট এবং সেই সময়ের অন্যান্য আলোচনায় এটা বোঝা যায়, ২০১২ সালের শেষ মাস বা এই সময়ের দিকে যুদ্ধাপরাধের বিচার, জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করা এবং এইসব আলোচনা মানুষের একটা মেইনস্ট্রিম আলোচনা হিসেবে উঠে আসে।
কিন্তু পুরো ২০১২ সাল সেভাবে ছিল না। ২০১২ ছিল মূলত আওয়ামী লীগের দুর্নীতি নিয়ে আলোচনার বছর। ২০১৩ সালে এসে সেই আলোচনা যুদ্ধাপরাধের

দিকে যায় এবং শাহবাগসহ অন্যান্য ঘটনা ঘটে।
অন্য একটা নোট থেকে একটা অংশ দিচ্ছি।

এইটা একটা ভালো প্রশ্ন—২০১৩ তে যা কিছু হয়েছে তা ২০১২ বা ২০১১ তে হয় নাই কেন? হঠাৎ করে বিগত চার বছরের বা তার আগের ৩৬ বছরের ধারাবাহিকতা ভেঙে ২০১৩ সালে বাংলাদেশ রাষ্ট্র এতো উত্তপ্ত হয়ে উঠল কেন? শাহবাগ, হেফাজত, এতোগুলো মানুষের মৃত্যু। কেন ২০১৩ সাল? কেন ২০১২ বা ২০১১ নয়? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজলে দেখবেন, ২০১৩ তে যা ঘটেছে তার একটা মূল কারণ, ২০১৩ ছিল ইলেকশন ইয়ার। জাতীয় সংসদের পাঁচ বছর মেয়াদি ক্ষমতা শেষ করে, ২০১৩ সালের শেষে এসে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হওয়ার কথা।
এবং ২০১৩ সালে যত ঘটনা ঘটেছে তা মূলত ইলেকশন ইয়ারের মজমা। বাকি সব রক্তপাত, বিচার, বিক্ষোভ, গণবিস্ফোরণ সবই হচ্ছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রায় ৮১,০০০ কোটি টাকার প্রত্যক্ষ বাজেট এবং তার কয়েকগুণ বেশি কালো টাকার দখল নেয়ার জন্যে সরকারি দল এবং বিরোধী দলের দ্বন্দ্বের একটা সাইড ইফেক্ট মাত্র।
বাংলাদেশের জনগণ কখনো পর পর দুইবার কোনো দলকে নির্বাচিত করে নাই। কারণ, মানুষ জানে একটা দল তার পাঁচ বছরে এমনভাবে দুর্বৃত্তায়নের কাঠামো তৈরি করে, তাকে না ভাঙলে পরবর্তী পাঁচ বছর সেইদল এই দেশের প্রতিটা কড়ি-বর্গা খুলে বেচে দেবে। রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত ক্ষমতাশীল ইন্সটিটিউশনের অভাবে এই ক্ষমতার পালাবদল বাংলাদেশের জনগণের কাছে ব্যাল্যান্স অব পাওয়ার বা শক্তির ভারসাম্য নিশ্চিত করার একমাত্র টুল। তাই বাংলাদেশের জনগণ বিগত ২০ বছরে কখনোই একই সরকারকে পরপর দুবার ক্ষমতায় আনে নাই।
আওয়ামী লীগ সেটা জানে। এবং এই প্যাটার্ন ভাঙার জন্যে তারা গত আড়াই বছর ধরেই নানা প্রস্তুতি এবং বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি নিয়েছে। সেই প্রস্তুতি এবং স্ট্র্যাটেজিগুলোর ফাইনাল বহিঃপ্রকাশ ঘটছে ২০১৩ সালে। এবং সেই স্ট্র্যাটেজি যখন কাজ করে নাই তখন সরকার কাউন্টার স্ট্র্যাটেজি নিয়ে এগিয়েছে, ফলে বিভিন্ন রকম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়েছে। শাহবাগ-হেফাজতের

সবকিছুই মূলত আওয়ামী লীগের ক্ষমতা ধরে রাখার গেমের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে জন্ম।

আমার এই ধারণাটার প্রমাণ পাবেন ২০১২ সালের শেষের একটা নোট থেকে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে এসে আমি পুরো ২০২ সালকে সামারি করি। এবং এই সামারিতে দেখবেন, ২০১২ ছিল আমাদের জাতির জন্যে খুব শান্তিপূর্ণ বছর। এবং ২০১২ সালের মূল ঘটনা ছিল হুমায়ূন আহমদের মৃত্যু এবং আওয়ামী লীগের দুর্নীতি বা এই ধরনের আলাপ বা সাগর-রুনি বা ফেলানি ইস্যু ইত্যাদি। এই নোটটা পড়লে ২০১৩ সালের পূর্বের বছর ২০১২ সালে আমাদের জাতির জীবনে কী আলোচিত ছিল তার একটা ধারণা পাবেন।

কিন্তু ২০১৩ যেহেতু ইলেকশন ইয়ার এইজন্যে এই ধরনের সেনসিটিভ আলোচনা পাবলিকের সামনে থেকে সরিয়ে দেয়া আওয়ামী লীগের জন্যে জরুরি ছিল। তাই আপনারা একটু এই নোটটা পড়েন। এটা ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়।

নোট ৩: যে সাতটা কারণে ২০১২-কে আমরা কখনও ভুলব না

(প্রকাশ: ৩১ ডিসেম্বর ২০১২)

হুমায়ূন আহমদের চলে যাওয়ার বছর

হুমায়ূন আহমদের যে ক্যান্সার হয়েছে সেটা অনেক পুরনো খবর। ক্যান্সার তো কতজনেরই হয়, রিকভার করে। হুমায়ূন আহমদ ছিলেন একজন ফাইটার।

তাই আমরা তেমন চিন্তা করি নাই। খবরে এসেছিল উনি রিকভার করছেন। পৃথিবীর সেরা হাসপাতালে বাংলাদেশের সেরা সাহিত্যিক-এর চিকিৎসা হচ্ছে। নিশ্চয়ই ভালই হচ্ছে। তাই উনার মৃত্যুর সংবাদটা ছিল একটা ভয়াবহ শক। উনাকে ছাড়া জীবন যে কত বড় এক শূন্যতা সেটা উনি চলে যাওয়ার পর বুঝতে পারছি আমরা। হুমায়ূন আমাদের তিন-চারটা জেনারেশানের মন আর মানস গড়ে দিয়েছেন। উনি একাই বাংলাদেশে একটা পাঠক শ্রেণি আর বইয়ের ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলেছেন। উনার চলে যাওয়া উনার প্রতিটা পাঠকের কাছে ছোটকালে এক সাথে অনেক বছর ধরে পথচলা একজন খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুর হঠাৎ চলে যাওয়ার মতো কষ্টকর। স্যার, আপনি যেখানেই থাকুন, ভালো থাকুন। উই

মিস ইউ সো মাচ!

শেয়ার মার্কেটে ধস মেনে নেয়ার বছর

শেয়ার মার্কেট পড়েছে ২০১০-এর শেষে। ভণ্ড পীরের পানি-পড়া দিয়ে ক্যান্সার সারানোর লোভ দেখানোর মতো লোভ দেখিয়ে ৩০ লক্ষ মধ্যবিত্তের সঞ্চয়কে শেয়ার মার্কেটে টেনে আনা হয়। সেই লোভে বাবার পেনশন, বোনের বিয়ের জন্যে জমানো টাকা, মায়ের গয়না বেচে বের করা টাকাকে দরবেশ আর লোটা-কম্বলদের হাতে তুলে দিয়ে সর্বস্বান্ত করে দেয়া হয়েছে লক্ষ লক্ষ পরিবারকে। ২০১০-এর শেষে সেই শেয়ার মার্কেট আমাদের অনেকের ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য করে দিয়ে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। ২০১১ গেছে তারপর প্রতিবাদে, মিছিলে। কিন্তু ২০১২ তে এসে, বাঙালি মেনে নিল এই শেয়ার মার্কেট। যেন এটাই ছিল ভবিতব্য। এই ভণ্ডপীর, দরবেশ আর লোটা-কম্বলের দেশে প্রতিবাদের কোনো মূল্য নেই। র‍্যাব আর পুলিশের বাড়ি খেয়ে সবাই চুপ মেরে গেছে। মাঝে মাঝে একটা দুটো আত্মহত্যার খবর কাগজের ভেতরের পাতায় জানান গিয়ে গেছে, মানুষ চুপ করে থাকলেও ক্ষরণ এখনো থামেনি।

পদ্মা ব্রিজের সিটকমের এক বছর

আমাদের টিভিতে ভালো কমেডি নাটক নাই। কিন্তু সেই শূন্যতা পূরণ করেছে সরকারের পদ্মা ব্রিজ ফিয়াস্কো। দেখার মতো ছিল এই নাটকটা। কী নাই! হিরো-এন্টি হিরো, অ্যাকশন-কমেডি, সাসপেন্স। কয়দিন বিশ্ব ব্যাংক, কয়দিন মালয়েশিয়া। তারপর চীন। তারপর না না, মালয়েশিয়া। বিশ্বব্যাংক খারাপ। ওদের চুরি কে দেখে? কিন্তু আবার বিশ্বব্যাংককে বলা, আমাদের এক টাকাও দুর্নীতি হয়নি, প্রমাণ দেন। মালয়েশিয়া ভালো। ভ্রাতৃপ্রতিম ইসলামি দেশ। এরপর আবার বিশ্বব্যাংক। চারটা শর্ত মানলেই হবে। আবার বিশ্ব ব্যাংক খারাপ। ডাক্তার ইউনুসের ষড়যন্ত্র। এরপর আবার বিশ্ব ব্যাংক। সবাই চুপ। কেউ এই নিয়া কথা বলবা না। আবুল কি আসামী হবে নাকি হবে না? বিশ্বব্যাংক খারাপ। ধুর্র! আচ্ছা ঠিক আছে, আবুল চোর, কিন্তু দেশপ্রেমিক। ধর ধর ধর, আবুলরে ধর!

২০১২ তে এটা স্বতঃসিদ্ধের মতো প্রমাণিত, সরকার ধরেই নিয়েছে আমরা

সবাই পাঁড় মাতাল বা গানজুট্টি বা হিরনচি।

রামু অঘটন—হাজার বছরের সহাবস্থানের সংস্কৃতিকে অপমানের বছর

সাম্প্রদায়িতা আমাদের দেশে নতুন না। সাম্প্রদায়িক সহিংসতা আমাদের দেশে ইতিপূর্বে কমবেশি হয়েছে। কিন্তু তার স্কোপ ছিল সীমিত। এবং সাধারণত কোনো বিশেষ ব্যক্তির উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে, মূলত সম্পত্তি দখলের জন্যে, সাম্প্রদায়িক ঘটনাগুলো ঘটেছে বেশি। অথবা কোনো ভূ-রাজনৈতিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে মৌলবাদীরা রাজনৈতিক ফায়দা নেয়ার জন্যে কোনো ঘটনা ঘটিয়েছে। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রশাসন শক্ত হাতে তা দমন করেছে। কিন্তু রামুর ঘটনাটা ছিল আনপ্রিসিডেন্টেড এবং ঐ ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। প্রথমত ঘটনাটা হয়েছে, আউট অব দ্য ব্লু। এর কোনো কনটেক্সট ছিল না। আমরা এমন এক জাতি যে জাতি হাজার হাজার বছর ধরে এক সাথে থেকেছে। আমাদের এই সৌহার্দ্য আমাদের অহংকার। মুসলিমপ্রধান আর কোনো দেশে এত সুন্দর সম্প্রীতি নাই। কিন্তু পুরো বিশ্বের সামনে আমাদের মাথা হেঁট হলো রামুতে ঘটা সাম্প্রদায়িক ঘটনায়। কিছু কুলাঙ্গারের জন্যে। এই লজ্জা ঘুচবার নয়।

ডেসটিনিসহ সব এমএলএম ব্যবসার ধরা খাওয়ার বছর

আওয়ামী লীগ আমলে মধ্যবিত্তের সম্পদ নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলা হয় তা কে না জানে? ডেসটিনি ছিল প্রায় দশ বছর ধরে। কিন্তু এই সরকারের আমলে তারা বিদ্যুৎগতিতে আগাতে থাকে। একদিকে শেয়ার মার্কেটে মূল্য বৃদ্ধি, অন্যদিকে এমএলএম। পাল্লা দিয়ে মানুষ তাদের সঞ্চয়ের টাকা এদের কাছে দিয়ে গেছে। বিশ্বাস করেছে ১০০ টাকা দিলে তা এক বছরে হয়ে যাবে ২০০ টাকা। এটাই তো হওয়ার কথা। শেয়ার মার্কেট যদি হয়, তো ডেসটিনি বা অন্য কোনো এমএলএম কেন নয়! টাকা ব্যাংকে রাখলে লস। সরকার নিজেই বলেছে, এই যে শেয়ারের দাম বাড়ছে মানে ইকোনমি ভালো। ডেসটিনির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তো বাণিজ্যমন্ত্রী নিজেই গেছে। যে প্রতিষ্ঠানের এমডি জেনারেল হারুনের মতো একজন সেক্টর কমান্ডার সেই প্রতিষ্ঠান কীভাবে খারাপ হবে? দাও দাও, আরো টাকা দাও। ওরা গাছ লাগাচ্ছে। সেই গাছ বড় হবে। বড় হয়ে ফুল ফল দিবে। সেই গাছের কাঠ থেকে ফার্নিচার হবে। কেন নয়! সব মিলে ধরা খেল

২০১২ তে।

তাও খেতে হলো, প্রথম আলোর প্রতিবেদনের পর, যেন কেউ আগে বলে নাই এই সম্পর্কে।

সরকারি ব্যাংক ধসে পড়ার বছর

সরকার যখন সরকারি ব্যাংকগুলোর ডাইরেকটর হিসেবে ছাত্রলীগের নেতা, ভার্সিটির তেল মারা শিক্ষক আর মন্ত্রী-মিনিস্টারদের ভাইপোদের নিয়োগ দেয়া শুরু করল, আমরা অনেকেই বলেছিলাম এটা খারাপ হচ্ছে। সরকার ঐ সময় আকাশে উড়ছিল ব্রুট মেজরিটির গর্বে। কারো কথা কানে দেয়নি। ফলে যা হওয়াটা অবশ্যম্ভাবী ছিল তাই হয়েছে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে জড়িত তারা জানে, ব্যাংক থেকে এই দেশে লোন পাওয়া কত কঠিন কাজ। কিন্তু এক অবিস্মরণীয় দুর্নীতির মাধ্যমে হলমার্কের মতো ভূঁইফোড় কোম্পানি ব্যাংক, প্রশাসন এবং রাজনীতিবিদ সহযোগে ৩,৬০০ কোটি টাকা ভূঁয়া লোন নিয়ে গেছে। শুধু হলমার্ক নয়, আরো অনেকগুলো কোম্পানি ১০০, ২০০ কোটি টাকা এইভাবে বের করে নিয়েছে। শুধুমাত্র ৩,৬০০ কোটি টাকার সাথে তুলনা করলে ফিগারগুলো কম বলে ওইগুলো আলোচনায় আসছে না!

মানুষের জীবনের দাম এক লাখ টাকা নির্ধারিত হওয়ার বছর

সারা বছর মানুষ মরেছে দুর্ঘটনায়। সরকার ছিল নির্বিকার। তাজরিন গার্মেন্টসে ১১২ জন শ্রমিক আগুনে পুড়ে মরে গেল, গার্ডার পড়ে মরলো নির্মাণ-শ্রমিক, লঞ্চ দুর্ঘটনায় মরলো যাত্রী, বাস উল্টে মরলো ৫০ জন ছাত্র। আমাদের গোল্ডফিশ মেমোরি, বেশি হলে এক সপ্তাহ থেকে ১০ দিন, বা মৃতের সংখ্যার দশের গুণিতক সপ্তাহ ধরে ঘটনাগুলো থেকেছে আমাদের কালেকটিভ মাইন্ডসেটে। কোনো মৃত্যুতে সরকারের টনক নড়েনি।

কোনো মানবিকতার প্রয়োজন নাই, কোনো উদ্বেগের প্রয়োজন নাই, কোনো জাগ্রত হওয়ার প্রয়োজন নাই, কোনো উদ্যোগের প্রয়োজন নাই। সরকারের স্ট্যান্ডার্ড রিঅ্যাকশান ছিল, নো প্রবলেম, পার পারসন এক লাখ টাকা। ২০১২ তে প্রমাণ হলো, আমাদের প্রতিটি মানুষের প্রাণের মূল্য এক লাখ টাকা।

যে দেশে ৫০% মানুষ দারিদ্র্য রেখার নিচে আর কিংবা ধারেকাছে থাকে, সেই

দেশে প্রতিটা প্রাণের মূল্য এক লাখ টাকা কম নয়। কী বলেন?
আসেন এখন সবাই খুশিতে কোলাকুলি করি।
সবাইকে হ্যাপি ২০১৩ মোবারক।

কে জানত, ২০১৩ সালকে হ্যাপি ২০১৩ বলে আহবান জানানোর পরও আমাদের জাতির জীবনে আনহ্যাপি ২০১৩ নেমে আসবে।

সামারি থেকে একটা জিনিস আমরা দেখি, তা হলো, ২০১২ সালের প্রধান ঘটনাগুলো ছিল আওয়ামী লীগের জন্যে অত্যন্ত অস্বস্তিকর। শেয়ার মার্কেট, পদ্মাব্রিজ নিয়ে সমালোচনা, ডেসটিনি, হলমার্ক কেলেঙ্কারি এবং এর মাধ্যমে সরকারি ব্যাংকগুলো ধসে যাওয়ার বছর।

আমি এখন হুট করে নিয়ে আসি আমার আর একটা নোট। ২০১৩ সালের শেষদিনে আমি একটা বিশাল সামারি করি যেটা এখন দেবো না, কিন্তু সামারিটার মূল পয়েন্টগুলো দেই।

সেখানে আমরা ২০১৩ সালের মূল ঘটনাগুলো দেখি।
শাহবাগ, শাহবাগ, শাহবাগ, আশা আর তঞ্চকতার শাহবাগ।
আস্তিক-নাস্তিক বিতর্ক।
সাঈদীর মৃত্যুদণ্ড রায়ের পরে সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভ।
হেফাজতের উত্থান।
হেফাজতের অভিযানে হামলা: ৫ মে রহস্য।
গোলাম আযমের ফাঁসি না হওয়া।
কাদের মোল্লার ফাঁসি।
হাসিনা-খালেদার ফোনালাপ।

আপনি পরিষ্কার দেখতে পাবেন, ২০১২ সালের মানুষের আলোচিত ইস্যু এবং ২০১৩ সালে মানুষের আলোচিত ইস্যু ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। এবং ২০১৩ সালে এসে সরকার, ২০১২ সালের সরকারি দুর্নীতির যে বিষয়গুলো সামনে এসেছিল এবং এর কারণে যে সমালোচনাগুলো হচ্ছিল তাকে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে দিতে সমর্থ হয়।

২০১২ সালের বিষয়গুলোতে সব ছিল জনস্বার্থ বিষয়ক ইস্যু যেখানে দলমত

নির্বিশেষে দেশের আপামর জনগণ সরকারের বিপক্ষে উচ্চকিত ছিল। কিন্তু ২০১৩ সালে এসে বিষয়গুলো সম্পূর্ণভাবে মানুষের সামনে থেকে হারিয়ে যায় এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রধান ইস্যু হয়ে ওঠে, মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালিয়ানা, ইসলামি জাতীয়তাবাদ, পাকিস্তান এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষের মতাদর্শিক ইস্যু যাতে বড় একটা অংশ সরকারের পক্ষে থাকে এবং বড় একটা অংশ সরকারের বিপক্ষে থাকে। কিন্তু দেশের সম্মিলিত যে বিবেক এবং চাওয়া, তা বিভক্ত থাকে।

যদি পলিসি হিসেবে দেখেন, তাহলে দেখবেন ২০১৩ সালে সরকারের এজেন্ডা ছিল বাংলাদেশ জাতির মধ্যে একটা আদর্শিক বিরোধ তৈরি করা যার ফলে সরকারের জন্যে সেনসেটিভ ইস্যুগুলো সামনে থেকে হারিয়ে যায়। এটার জন্যে ক্ষেত্র অবশ্য তৈরি ছিল। এবং সরকার সচেতনভাবে এই ইস্যুগুলোকে মেইনস্ট্রিম করে পুরো জাতির সামনে প্রধান সমস্যা হিসেবে হাজির করে। এই জন্যে যুদ্ধাপরাধের বিচার ছিল একটা টুল মাত্র। এবং এর ফলে আওয়ামী লীগ খুব সাফল্যের সাথে ২০১২ সালের তার জন্যে আলোচিত অত্যন্ত অস্বস্তিকর ইস্যু যেমন দুর্নীতি, পদ্মা সেতু, শেয়ার মার্কেট, হলমার্কের মাধ্যমে সোনালি ব্যাঙ্কের ৪,০০০ কোটি টাকা লুট যা বাংলাদেশের জন্মের পর সবচেয়ে বড় লুটের ঘটনা এবং বেসিক ব্যাঙ্ক, সোনালি, জনতা মিলে প্রায় ১২,০০০ কোটি টাকার লুট মানুষের আলোচনা থেকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। যেইটা ইলেকশান ইয়ারে সরকারের জন্যে অত্যন্ত জরুরি চাওয়া ছিল।

কিন্তু এই জায়গায় আমাদেরকে একটু সতর্ক থাকতে হবে। ২০১৩ সালের ঘটনাগুলো ইলেকশন ইয়ারে সরকারের ২০১২ সালের বিপর্যস্ত অবস্থা কাটানোর জন্যে সরকারের ঘটানো, এসব বলার সাথে সাথে একটা গ্রুপ আছে তারা বলে উঠবেন, ‘বলেছিলাম না শাহবাগও তো আওয়ামী ষড়যন্ত্র। শাহবাগীরা সব আওয়ামী লীগ, ইন্ডিয়ার গুটি।’ এবং এই কথা বলে তারা শাহবাগকে সম্পূর্ণ আওয়ামী রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র হিসেবে ডিলিজিটিমাইজ করেন। এটা তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক অবস্থান।

আমি ২০১৩ সালের রাজসাক্ষী। আমি ঘটনাপ্রবাহ যেভাবে দেখেছি তাতে আমি দেখেছি, শাহবাগ তরুণ সমাজের অ্যান্টিএস্টাব্লিশমেন্ট অংশের স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ফোরণ। যাক পরে এই আলোচনা আরও অনেক ডিটেইলে আসবে।

চ্যাপ্টার ৬. শাহবাগের প্রেক্ষাপট: জানুয়ারি মাস ছেঁকে দেখা

আমি এখন একটু দেখাই যে, শাহবাগের জন্মের আগে ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসটা কেমন গেছে। সেটা আমাদের শাহবাগকে বুঝতে হেল্প করবে।

আমি এই জন্যে কালের কণ্ঠের ডিজিটাল আর্কাইভের হেল্প নেব। প্রথম আলোরটা নিতে চেয়েছিলাম কিন্তু এই কাজটা যখন আমি শুরু করি তখন প্রথম আলোর আর্কাইভটা খুঁজে পাই নাই। পরে ওয়েবসার্চ করে যখন পেয়েছি, তখন আমি অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি।

আর্কাইভ থেকে জানুয়ারি মাস ফলো করার কারণ হলো, শাহবাগের গণবিস্ফোরণ হওয়ার আগের মাসটাকে ক্যাপচার করা। কাজেই আমি প্রতিদিনের কালের কণ্ঠের অনলাইন ভার্সন থেকে হেডলাইন এবং অন্যান্য নিউজ একটু বিশ্লেষণ করব। ছোট করে।

১ জানুয়ারি: ‘সব অবিশ্বাস-বিদ্বেষ ভুলে’ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের একটা কলাম নববর্ষের প্রথম দিন হিসেবে লিড নিউজ করছে পত্রিকাটি।

২ জানুয়ারি: ‘তলে তলে আলোচনা নয়, ষড়যন্ত্র হচ্ছে’ ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে খালেদা জিয়া।

জামায়াত নেতা আব্দুল্লাহ তাহের গ্রেফতার

মালিবাগে জামায়াত-শিবিরের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ

৩ জানুয়ারি: গোলাম আযমদের বাঁচাতে তৎপর পাকিস্তানি নেতারা

রাজশাহীতে শিবিরের ঝটিকা মিছিল, সংঘর্ষ

জানুয়ারি ৪: কঠোর আইন শুধুই পরিহাস: ধর্ষণসহ নারী নির্যাতনের ঘটনা দেশে

১৩ শিবিরকর্মীকে ৫ দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে প্রেরণ

চাঁদপুরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী: যুদ্ধাপরাধের বিচার আমাদের অস্তিত্বের লড়াই

৫ জানুয়ারি: ১৮ দলের হরতাল কাল: জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি উপলক্ষ

সামান্য টাকায় বিপন্ন মানুষ: আইএমএফের শর্ত মানতে তেলের মূল্যবৃদ্ধি, ভুল সিদ্ধান্ত!

৬ জানুয়ারি: সরকারের চার বছর পূর্তি আজ: ইশতেহার কাঁদে

৭ জানুয়ারি: জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি: সরকারের যুক্তি মেলে না

৮ জানুয়ারি: ৪০০ কোটি টাকার জমি দখল, বিমানবন্দর স্টেশনের পাশে তৈরি হচ্ছে দুটি বিপণিবিতান, দুই বছর ধরে চলছে যজ্ঞ

৯ জানুয়ারি: তাঁরা নিবন্ধন করবেন কোথায়: বেশিরভাগ ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্র অচল

নোয়াখালির জনসভায় সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রীর: আরেকবার আ.লীগকে ভোট দিন

১০ জানুয়ারি: সংলাপ চাই সংলাপ

৪৫ বছরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা

১১ জানুয়ারি: তাজরীনে অগ্নিকাণ্ড: স্বজনরা পুড়ছেন আরেক আগুনে

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে শেখ হাসিনা ‘আরেকটি এক-এগারো আনতে চায় বিরোধী দল’

১২ জানুয়ারি: অস্বস্তিতে সরকার শেষ বছরে: একের পর এক ‘অরাজনৈতিক’ আন্দোলন

১৩ জানুয়ারি: ১০ বাংলাদেশির প্রাণ কেড়ে নিল আগুন

আইনজীবীদের সভায় প্রধানমন্ত্রী ‘তত্ত্বাবধায়ক সরকার এলে কি খালেদা পার পেয়ে যাবেন?’

১৪ জানুয়ারি: বেতনের জন্য সোহেল তাজের স্বাক্ষর জাল!

বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব শেষ: লাখো কণ্ঠে শান্তির জন্য প্রার্থনা

প্রধানমন্ত্রী মস্কো যাচ্ছেন আজ: ৮ হাজার কোটি টাকার অস্ত্র কিনছে সরকার

এই প্রেক্ষিতে আমি একটা নোট লিখি। বাংলাদেশ কি রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে গেল কিনা সেটা নিয়ে। কিন্তু এইখানে লেখাটা দিচ্ছি না, কারণ, এই বইয়ের প্রেক্ষাপটে সেই লেখাটা গুরুত্বপূর্ণ না।

১৫ জানুয়ারি: সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ড: তদন্তে নতুন মোড়

রাজশাহীতে পুলিশের গাড়িতে শিবিরের আগুন

১৬ জানুয়ারি: টিআর কর্মসূচি: এলাকা নেই তবুও ১৮০ টন গম

বাম দলগুলোর হরতাল

১৭ জানুয়ারি: মির্জা ফখরুলকে জেলে রাখতে মামলার ফাঁদ

খালেদাকে নির্বাচনের বাইরে রাখতেই মামলা: বিএনপি

১৮ জানুয়ারি: আবুলকে আসামি করলেই অর্থছাড়!

বৌদ্ধ জনপদে হামলা: বিচার না পাওয়ার আশঙ্কা বৌদ্ধদের

১৯ জানুয়ারি: দুই শতাধিক অবৈধ আইনে চলছে দেশ
২০ জানুয়ারি: ছাত্রলীগের গুলিতে শিশু নিহত
২১ জানুয়ারি: মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার: কলঙ্ক মোচনের রায় আজ
এই দিন জামায়াতের নেতা বাচ্চু রাজাকারের রায় দেয়া হয়। এবং আমি এই দিন একটা নোট লিখি। এই নোটটা পড়েন। কারণ এটা পড়লে বুঝতে পারবেন আওয়ামী লীগের বিচার করতে চাওয়ার ন্যারেটিভের সাথে আমি এবং আমার মতো আরও অনেকের বিচার চাওয়ার ন্যারেটিভের পার্থক্য কোথায়।
যে দুটি গ্রুপের মধ্যে শাহবাগে দ্বন্দ্ব হয়েছিল, তাতে আমি যে ন্যারেটিভটা বলেছি সেইপক্ষের লোক গো-হারা হেরে গেছে। তবুও এটা পড়েন।

নোট ৪: বাচ্চু রাজাকারের ফাঁসির রায়ের দিনের চেতনা আমার কাছে এটাই

(প্রকাশ: জানুয়ারি ২১, ২০১৩)
বাচ্চু রাজাকারের ফাঁসির আদেশে আমাদের অনেক বছরের জমানো পাপের ক্ষয় হলো। ৩০ লক্ষ শহীদের হত্যার কোনো বিচার হল না, একটা মানুষ জেল পর্যন্ত খাটলো না, কারো ফাঁসি হলো না, এটা একটা ভয়াবহ অন্যায় যা আমরা পুষে রেখেছিলাম ৪১ বছর ধরে। সেই পাপ থেকে নিজেদের মুক্ত করার পথে আমরা একটা স্টেপ নিলাম। এরপর গোলাম আযম, নিজামি, সাকা, কাদের মোল্লা, সাঈদীসহ সকলের বিচার হবে সেটা আমাদের সকলের প্রত্যাশা।
এই বিচার না হওয়াতে দেশ ক্রমাগত বিভক্ত হচ্ছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের আর বিপক্ষের শক্তি, এই বিতর্কে। ৪১% মানুষের দ্রারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা একটি দেশের জন্যে দেশের ডেভেলপমেন্ট ইস্যু বাদ দিয়ে ৪১ বছর ধরে চলা খুব এক্সপেন্সিভ একটা ডিবেট এটা। এই সময়ে চীন, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া আমাদের সমপর্যায় থেকে অনেক সামনে চলে গেছে। এমনকি মাত্র ১৫ বছরে ভিয়েতনাম-কম্বোডিয়া আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে গেছে। ভিয়েতনাম এখন ২৫,০০০ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে, আমরা করি ৬,০০০। মাত্র ১৯৯৬ সালে ভিয়েতনাম আর আমরা একই পরিমাণ, মানে, ২,০০০ গিগা ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতাম।
আওয়ামী লীগ নিজেও এই বিচারটা জিইয়ে রেখে পলিটিক্যাল গেম চালিয়েছে অনেক দিন। ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির স্পিরিটের সাথে প্রতারণা করে

আওয়ামী লীগের ৯৫-এর সরকার পাঁচ বছরে একবারও এই বিচারের কথা মুখে আনেনি।

রাজনৈতিক বাস্তবতার জন্যে হোক আর যে কারণেই হোক সেই বিচার আজ শুরু হয়েছে এবং একজন শীর্ষ রাজাকার বাচ্চু রাজাকারের ফাঁসির আদেশ হয়েছে। এটা আমাদের জাতির জন্যে অনেক বড় একটা পাপক্ষয় এবং এই জন্যে আওয়ামী লীগকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হবে। বিএনপিসহ আর যে সব রাজনৈতিক দল 'ইফ কিন্তু বাট' বলে এই বিচারকে পাশ কাটিয়ে এই সব রাজাকারদের মুক্তি দিতে চায় তাদের জন্যে শুধু ঘৃণা।

আমরা এমন একটা প্রজন্ম যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সুফল হিসেবে একটা স্বাধীন দেশে জন্ম নিয়েছি। যেখানে আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারি নির্ভয়ে। যেখানে আমরা নিজেদেরকে বাঙালি জাতি বা বাংলাদেশি হিসেবে পরিচয় দিতে পারি নির্ভয়ে। আছে বলেই বুঝি না এটা কত বড় একটা অর্জন। ৩০ লক্ষ শহীদ তাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমাদের এই দেশ দিয়ে গেছেন। তাদের এই আত্মত্যাগের সাথে বেঈমানি আমরা করতে পারি না। যারা করে তারা পরিত্যাজ্য।

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান স্পিরিট ছিল এই দেশের প্রতিটা মানুষের জন্যে অর্থনৈতিক মুক্তি। সেই স্পিরিট আজও বহমান। আমরা এখনো পৃথিবীর ২০টা দরিদ্র্যতম দেশের মধ্যে আছি। সরকারি হিসেবে আমাদের ৭৬% জনগোষ্ঠীর আয় দৈনিক ১৬০ টাকার নীচে। দারিদ্র্যসীমা নয়, কিন্তু এই আয়ে এই দেশে মানুষ হিসেবে সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। ১৭ কোটি মানুষের মধ্যে ১৩ কোটি মানুষ এই আয়ের মধ্যে আছে যার মধ্যে আরো ৭ কোটি মানে ৪১% জনগণ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে অনেক অনেক কিছু করার আছে। সেগুলো হচ্ছে না। এবং একটা গ্রুপ জাতিকে বিভক্ত করে তার অ্যাডভ্যানটেজ নিচ্ছে। বাচ্চু রাজাকারের রায়ের দিনে এই সত্যটা মনে রাখা খুব ইম্পর্টেন্ট। মুক্তিযুদ্ধের তথাকথিত পক্ষের-বিপক্ষের শক্তি উভয়ের জন্যেই।

আজ এই ঘৃণ্য বাচ্চু রাজাকারের বিচারের মাধ্যমে সেই স্পিরিট এবার জেগে উঠুক। এই বিভক্ত জাতি আবার শহীদদের আত্মত্যাগের চেতনায় আরো একবার একত্রিত হোক। যেসব মানুষেরা, শিশুরা, বৃদ্ধরা এখনো পাঁচটি মৌলিক চাহিদার অধিকার পায়নি তাদের জন্যে আমরা নতুন মুক্তিযুদ্ধে নামি। বিভেদ ভুলে একত্রিত হই।

বাচ্চু রাজাকারের ফাঁসির রায়ের দিনের চেতনা আমার কাছে এটাই।

২২ জানুয়ারি: সর্বত্র একই প্রশ্ন, বাচ্চু রাজাকার কোথায়?

মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার ফাঁসির আদেশে কলঙ্কমোচন শুরু

এই খানে একটু বলে রাখা ভালো। বাচ্চু রাজাকার তার রায়ের আগেই, ইন্ডিয়াতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

বাচ্চু রাজাকারকে পালিয়ে যেতে দিয়ে পুলিশি নাটক করার ঘটনাটা তখন আবারো সামনে আসে এবং কিছু কিছু লোক বলা শুরু করে, 'আগেই কইছিলাম বিচার হইলেও ফাঁসি হইবো না। তলে তলে আঁতাত করা হইছে'।

২৩ জানুয়ারি: রায়ের নথি থেকে: চার মাসে ২২ হাজার রাজাকার নিয়োগ করেছিল পাকিস্তান

২৪ জানুয়ারি: আটক ১০, রাজধানীতে শিবিরের ঝটিকা মিছিল, পুলিশি বাধা

গাইবান্ধার জামায়াত কার্যালয়ে আগুন দিয়েছে বিক্ষুব্ধ জনতা

জামায়াত নিষিদ্ধ করা সরকারের নৈতিক দায়িত্ব

২৫ জানুয়ারি: সারা দেশে আবারও শিবিরের তাণ্ডব ঢাকা, রাজশাহী, গাইবান্ধা ও রাজবাড়ীতে ঝটিকা মিছিল, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ

২৭ জানুয়ারি: আবার আগুন আবার তালা: নিঃশেষ ৭ প্রাণ

২৮ জানুয়ারি: আবারও সহিংস জামায়াত-শিবির

রাজশাহীতে পুলিশের সঙ্গে শিবিরকর্মীদের সংঘর্ষ

২৯ জানুয়ারি: জামায়াত-শিবিরের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই বলে জানিয়েছেন বিএনপি নেতারা।

সংবাদ সম্মেলনে হানিফ: 'জনগণ চাইলে নিষিদ্ধ করা হবে জামায়াতকে'

৩০ জানুয়ারি: কুমিল্লায় উপজেলা শিবির সভাপতিসহ আটক ২

৩১ জানুয়ারি : ৩১ জানুয়ারি শিবিরের হামলার মাত্রা বেড়ে যায়, যা নিউজেই পাবেন।

হরতাল ডেকেই ফের জামায়াত-শিবিরের 'ঘূর্ণিসন্ত্রাস'

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিজিবি তলব: বগুড়ায় সহিংস হরতালে শিবিরের নেতাসহ নিহত ৩

যশোরে শিবিরের সঙ্গে সংঘর্ষে পুলিশ কনস্টেবলের মৃত্যু

যশোরের মনিরামপুরে হরতালে জামায়াত-শিবিরকর্মীদের হামলায় এক পুলিশ সদস্য নিহত ও ১০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে পুলিশ সদস্য ও

শিবিরকর্মী রয়েছে।
রাজশাহীতে পুলিশ পাহারায় শিবিরের মিছিল
সারা দেশে জামায়াতের হরতালে ব্যাপক সহিংসতা
পুলিশ সদস্য হত্যা, চোরাগোপ্তা হামলা, গাড়ি ভাংচুরের মধ্য দিয়ে ঢাকার বাইরে সারা দেশে জামায়াতের হরতাল চলছে আজ। হরতালে যশোরে শিবিরের হামলায় জহুরুল নামের এক পুলিশ সদস্যের মৃত্যু হয়েছে।

চ্যাপ্টার ৭. ফেব্রুয়ারি ২০১৩: বাংলাদেশকে বদলে দেয়া শাহবাগের গণজাগরণের মাস

১ ফেব্রুয়ারি: হরতালের সংঘাতে নিহত ৫
বগুড়ায় জামায়াত-শিবিরের তিন নেতা-কর্মী মণিরামপুরে এক পুলিশ, ফেনীতে অটোরিকশার চালক নিহত ঢাকা ও চট্টগ্রামে গাড়ি ভাংচুর, আগুন
পঞ্চগড়ে প্রধানমন্ত্রী: হরতাল দিয়ে বিচার ঠেকানো যাবে না
২ ফেব্রুয়ারি: সবাইকে অবাক করে দিয়ে ২ তারিখ থেকে একটা পরিবর্তনের সূচনা হয়। হঠাৎ করে পুলিশ বিগত ৬ মাসের ধারা ভেঙে শিবিরকে মিছিল করতে দেয়।
কালের কন্ঠের রিপোর্টটার কিছুটা প্রতিবেদনের অংশসহ দিচ্ছি।

রাজধানীতে জামায়াত শিবিরের মিছিল

'পুরো সময় পুলিশ মিছিলের কাছাকাছি অবস্থানে থাকলেও বাধা দেয়নি। এমনকি সমাবেশেও নয়। সমাবেশে ঢাকা মহানগর জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি সেলিমউদ্দীন পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, জামায়াত-শিবিরের গণতান্ত্রিক কর্মসূচিতে বাধা না দিলে আমরাও শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি করতে পারি।'

৩ ফেব্রুয়ারি: পুলিশ-জামায়াত সমঝোতায় ঢাকায় লাঠি মিছিল (ভেতর থেকে দুইটা লাইন দিচ্ছি)

পুলিশের ভাষ্য: কেন সন্ত্রাসকারী জামায়াত-শিবিরের মিছিলে বাধা দেওয়া হলো না, এমন প্রশ্নের জবাবে মতিঝিল বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. আনোয়ার হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, জামায়াতের একজন সংসদ সদস্য ফোন করে মৌখিকভাবে শান্তিপূর্ণ মিছিল-সমাবেশের অনুমতি চেয়েছিলেন। এ

কারণে তাদের মিছিল করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে৷ ডিসি আনোয়ার হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, আগেও জামায়াতের তরফ থেকে বিক্ষোভ মিছিলের অনুমতি চাওয়া হয়েছে, কিন্তু আমাদের কাছে গোপন খবর ছিল যে, তারা হামলা চালাতে পারে৷ এ কারণে তাদের তখন অনুমতি দেওয়া হয়নি৷ তিনি বলেন, জামায়াত তো কোনো নিষিদ্ধ দল নয়৷

আমাদের সময়ের রিপোর্ট

জামায়াতে সরকারের নীতি কি: প্রশ্ন সংসদে

ডেস্ক রিপোর্ট: সাম্প্রতিক সহিংস কর্মসূচির পর জামায়াত-শিবির বিষয়ে সরকারের নীতি পরিবর্তন হয়েছে কিনা সে বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতির দাবি উঠেছে সংসদে৷ মাগরিবের নামাজের বিরতির পর পয়েন্ট অব অর্ডারে জাতীয় সংসদে এ দাবি তোলেন জাসদের সংসদ সদস্য মইন উদ্দিন খান বাদল৷

পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে মইন উদ্দিন খান বাদল বলেন, গত কয়েকদিন ধরে পত্রিকায় দেখছি কতিপয় দেশদ্রোহী পুলিশের ওপর হামলা করছে৷ পুলিশ রাস্তায় পড়ে গেলেও লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে৷ একজন পুলিশকে ৫ জন মিলে মারছে৷ পরে দেখা গেছে, জামায়াত বুক ফুলিয়ে রাজধানীতে মিছিল করছে৷

বাদল বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী এখানে (সংসদে) নেই৷ এ বিষয়ে তাদের বিবৃতি দাবি করছি৷ জামায়াত বিষয়ে সরকারের নীতি কি? তারা ট্রাইব্যুনালের বিরোধিতা করছে৷ তাহলে মারামারি করতে পারলে, আগুন দিতে পারলে, পুলিশ মারতে পারলে, হত্যা করতে পারলে সরকারের নীতি কি পরিবর্তন হবে? জামায়াত-শিবিরকে সরকারের পক্ষ থেকে ওয়াকওভার দেওয়া হয়েছে কি না এমন প্রশ্নও রাখেন বাদল৷

৪ ফেব্রুয়ারি: সমাবেশ শেষে মিছিল: রাজধানীর মতিঝিলে শেষ হলো জামায়াতের সমাবেশ

প্রথম আলোর নিউজ

বিকেলে পুলিশকে শিবিরের ফুল, রাতে ককটেল!

আমাদের সময়ের রিপোর্ট

বিএনপি বিপদ, আওয়ামী লীগ আপদ

'সরকার জামায়াতে ইসলামীর জঙ্গি মিছিলে প্রটোকল দেয় আর বামপন্থিদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে পিপার স্প্রে নিক্ষেপ করে৷'

সিপিবি সভাপতি বলেন, সরকার একদিকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করছে,

অন্যদিকে আগামী নির্বাচন নিয়ে গোপনে জামায়াতের সঙ্গে আঁতাতের চেষ্টা করছে।

তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি এদেশের জনতার। তাই এ বিচার নিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টা করলে পরিণতি হবে ভয়াবহ।

৫ ফেব্রুয়ারি: রায়ের আগের দিন বিএনপিকে খুব নার্ভাস মনে হয়। তাদের অনেক নেতা বলতে থাকে সরকারের সাথে জামায়াতের একটা সমঝোতা হচ্ছে। তারা সন্দেহ করেন সরকার বিএনপিকে বাদ দিয়ে জামায়াতের সাথে নির্বাচনে যাবে এবং এর জন্যে শিবিরকে পুলিশ গত এক বছরে ধারাবাহিকতা ভেঙে প্রথম মিছিল করতে দিচ্ছে। কালের কণ্ঠের এই রিপোর্টে সেই ইঙ্গিত আছে। এবং খেয়াল করবেন শাহবাগের গণবিস্ফোরণ যে দিন হয় সেদিন জামায়াত হরতাল ডেকেছিল এবং সেই হরতালে বিএনপি সমর্থন দেয় নাই, যেহেতু বিএনপি সরকারের সাথে জামায়াতের একটা গোপন পরিকল্পনা হচ্ছে সন্দেহ করছিল।

এই দিনের কালের কণ্ঠের রিপোর্টটা আমি পুরোই নিচে তুলে ধরলাম। এই নিউজটা শাহবাগের গণজাগরণ হওয়ার একই দিনে প্রকাশিত। এখানে জামায়াতের সঙ্গে বিএনপির টানাপড়েন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

ট্রাইব্যুনাল ভাঙার দাবি জামায়াতের সঙ্গে একমত নয় বিএনপি: তরিকুল

কালের কণ্ঠের রিপোর্ট

‘সরকারবিরোধী আন্দোলন ও হরতালকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে টানাপড়েন শুরু হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জামায়াত নির্বাচনে যোগ দিতে পারে—এ কথা মাথায় রেখে হিসাব-নিকাশও শুরু করেছে বিএনপি। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বাতিলের দাবিতে ১৮ দলীয় জোটের শরিক জামায়াত আন্দোলন করলেও বিএনপি এ দাবিতে আন্দোলন চায় না। বরং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে শরিকদের নিয়ে আন্দোলন জোরদার করতে চায় দলটি। ট্রাইব্যুনাল বাতিলের দাবিতে আন্দোলন জামায়াতের নিজস্ব কর্মসূচি; এতে শামিল হতে চায় না বিএনপি। কিন্তু জামায়াত তত্ত্বাবধায়কের দাবির পাশাপাশি তাদের শীর্ষ পাঁচ নেতার মুক্তির দাবিতে বিএনপিকে পাশে চায়।

একাত্তরে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত জামায়াত নেতা আবদুল কাদের মোল্লার বিচারের রায় ঘোষণা হওয়ার কথা আজ। রায়ের দিনই সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডেকেছে জামায়াত। সরাসরি ট্রাইব্যুনালের বিরুদ্ধে হরতাল ডাকায় আজকের হরতালে বিএনপি সমর্থন দেয়নি। এ কারণে বিএনপির ওপর নাখোশ জামায়াত। তারপরও সমর্থন আদায়ের জন্য বিএনপির সঙ্গে দেনদরবার চালিয়ে যাচ্ছে তারা। সূত্র জানিয়েছে, জামায়াত যতই ক্ষুব্ধ হোক, ট্রাইব্যুনালের বিরুদ্ধে যাবে না বিএনপি।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য তরিকুল ইসলাম গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'একাত্তরে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বাতিলে জামায়াতে ইসলামীর দাবির সঙ্গে বিএনপি একমত নয়। জামায়াতের দাবির সঙ্গে আমাদের আদর্শিক সম্পর্ক নেই। আমরা ওই দাবির সঙ্গে একমত নই। একমত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।' তবে তিনি মনে করেন, একটি রাজনৈতিক দলের সভা-সমাবেশ করার গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে।

গত কয়েক মাসে জামায়াত-শিবির বড় ধরনের সভা-সমাবেশ করতে পারেনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বাধার কারণে। তবে মাঝেমধ্যে চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়েছে পুলিশের ওপর, ঝটিকা মিছিলও করেছে তারা। গত শনিবার ও গতকাল সোমবার হঠাৎ ঢাকার রাজপথে বিনা বাধায় বিক্ষোভ-সমাবেশ করে তারা। এর আগের বৃহস্পতিবার হরতালের দিনে জামায়াত-শিবির পুলিশের সঙ্গে সমঝোতা করে রাজশাহী, খুলনা ও চাঁদপুরে মিছিল করে। সমঝোতা করে সমাবেশ-মিছিল করায় বিএনপির মধ্যে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। জামায়াতকে সন্দেহের চোখেও দেখছেন বিএনপির অনেকে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিএনপির নীতিনির্ধারক পর্যায়ের এক নেতা গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, হয়তো সরকারের সঙ্গে জামায়াতের আঁতাত হয়ে গেছে। এই জামায়াতই ১৯৯৬ সালে বিএনপির বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আন্দোলন করেছিল। এবারও যে আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাদের আঁতাত হবে না—এ কথা এখনই বলা কঠিন।

বিএনপির এই নেতা বলেন, রাজনীতিতে আওয়ামী লীগকে বিশ্বাস করা কঠিন, জামায়াতকে বিশ্বাস করা আরো কঠিন। আওয়ামী লীগ নির্বাচন সামনে রেখে ১৮ দলীয় জোট ভাঙার ষড়যন্ত্র করছে। জামায়াতকে নিয়ে নির্বাচন করতে চায়

তারা। দীর্ঘদিন ধরে জোট ভাঙার এ ষড়যন্ত্র চলছে।

ঢাকা মহানগর জামায়াতের এক নেতা বলেন, 'আজকের হরতাল আমাদের দলের নিজস্ব কর্মসূচি। এ হরতালে বিএনপি সমর্থন দেবে কি দেবে না, সেটা তাদের একান্ত ব্যাপার। তবে গত বৃহস্পতিবারের হরতালের প্রতি বিএনপি ও কয়েকটি শরিক দল সমর্থন দিয়েছিল।'

একই দিনে মানবজমিনের রিপোর্ট

সরকার-জামায়াত সম্পর্ক নিয়ে ধূম্রজাল!

একই দিন বাংলাদেশ প্রতিদিনের রিপোর্ট ছিল,

ট্রাইব্যুনাল বাতিলে জামায়াতের সঙ্গে একমত নয় বিএনপি: তরিকুল

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সমন্বয়ক তরিকুল ইসলাম বলেছেন, মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার বন্ধ করা কিংবা ট্রাইব্যুনাল ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে বিএনপি একমত নয়। এ ক্ষেত্রে জামায়াতের সঙ্গে বিএনপির আদর্শিক মিল নেই। তবে এ বিচার আরও স্বচ্ছ ও আন্তর্জাতিক মানের করার দাবি জানান তিনি।

জামায়াতের সব কর্মসূচিতে বিএনপির সমর্থন আছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সভা-সমাবেশ করতে না দেওয়ার প্রতিবাদে জামায়াতের ডাকা হরতালে বিএনপির সমর্থন ছিল। কারণ জনসভা করাটা যে কোনো দলের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু ট্রাইব্যুনাল ভেঙে দেওয়া কিংবা মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার বন্ধের দাবিতে জামায়াতের ডাকা হরতাল কিংবা অন্য কোনো কর্মসূচিতে বিএনপির সমর্থন নেই। ট্রাইব্যুনাল বাতিল, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাতিলের সঙ্গে বিএনপির কোনো আদর্শিক মিল নেই।

জামায়াতের ট্রাইব্যুনাল ভেঙে দেওয়ার দাবির সঙ্গে বিএনপি একমত কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে তরিকুল বলেন, 'প্রশ্নই ওঠে না। আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই। সে বিচার নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ হতে হবে, আন্তর্জাতিক মানের হতে হবে। কোনো দলীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নের বিচার হবে না। তিনি আরও বলেন, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, এ বিচার বিতর্কিত হচ্ছে। আমরাও তাই বলছি। বিচার স্বচ্ছ হচ্ছে না।'

খুব খেয়াল করেন, ট্রাইবুনাল ভেঙে দেয়ার দাবির সঙ্গে বিএনপি একমত কিনা প্রশ্নে তরিকুল ইসলামের উত্তর।

একই দিন আমাদের সময়ের রিপোর্ট

জামায়াতকে নিয়ে জোট করতে চাইছে সরকার: বিএনপি

তারেক সালমান: সরকার জামায়াতে ইসলামীকে নিয়ে রাজনৈতিক জোট করার ষড়যন্ত্র করছে বলে দাবি করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী জামায়াতের উদ্দেশ্যে এখন রবি ঠাকুরের গান 'এসো এসো মোর ঘরে এসো, বাইরে নয় অন্তরে এসো' এই গান গাইছেন। এই গানের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী জামায়াতকে দাওয়াত দিয়ে জোট করতে চাইছেন। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানাকে দুই মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী করার জন্য মহাজোট সরকার সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ নিচ্ছে। সরকার সংবিধানকে পারিবারিক সম্পদের মতো ভোগ করছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে আগে বলা হয়েছে জামায়াত-শিবির দেখামাত্র গুলি করো। কিন্তু গতকাল শনিবার বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের আচরণ দেখে মনে হয়েছে জামায়াত-শিবিরকে সালাম করার জন্য প্রধানমন্ত্রী পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন।

শাহবাগের গণজাগরণের পূর্বের কিছু দিনের পত্রিকায় দিনপঞ্জির অ্যানালিসিস

২১ তারিখ বাচ্চু রাজাকারের রায় হয়। এই রায়ের পর থেকেই জামায়াত এবং শিবিরের হামলার ইন্টেন্সিটি অনেক বেড়ে যায়। শিবিরের সাথে সংঘর্ষে দুই-একজন পুলিশ নিহত হয়। কয়েক জায়গায় জামায়াত এবং শিবির পুলিশকে পিটায় যার অনেকগুলোর ছবি পেপারে আসে। এবং শিবিরের বেশ কয়েকজন কর্মী নিহত হয়। এবং শিবির এই অবস্থায় চরম হার্ড লাইনে গিয়ে ঢাকার ভেতরেও বেশ কিছু ঝটিকা মিছিল করে। এবং এতে বেশ কয়েক জায়গায় পুলিশকে পিটানো হয়। মতিঝিলে পুলিশ পিটানোর ঘটনাটা সব মিডিয়া হাইলাইট করে। ৩১ জানুয়ারি জামায়াত ও শিবির হরতাল দেয়। কিন্তু পুলিশ কোথাও শিবিরকে বা জামায়াতকে দাঁড়াতে দেয় নাই।

কিন্তু ২ ফেব্রুয়ারি থেকে ঘটনা চেঞ্জ হতে থাকে যেটাতে মানুষ সম্পূর্ণ কনফিউজড হয়ে পড়ে যে, ঘটনা কী হচ্ছে? ২ ফেব্রুয়ারি পুলিশের প্রহরায় ঢাকায় জামায়াত এবং শিবির মিছিল করে। এই সময় শিবিরের তরফ থেকে

পুলিশকে ফুল দেয়ার খবর আসে।

এটা একটা টার্নিং পয়েন্ট। এই বিষয়ে প্রথম আলোর সংবাদের নিচে পাঠকদের মন্তব্য ছিল,

—ব্যাপারটা রহস্যময়।

—হঠাৎ ইউটার্ন কেন?

—গোপন কোনো সমঝোতা নয় তো?

—ম্যাচ ফিক্সিং হচ্ছে?

এই সময় বিএনপির নেতারাও সিগনাল দিতে থাকে যে সরকারের সাথে জামায়াতের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে, যার ফলে জামায়াত সরকারের সাথে নির্বাচনে যেতে পারে। এই জন্যে জামায়াতের সাথে বিএনপির ফাটল ধরে। ৫ তারিখে বিএনপি নেতা তরিকুল বলেন, তারা ট্রাইবুন্যাল বাতিলের পক্ষে না কিন্তু রাজনৈতিক দলের সভা-সমিতি করার অধিকার তাদের আছে।

তরিকুলের এই বক্তব্যটা তখন অনেকগুলো মিডিয়াতে হাইলাইট করা হয়। বিএনপি ট্রাইবুন্যাল বাতিলের পক্ষে না, এই বক্তব্যটাও বিএনপির মুখে একটা নতুন ধরনের গান ছিল। সবাই অবাক হয়ে ওঠে কী ব্যাপার, খেলা পাল্টে যাচ্ছে নাকি!

এবং বিএনপির সন্দেহ এত প্রবল হয়ে ওঠে যে, তারা বলা শুরু করে তারা ট্রাইবুনালের ভেঙে দেয়া চায় না। তারা বিচার চায়। বিএনপির নেতাদের কথা শুনলে বুঝবেন, এই সময় তাদের টেনশন ছিল, সরকার হয়তো জামায়াতের সাথে আসন্ন কাদের মোল্লার রায় অথবা সামগ্রিকভাবে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ আসছে, যার প্রেক্ষাপটে জামায়াতের সাথে তাদের জোট ভেঙে যাবে। এবং সরকার জামায়াতের সাথে ইলেকশানের চলে যাবে, বিএনপিকে বাইপাস করে।

আমরা যদি গণজাগরণের দিনের রিপোর্টগুলো দেখি, তাতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন পত্রিকায় ৫ ফেব্রুয়ারি খুব পরিষ্কার ভাষায় রিপোর্ট হয় যে, সরকারের সাথে জামায়াতের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে। আরো দেখবেন, কাদের মোল্লার রায় যেদিন হয়েছে, সেইদিন জামায়াত হরতাল ঘোষণা করেছিল এবং সেইদিনের হরতালে বিএনপি সমর্থন দেয়নি।

এই সময় জনমনে একটা ব্যাপক সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে সরকারের সাথে জামায়াতের একটা আঁতাত হয়েছে। এবং কাদের মোল্লার ফাঁসি হবে না। এই ধরনের একটা প্রেক্ষাপটে ৫ ফেব্রুয়ারি রায় হয় যে, কাদের মোল্লা অপরাধী কিন্তু

তার শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। এতে সারা দেশের মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই রায়ের প্রতিক্রিয়ায় সরকার পক্ষের কিছু সিনিয়র লোকজন এতদিনের প্রথা ভেঙে বলে যে, তারা অখুশি নয়। যদিও সরকার পক্ষে অনেক লোকই এই রায়টার প্রতিবাদ করে। কিন্তু বাদ-প্রতিবাদের এই ধারাটা আওয়ামী লীগের গত এক বছরের ন্যারেটিভের সাথে যায় না।

নীচে রায়ের ঠিক পরপরই প্রথম আলোর রিপোর্ট

জামায়াতের তরুণ কর্মীদের প্রশংসা টুকুর

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক টুকু বলেছেন, 'ট্রাইব্যুনালের কর্মকাণ্ডে সরকারের যে কোনো প্রভাব নেই, তা জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল কাদের মোল্লার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশের রায়ে প্রমাণিত হয়েছে।' এ সময় প্রতিমন্ত্রী জামায়াতের প্রশংসা করে বলেন, জামায়াতের তরুণ কর্মীরা নিজামী, মুজাহিদের চেয়ে ভালো।

আজ মঙ্গলবার জামায়াতের নেতা কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার পর সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। কিন্তু এই রায়ে মানুষের মনে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম নেয়। কারণ, কাদের মোল্লার বিষয়ে পেপারে তখন যেসব নিউজ আসছিল তাতে জনমনে এই মেসেজটা গেছে, তা হলো ৩০০টি হত্যার জন্যে কাদের মোল্লা অপরাধী। কিন্তু অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পরও সরকারের সাথে জামায়াতের গোপন সমঝোতার কারণে তার রায় বদলে দিয়ে ফাঁসি থেকে যাবজ্জীবন হয়েছে। সংসদে বাম এমপি রাশেদ খান মেনন বলেন বলেন, মাননীয় স্পিকার, যে সাপ নিয়ে খেলছি এ সাপের মুখে চুমু দিতে নেই। সাপের মুখে চুমু দিলে ছোবল মারবেই।

মইন উদ্দীন খান বাদল বলেন, 'একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বলতে চাই, এ ইস্যুটি সমঝোতা যোগ্য নয়। অসমঝোতামূলক একটি বিষয় নিয়ে সমঝোতা করা হচ্ছে।'

এবং এই বিষয়ে আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্যা সংসদ উপনতো সাজেদা চৌধুরী বলেন, 'যে বিষয়টি নিয়ে কথা হচ্ছে—সেটি আদালত সংক্রান্ত। এটা নিয়ে মুক্ত আলোচনা করা ঠিক হবে না। তারিখ ঠিক করে সংসদ নেতার পরামর্শ নিয়ে আলোচনা করা উচিত।'

রায়ের পরে সাজেদা চৌধুরীর এই বক্তব্যটা খুব খেয়াল করার মতো। বিচার বিভাগের ইস্যুতে আমাদের সরকারি দল বা বিরোধী দলের নেতারা দিনে রাতে অনর্গল কথা বলেন। এই নিয়ে তাদের সামান্যতম সংকোচের কোনো ইতিহাস নাই। এবং শুধুমাত্র যখন সরকার কোনো বিষয়ে অস্বস্তিতে থাকে তখনই সরকার বলে, এটা বিচার বিভাগীয় ইস্যু, এটা নিয়ে আলোচনা ঠিক হবে না।

সাজেদা চৌধুরী আওয়ামী লীগের ডিসিশান মেকিং বডির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন সদস্য। কাদের মোল্লার রায়ের পরপরই, সংসদে উনার এই বক্তব্য দিয়ে সবাইকে চুপ করতে বলাটা ক্লিয়ারলি কিছু জিনিস মিন করে।

একটা ঘটনা ঘটার পরে ইমিডিয়েট রেসপন্সটা সাধারণত জেনুইন হয়। কাদের মোল্লার রায়ের পরে ব্লগারদের প্রতিক্রিয়া ছিল, এই আঁতাতের রায় মেনে নেয়া যায় না। কিছু একটা করতে হবে, সেই থেকে তারা শাহবাগে জড়ো হয়। আর সরকারের শীর্ষস্থানীয় কিছু নেতৃবৃন্দের প্রতিক্রিয়া ছিল, এটা বিচার বিভাগীয় ইস্যু, এটা নিয়ে আলোচনা ঠিক হবে না। সংসদে রাশেদ খান মেনন বা মঈনউদ্দীন খান বাদলরাই কোনো দ্বিধা ছাড়া কড়া সামলোচনা করেছিলেন।

রায়টা সব চেয়ে বড় ধাক্কা ছিল অনলাইনে রাজাকারদের শাস্তির দাবিতে খুব সিরিয়াসলি অ্যাকটিভিজিম করত যারা, সেই গ্রুপটার জন্যে। যার মধ্যে আছে ব্লগারদের বড় একটা অংশ।। তারা বেশ কয়েক বছর ধরে ঘাতক-দালালদের শাস্তি দাবি করে অনেক ধরনের ক্যাম্পেইন করেছেন, অনলাইন-অফলাইন। তাদের অনলাইন অ্যাকটিভিটির মূল চেতনাই ছিল ঘাতক-দালালদের বিচার।

তারা এই বিচারের প্রতি এতই আন্তরিক ছিলেন যে, অনেক ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ এই বিচারটা করছে বলে আওয়ামী লীগের অনেক অপশাসন এবং দুঃশাসন দেখেও তারা চুপ করে থাকতেন বা আওয়ামী লীগকে হালকা সমর্থন দিতেন।

ফলে, আওয়ামী লীগ নিজেই আঁতাতের রায় করবে, এটা তাদের জন্যে একটা বিশাল শক ছিল। আমি এই গ্রুপটাকে বলি ট্রাইবুন্যাল অ্যাকটিভিস্ট গ্রুপ।

এই রায়টার পরে শুধু ট্রাইবুন্যাল অ্যাকটিভিস্ট গ্রুপ না, পুরো সোশ্যাল মিডিয়া ব্লগ, ফেসবুক সবাই ক্ষোভে ফেটে পরে। বিচ্ছিন্ন ভাবে ব্লগাররা বিক্ষোভের ডাক দেয়। ফেসবুকে ইভেন্ট কল করা হয়। আসেত্ম আসেত্ম শাহবাগে মানুষ জড়ো হতে থাকে। তারপর যা হয়, সেটা ইতিহাস। বাংলাদেশের পুনর্জন্ম হয় এই শাহবাগ থেকে। এবং সেই গণআন্দোলনের পরবর্তী ঘটনাবলিতে বিভিন্ন হার্ডলাইন পক্ষ-বিপক্ষ জন্ম নেয় যাতে বাংলাদেশের চলমান ইতিহাস

অলঙ্ঘনীয় ভাবে পাল্টে যায়। আসেন শুরু করি।

দ্বিতীয় পর্ব: শাহবাগের গণজাগরণ

চ্যাপ্টার ৮. শাহবাগের পর্বসমূহ

কিছু কিছু সময়ে মনে হয় এক একটা বছর খুব তাড়াতাড়ি কেটে গেছে। কিছু সময়ে মনে হয় সময় অনেক লম্বা—অনেক অনেক দিন আগের কথা। আমার কাছে শাহবাগকে সেই রকম লাগে, মনে হয় অনেক অনেক আগের একটা ঘটনা। কারণ, ৫ ফেব্রুয়ারি শাহবাগ জন্মের পর থেকে মাত্র ১৮ দিনে বা তার পরের এক বছরে যত কিছু ঘটেছে তা আমাদের জাতির জীবনে ২০ বছরেও ঘটেনি।

এই নিচের লেখাটার উল্লেখযোগ্য একটা অংশ আমি লিখেছিলাম শাহবাগ শুরু হওয়ার মাত্র এক মাসে মার্চের প্রথম সপ্তাহে। পরে অনেক কিছু যোগ হয়েছে। কিন্তু এই লেখাটাকে শাহবাগের সময়ের লেখা হিসেবে গণ্য করতে হবে। আমি লেখাটা তখন আপলোড করার সাহস পাই নাই ট্যাগ খাওয়ার ভয়ে।

৫২, ৭১, ৯০। প্রতি ১৯ থেকে ২০ বছর পরপর বাঙালির নিজেকে শুধরে নিয়ে জাগরণের সংগ্রামে জেগে ওঠার ইতিহাসের একটা ধারাবাহিকতা আছে। কিন্তু ২০১১ সাল বা ২০১২ সালে, ১৯৯০-এর এরশাদবিরোধী আন্দোলনের ২০ বছর পার হয়ে যাওয়ার পরেও দুই দলের দ্বারা গঠিত পলিটিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট-এর একটা ভয়াবহ শোষণের মুখে দেশের শেষ কড়িবর্গা চর দখলের মতো দখল করার সিচুয়েশানে মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক ক্ষমতা ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ার পরেও ২০ বছর অন্তর সেই আন্দোলনের দেখা কেন নেই, তা নিয়ে আমরা অনেকেই চিন্তিত ছিলাম। বাঙালি মধ্যবিত্তের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে কি না সে নিয়েই আশঙ্কায় ছিলাম আমরা। কিন্তু সব শঙ্কাকে অমূলক করে দিয়ে ২০১৩ সালে এসে জাগল শাহবাগ। সব কিছু ভেঙেচুরে জানান দিয়ে উঠল আমাদের

প্রতিরোধ-এর চেতনা, কাদের মোল্লার ফাঁসির আওয়াজ নিয়ে। নিয়তির মতোই এ ছিল অবশ্যম্ভাবী।

শুধু ৫২ নয়। এর ২০ বছর পূর্বের ১৯৩১ ছিল গান্ধীর নেতৃত্বে সর্বভারতীয় আন্দোলন এবং একই সাথে চলছিল খেলাফত মুভমেন্ট।

এই ২০ কোনো ম্যাজিক নাম্বার নয়। ২০ বছর একটা জেনারেশনের শৈশব থেকে তারুণ্যে পেরিয়ে আসার সময়, বয়ঃসন্ধি থেকে প্রতিবাদী হওয়ার সময়। ২০ বছরে সমাজের মধ্যে একটা জেনারেশনের মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়। এবং পরিবর্তনগুলো থেকে কনফ্লিক্টের জন্ম হয়। এবং এই কনফ্লিক্ট থেকে তরুণদের মধ্যে ক্ষোভ জন্মাতে জন্মাতে এক সময় গিয়ে তার বিস্ফোরণ ঘটে।

মিরপুরের কসাই ৩০০ মানুষ হত্যার অপরাধে অপরাধী ঘৃণ্য কাদের মোল্লার অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুদণ্ডের রায় যখন মধ্য রাতের আঁতাতে যাবজ্জীবনে পরিণত হল, টগবগ করে ফুটে উঠেছিল দেশের প্রতি সামান্য দরদ আছে এমন প্রতিটা মানুষের রক্ত। সেই স্পৃহা থেকেই শাহবাগের জন্ম। কিন্তু এই স্পৃহা একটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র। ২০১৩ সালের শাহবাগ আন্দোলন পুরাতনকে বাতিল করে একটা প্রজন্মের উত্থানের ডাক দিয়ে যায়।

শাহবাগ নিয়ে অনেক লেখা হচ্ছে। অনেক গান কবিতা হচ্ছে। প্রথম দিন শঙ্কিত পদে যারা দাঁড়িয়েছিলেন, তারা তখনও জানতেন না এই যে একত্রিত হওয়া, এটা একটা গণজাগরণে পরিণত হবে। তাতে ভেসে যাবে ৪০ বছরের সংস্কারে গড়ে ওঠা ধারণা।

এই শাহবাগে কিন্তু এটাই প্রথম প্রতিবাদীদের জড়ো হওয়া নয়। তাজরীন গার্মেন্টস, রোহিঙ্গা ইস্যু, তেলগ্যাস লুটপাট বিরোধী আন্দোলন, ইভ টিজিং বিরোধী আন্দোলন এবং রামুতে বৌদ্ধ মন্দিরে হামলার মতো অনেক অনেক নাগরিক এবং মানবিক ইস্যুতে পলিটিক্যাল এস্টাবলিশমেন্টের বাহিরের মানুষ জমায়েত হয়েছিল শাহবাগে ২০১১ বা ২০১২ সালেই। ১০০/২০০ জন অ্যাক্টিভিস্টের উপস্থিতিতে সেই জনসভাগুলোর কিছু কিছুতে পুলিশী দমন নিপীড়ন হয়েছে।

কিন্তু কাদের মোল্লার রায়ের পরে যখন এই মানুষগুলোই আবার শাহবাগে গেল তখন একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটল। ধীরে ধীরে যখন মানুষ বাড়তে লাগল এবং বাড়তে বাড়তে এক সময় যখন শাহবাগ জনসমুদ্র হয়ে গেল আয়োজকরা তখন

অনেকেই বাকরুদ্ধ হয়ে চিন্তা করছিলেন, আবেগে থর থর করে কাঁপছিলেন। একজন আরেকজনের চোখের দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে কথা বলছিলেন। এত মানুষ? এরা কোথা থেকে আসছে? এই কি তাহরীর স্কয়ার, এই কি তিউনিসিয়া, তিয়েনানমেন, ফরাসি বিপ্লব, ২১ ফেব্রুয়ারি?

এ কি সব ভেঙে-গুঁড়িয়ে নতুন একটা সমাজ নির্মাণের আন্দোলন? কাদের মোল্লার ফাঁসি আর যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবি দিয়ে যার শুরু। এতদিনের এস্টাবলিশমেন্টের কাছে স্বপ্ন আর সম্ভাবনা বলি দিয়ে বিচ্ছিন্ন থাকার পর শাহবাগে যখন একত্রিত হলো তরুণ প্রাণ, এরা কি শুধু একটা ফাঁসিতেই খুশি হবে?

এই শাহবাগ কি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ? এর থেকে যদি লেগে যায় আগুন? সেই আগুনে যদি পুড়ে যায় নগর, সভ্যতা, বস্তি, অট্টালিকা, দেবালয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন তাদের মধ্যবিত্তের 'আমি মিছিলে যাই না' সংস্কার ভেঙে শাহবাগে জড়ো হলেন, তখন যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল তা কি শুধু কাদের মোল্লার বিচারের রায়কে ঠিক করেই সন্তুষ্ট হবে।

শাহবাগ কার আন্দোলন, শাহবাগের নেতা কে? এটা ছিল শাহবাগের প্রথম প্রশ্ন। দেশি-বিদেশি মিডিয়া, অ্যানালিস্ট, হতবিহবল রাজনীতিবিদেরা সবাই প্রথমে ধাক্কা খেয়ে গিয়েছিল, এদের নেতা কে?

'শাহবাগ'কে অর্গানাইজ করেছে?

আজকে এটা অবিসংবাদিত, শাহবাগের নেতা, শাহবাগীদের নেতা ডাক্তার ইমরান সরকার। কিন্তু প্রথম কয়দিন এটা পরিষ্কার ছিল না। প্রথম কয়দিনের আইডিয়া ছিল, এখানে কোনো নেতা নাই। এখানে জনতাই নেতা। কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান আর রাজনৈতিক দলের মতো ক্ষমতার পিরামিড স্ট্রাকচার এখানে নাই। অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট বা অন্যান্য সমসাময়িক আন্দোলনের মতো শাহবাগ একটা নেতাহীন আন্দোলন। জনতাকেই বলা হচ্ছিল শক্তি। এবং শাহবাগকে বলা হচ্ছিল সামাজিক শক্তির প্রতীক।

পলিটিক্যাল এস্টাবলিশমেন্টের বাইরে এসে কোনো নেতার আহবান ব্যতীত এই ধরনের একটা আন্দোলন বাংলাদেশ প্রথম। তাই এই কনসেপ্টটা মেনে নিতে অনেকেরই কষ্ট হচ্ছিল।

কিছু দিনের মধ্যে পরিষ্কার হয় শাহবাগের অরগানাইজ করার প্রধান দাবিদার

BOAN এবং ডাক্তার ইমরান এইচ সরকার।

কিন্তু যেটা এস্টাবলিশড হয় নাই, সেটা হইল শাহবাগের আরো কিছু নীরব দাবিদার আছে। ওরা কারা?

অনেকেই এটা জানেন। আমি এটা ফরমালি বলছি। ডাক্তার ইমরান সরকার এবং BOAN বাদে শাহবাগের মূল অর্গানাইজিং এর সবচেয়ে বড় দাবিদার হলো 'ছবির হাট' এবং ব্লগকেন্দ্রিক কিছু একটিভিস্ট গ্রুপ যেমন জাতীয় স্বার্থে ব্লগার-অনলাইন একটিভিস্ট বা ফেসবুক ভিত্তিক গ্রুপগুলো এবং আরও কিছু স্বতন্ত্র বা আড্ডাভিত্তিক অ্যাকটিভিস্ট বা তাদের গ্রুপ। এই গ্রুপগুলোকে এক করতে ছবির হাটের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এদেরকে আমরা এক নামে ডাকতে পারি ছবির হাট নেটওয়ার্ক। এই ছবির হাট নেটওয়ার্ক শাহবাগ অরগানাইজিংয়ের প্রধান দাবিদার।

ছবির হাট যারা চেনেন না তাদের জন্যে বলছি। শাহবাগ মোড় থেকে অপরাজেয় বাংলার দিকে যেতে গেলে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঢোকার মুখেই ছবির হাট। ঢাকা শহরের সবচেয়ে চমৎকার আড্ডার জায়গা। বিশাল বড় খোলা মাঠ, গাছের নিচে ছায়াযুক্ত জায়গা, চায়ের দোকান, আজিজ মার্কেট, পাশে ঢাকা ইউনিভার্সিটি, আর্ট কলেজ, জাদুঘর—এই জায়গা আড্ডার জন্যে জম্পেশ হবেই। বিশ্ববিদ্যালয়, আর্ট কলেজ, জাদুঘর এইগুলো সব সময় প্রগতিশীলদের গড়ে ওঠার তীর্থভূমি। ফলে ছবির হাট বাংলাদেশের উঠতি প্রগতিশীলদের একটা সেন্টার হয়ে ওঠে। ছবির হাটে সবাইকে পাওয়া যায়। ছাত্র, শিক্ষক আস্তিক, নামাজি, বে-নামাজি, হাজি, গাজি, কাজি, পাজি, লুম্পেন, গাজারু, সজারু, প্রগতিশীল, ধার্মিক মৌলবাদী, সেকুলার—সবাই ছবির হাটে জড়ো হয়। এটা জাস্ট একটা আড্ডার জায়গা—খোলা মাঠ, পয়সা দিতে হয় না, পুলিশ ডিসটার্ব করে না। যে কেউ আসতে পারে এখানে।

এই ছবির হাট ভিত্তিক আড্ডাটা ব্লগের সাথে সংশিস্নষ্ট অনেককে অনলাইন স্পেসের বাইরে নিজেদের সংযুক্ত করে দেয়ার সুযোগ করে দেয়।

এই ধরনের জায়গা হয়তো বাংলাদেশে আরো কিছু আছে। কিন্তু ছবির হাটের আড্ডার পরিধি বড়, কারণ ছবির হাট জায়গা হিসেবে বড়। এখানে অনেক অনেক গ্রুপ এক সাথে সংযুক্ত হয় এবং একজন অন্যজনের সাথে কানেক্ট

করতে পারে।

ব্লগের একটা ব্যাপার হলো, আপনি একজনের লেখায় অনেক দিন ধরে কমেন্ট করার পরেও কখনো তার সাথে পরিচিত হচ্ছেন না। ফলে আপনি যদি কখনো তার সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হতে চান, তাহলে তার সাথে দেখা করার বেস্ট জায়গা হলো ছবির হাট। ফেসবুকে কথা বলে ছবির হাটে চলে যান, তাকেও বলেন সেখানে যেতে। ছবির হাটে গিয়ে আপনি আরো অনেককে পাবেন, যাদেরকে আপনি ব্লগ নামে চিনেন কিন্তু কখনো আগে দেখেন নাই। এবং একজন আপনাকে আরেকজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে। ফলে খুব সহজেই অনেকের সাথে আপনার পরিচয় হয়ে যাবে। ফলে, পরিচিত হওয়ার এবং যোগাযোগের জন্যে ছবির হাট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। এবং এভাবে ছবির হাটভিত্তিক কিছু গ্রুপ গড়ে ওঠে যারা মূলত ব্লগ থেকে আসা। ছবির হাট এবং ফেসবুক জাস্ট তাদের নেটওয়ার্কিং হেল্প করে এক করেছে মাত্র।

এবং এই ছবির হাট থেকে নেটওয়ার্কিং করে বাংলাদেশে বেশকিছু ব্লগারদের সংগঠন গড়ে ওঠে, তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে জাতীয় স্বার্থে ব্লগার অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট। এই ছবির হাট থেকে বেশ কিছু প্রগ্রেসিভ আড্ডার গ্রুপ গড়ে ওঠে। এরা কখনো কোনো প্রতিষ্ঠানের সীমানায় আসে নাই। কিন্তু, ইতিপূর্বে তেলগ্যাস কমিটির আন্দোলনে ছবির হাট ভিত্তিক গ্রুপগুলো সামনের সারিতে থাকে এবং বেশকিছু নাগরিক ইস্যুতে ছবির হাট ভিত্তিক এই গ্রুপগুলো শাহবাগে কিছু মিটিং মিছিল করে।

এই ছবির হাট ভিত্তিক গ্রুপ এবং অ্যাসোসিয়েশনগুলোর মধ্যে কিছু গ্রুপ শাহবাগের প্রধান দাবিদার। কিন্তু শাহবাগের যে ইতিহাস এবং বয়ান পাবলিকের সামনে আসছে তাতে এদের কথা কখনো আসে না। শুধু বলা হয়, BOAN এর ডাক্তার ইমরান শাহবাগের ডাক দিয়েছেন। যাই হোক, এই বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব ডিটেলসে।

শাহবাগ নিয়ে অনেকেই গালি দেয়, শাহবাগী। আবার অনেকে গর্বের সাথে বলেন আমি শাহবাগী। এটার ফলে বোঝা যায় যে পাবলিক পারসেপশনে শাহবাগ সম্পর্কে একটা মনোলিথিক ধারণা আছে যে, শাহবাগের শাহবাগীরা একটা সুনির্দিষ্ট টাইপের। এই ব্যাপারে উভয় পক্ষের একটা পারসেপশান আছে। কিন্তু আমরা ডিটেলসে গেলে দেখব, শাহবাগ কখনোই মনোলিথিক আইডিয়ার

প্রকাশ ছিল না। এখানে অনেক অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল। অনেক কনফিউশন ছিল। এটা বুঝতে সবচেয়ে সুবিধা হয় যদি আমরা শাহবাগকে কিছু স্টেজে ভাগ করি, যে ভাগগুলো, শাহবাগ যে ধাপগুলো পার করেছে তাকে নির্দেশ করবে। তাহলে শাহবাগ এবং শাহবাগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বুঝতে যেমন সুবিধা হয় ঠিক তেমনি শাহবাগীদের ভেতরে যে কনফ্লিক্ট ছিল সেগুলোকে বুঝতেও সুবিধা হয়। এবং এর ফলে শাহবাগী বলে যে কিছু নেই বরং শাহবাগী শব্দের অনেকগুলো সাব-ক্যাটাগরি আছে সেটা বুঝতেও আমাদের সুবিধা হয়। এবং শাহবাগ চলাকালীনই শাহবাগকে কাউন্টার করে যে কাউন্টার রেভলিউশান গড়ে উঠে তার সম্পর্কেও আমরা ধারণা পাই।

শাহবাগের শুরু ৫ ফেব্রুয়ারি, শেষ এখনও হয় নাই। শাহবাগ এখনো বেঁচে আছে। কিন্তু শাহবাগের আন্দোলনকে কয়েকটি স্টেজে ভাগ করা যায়:

১. প্রি-শাহবাগ স্টেজ
২. স্ফুলিঙ্গ স্টেজ
৩. কনফিউশন-স্বাতন্ত্র্য স্টেজ
৪. মঞ্চ ক্যাপচার স্টেজ
৫. রাজিব হত্যার পর ফাঁদে পড়ার স্টেজ
৬. মাহমুদুর রহমানের কাউন্টার রেভোল্যুশান প্রোপাগান্ডা স্টেজ
৭. শাহবাগে সিটইন বিক্ষোভের সমাপ্তি স্টেজ
৮. কাউন্টার রেভলিউশান—সংঘাত স্টেজ
৯. কাউন্টার রেভলিউশান—দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর রায়ের পরে সংঘাত বৃদ্ধির স্টেজ
১০. রুমি স্কোয়াড: শাহবাগের ভেতরের ক্ষীণ প্রতিরোধের স্টেজ

চ্যাপ্টার ৯. স্ফুলিঙ্গ স্টেজ

শাহবাগ পর্ব ১. প্রি-শাহবাগ স্টেজ

এই বিষয়ে আমরা আলোচনা ইতিমধ্যে করেছি কিভাবে হঠাৎ জামায়াত-শিবিরের সাথে সরকারের সখ্য গড়ে উঠে নাগরিক মনে সন্দেহ জাগে যে,

কাদের মোল্লার রায় নিয়ে একটা আঁতাত হচ্ছে। এই বইয়ের প্রথম পর্বে পুরোটাই প্রি-শাহবাগ স্টেজের বর্ণনা আছে।

শাহবাগ পর্ব ২. স্ফুলিঙ্গ স্টেজ

৫ ফেব্রুয়ারি

এই স্টেজটা হচ্ছে প্রাথমিক দুইটা দিন, যখন কাদের মোল্লার রায়ের পরে ক্ষুব্ধ মানুষ ফেটে পড়ে এবং সেই ক্ষোভ থেকে ব্লগারদের আহবানে মানুষ জড়ো হতে থাকে ধীর পায়ে। সোশ্যাল মিডিয়াতে আলোচনা জমতে থাকে। সবাই বন্ধুদের বলতে থাকে তুই গিয়েছিস? আমি যাচ্ছি। কিছু গ্রুপ ইভেন্ট কল করে। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে শাহবাগে মানুষের জড়ো হওয়ার কথা। মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়।

শাহবাগে যাওয়ার আহবান যারা জানায় তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেখা হয় BOAN (Blogger & Online Activist Network)-কে। এটা ছাড়াও সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেকেই আহবান জানান। কিন্তু, BOAN এর একটা ফেসবুক ইভেন্টকে শাহবাগের একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে দেখা হয়।

যে ইভেন্টের মাধ্যমে BOAN ইভেন্টটা ডাকে সেটার লিংক এখানে।

https://www.facebook.com/events/500274583347447/

ট্রাইব্যুনালে কাদের মোল্লার প্রহসনের রায়ের বিরুদ্ধে মহাসমাবেশ

5 February 2013 at 14:30 until 26 March 2013 at 17:30

... See more

Imran H Sarker
5 February 2013 at 13:16 near Dhaka

ট্রাইবুনালের প্রহসনের এই দন্ডারজনক রায়ের বিরুদ্ধে সমাবেশ ও গনমিছিল।
সময়: বিকাল ৩ টা ৩০ মিনিট
স্থান: শাহবাগ মোড়
তারিখ: ৫ ফেব্রুয়ারী ২০১০
আয়োজনে: Blogger and Online Activist Network -BOAN
সবার অংশগ্রহন কাম্য। বিকেলে পরবর্তি কর্মসূচী ঘোষনা করা হবে।

Like · Comment · Share 20

Pinaki Bhattacharya, ত্রা কামাল and 136 others like this.

BOAN এর আহবায়ক ডাক্তার ইমরান তার নিজের ওয়ালেও ইভেন্টটা পোস্ট করেন।

একই সময়ে ছবির হাট ভিত্তিক আর একজন অ্যাক্টিভিস্ট আনহা এফ খানও শাহবাগে জড়ো হতে অনেককে আহবান জানান।

আনহা এফ এর স্ট্যাটাস ছিল 'দ্রুততম রিঅ্যাকশান হিসেবে শাহবাগের মোড়ে আজই একটা বিক্ষোভ মিছিল দিয়া দেওন যায় না?'


ছবির হাটভিত্তিক অ্যাকটিভিস্ট আনহা এফ খান-এর স্ট্যাটাস

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংগঠন 'শ্লোগান ৭১' টিএসসিতে সবাইকে জড়ো হতে বলে। এছাড়াও ব্লগার ফেসবুকের অনেকেই তাদের বন্ধুদের সাথে কথা বলেন কিছু করার জন্যে বা একটা বিক্ষোভের জন্যে। এবং এর মধ্যে কেউ কেউ শাহবাগ যাওয়ার কথাও বলেন।

শাহবাগের অনেক ছবি আছে। কিন্তু, একটা ছবিকে শাহবাগের প্রথম জমায়েত হিসেবে ধরে নেয়া যায়। এই হচ্ছে সেই ছবিটা।


শাহবাগের জমায়েতের প্রথম ছবি

ছবিটা আপলোড করেছেন নূরন্নবী চৌধুরী হাসিব। এইটা আমার পাওয়া প্রথম ছবি। এর বাহিরেও ছবি থাকতে পারে। এই ছবিতে সুপরিচিত কিছু ব্লগার এবং অ্যাকটিভিস্ট আছে।

সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে আমি BOAN এর ইভেন্ট এবং আনহা এফ খানের আহবানটায় জোর দিচ্ছি।

শাহবাগ যে BOAN এর এই ইভেন্টের কারণে হয়েছে সেটা অনেকেই প্রথম দিন থেকেই বলতে থাকে। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত মাইন্ডসেটে প্রথম আলোকে আমি সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। তাই এই দিনে শাহবাগ নিয়ে প্রথম

আলো যে নিউজটা করে সেটার এক লাইন রেফারেন্স হিসেবে রেখে যাচ্ছি,
‘কাদেরের ফাঁসির দাবিতে রাতভর শাহবাগে থাকবেন বিক্ষুব্ধরা’
সাইটে দেখবেন এই কথাটা আছে,
‘আজ মঙ্গলবার বেলা তিনটায় শুরু হয়েছে এ বিক্ষোভ আর সমাবেশ। চলবে সারা রাত। শাহবাগে প্রথমে অবরোধ শুরু করে ব্লগার অ্যান্ড অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট নেটওয়ার্ক। সংগঠক চিকিৎসক ইমরান এইচ সরকার বলেন, যুদ্ধাপরাধী জামায়াতের নেতা কাদের মোল্লার যাবজ্জীবন নয় ফাঁসি চান তারা। ট্রাইব্যুনালের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে আপিল না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন তারা। আগামীকাল বুধবার আরও বৃহত্তর আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলেও জানান সংগঠক ইমরান।’
এইটা শাহবাগ নিয়ে প্রথম আলোর প্রথম নিউজ। এবং আমরা দেখতে পাই তাতে প্রথম আলো পরিষ্কার ভাষায় লিখেছে, শাহবাগে প্রথমে অবরোধ শুরু করে ব্লগার অ্যান্ড অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট নেটওয়ার্ক। সংগঠক চিকিৎসক ইমরান এইচ সরকার। এইটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার।
আর একটা আহবানকে আমি গুরুত্ব দিচ্ছি, তা হলে আনহা এফ খানের স্ট্যাটাস। এটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করি অনেক আগে দেয়া হয়েছে সেই জন্যে নয়, যাদের ট্যাগ করা হয়েছিল তাদের কারণে।

আনহা এফ এর স্ট্যাটাসে ট্যাগ ছিল যারা

আনহা এফ খানের এই পোস্টে যাদের ট্যাগ করা হয়েছে, এবং যারা লাইক দিয়েছেন তাদের মধ্যে অনেকে শাহবাগ মুভমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক হয়ে দাঁড়ায়। ফারুক ওয়াসিফ, মাহবুব রশীদ, শরৎ চৌধুরী, বাকী বিল্লাহ, তপু আহমেদ মনিরুদ্দিন—এরা সবাই শাহবাগের গুরুত্বপূর্ণ অর্গানাইজার হিসেবে

কাজ করেছেন।

এরা এবং তাদের সাথে যারা ঘনিষ্ঠ ছিল শাহবাগের অর্গানাইজিংয়ের বেশ কিছু সদস্য যারা ছবির হাটভিত্তিক একটা লুজ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য। যাদের কোনো সুনির্দিষ্ট সংগঠন নেই। এই লুজ অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে একটা অর্গানাইজেশন আছে, যার কিছুটা হইলেও ফ্রেমওয়ার্ক আছে, তা হলো জাতীয় স্বার্থে ব্লগার আর অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট। আমি সবগুলো গ্রুপকে একসাথে করে বলবো ছবির হাট নেটওয়ার্ক। এই ছবির হাট নেটওয়ার্ক ইতিপূর্বে শাহবাগে সংগঠিত তাজরীন প্রতিবাদ, রামুর সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদ, ইভ টিজিং বিরোধী আন্দোলন, তেল-গ্যাস কমিটির বিক্ষোভসহ বেশ কিছু আলোচিত ঘটনায় শাহবাগভিত্তিক মুভমেন্ট করে যা আমি আগেই বলেছি।

যাই হোক, ধীরে ধীরে ৫ তারিখ বিকেলে মানুষ আসতে থেকে। এবং রাতেও তাদের মধ্যে অনেকে শাহবাগ ত্যাগ করেন নাই। এবং সকালে আরো মানুষ আসতে থাকে।

আমার নিজের স্ট্যাটাস ছিল ৫ তারিখ দুপুর ২:৫৭-তে

'হায় রে আওয়ামী লীগ। পুরো দেশ তোমার কাছে খেলা। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তোমার কাছে স্ট্র্যাটেজি। এখন শিবির পুলিশ ভাই ভাই। কাদের মোল্লার গণহত্যা করার ডাইরেক্ট অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পরেও যাবজ্জীবন... 'ছি!' বললে 'ছি!' শব্দ লজ্জা পাবে।'

এই ধরনের স্ট্যাটাস, ব্লগ আরো অনেকেই দেয়।

জাতীয় স্বার্থে ব্লগার আর অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টের পারভেজ আলমের স্ট্যাটাস ছিল ৫ তারিখ সন্ধ্যা ৭:৩৪-এ

'যারা এখনো শাহবাগের মোড়ে আসেন নাই তারা বিরাট মিস করছেন। এখানে জনতার ঢল নেমেছে। এখানে মোমবাতির মিছিল, এখানে মশাল মিছিল, এখানে গান আর শ্লোগান আজ একাকার হয়েছে। আসতে থাকুন। অকুপাই শাহবাগ। যতক্ষণ না ফাঁসির রায় আমরা আদায় করে নিতে পারি।'

এই লেখাটা অ্যাকাডেমিশিয়ানরা কেউ যদি পড়ে থাকেন, আমি রিকোয়েস্ট করব এই সময়ের মানুষের এই সব স্ট্যাটাস এবং ব্লগ পোস্টগুলো নিয়ে আরো ডিটেল স্টাডি করতে। আশা করি আগামীতে এটা হবে।

যাই হোক ধীরে ধীরে লোক জড়ো হতে থাকে।

আমি ফেসবুক বন্ধু আবিদ ভাইয়ের ওয়াল থেকে দুটো ছবি দিচ্ছি। কপিরাইট কার জানি না। মাফ করে দিয়েন। এটা মনে হচ্ছে সন্ধ্যার পর পর:



৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার সময় শাহবাগের ছবি

রাত গভীর হলেও লোক বাড়তে থাকে। এই ছবিটা প্রথম আলোর একটা ছবির সাথে মিলিয়ে দেখেছি, এটা মনে হয় রাত প্রায় ১১ টার দিকে তোলা।



৫ ফেব্রুয়ারি রাত ১০ টা থেকে রাত ১১ টার মধ্যে শাহবাগের ছবি

সন্ধ্যার সময়েই ন্যাশনাল মিডিয়া পিক করে যে, শাহবাগে একটা কিছু হচ্ছে এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া সন্ধ্যা থেকে শাহবাগের জনসমাবেশ নিয়ে হালকা করে প্রতিবেদন প্রচার শুরু করে। যেটার ফলে শাহবাগে মানুষের জমায়েতের খবর

আরো ছড়িয়ে যেতে থাকে।

এবং ৫ তারিখ রাত গভীর হলেও শাহবাগে জনসমাবেশ বহাল থাকে।

৬ ফেব্রুয়ারি

৫ তারিখ রাতে মানে ৬ তারিখ ভোর রাত্রে ৩ তিনটার দিকে আমার পোস্ট ছিল সামুতে। আমিও লিখি

'একবার একতাবদ্ধ হয়ে দেখান যে, আপনি একতাবদ্ধ হতে পারেন।'

লেখাটা পড়েন, তাতে এই সময়ের অনেক মানুষের মনের ভাবের প্রকাশ পাবেন।

নোট ৫

'সিনিসিজম পরিহার করেন। একবার একতাবদ্ধ হয়ে দেখান যে আপনি একতাবদ্ধ হতে পারেন।'

০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ রাত ৩:২৪

শাহবাগে ক্ষুব্ধ মানুষেরা জড়ো হয়েছেন। অনেকে ইচ্ছা থাকলেও যেতে দ্বিধা করছেন এটা ভেবে যে, এরা কারা? ব্যানার কার? লিডার কে?

আমি একটা কথা বলি। যদি চারটা রায়ে, ৩০০ জন মানুষকে হত্যার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হওয়ার পর, কাদের মোল্লার হাস্যকর যাবজ্জীবন রায়ে আপনি ক্ষুব্ধ হয়ে থাকেন তো আপনার ক্ষোভ প্রকাশ করতে চলে যান শাহবাগে, যেখানে সবাই তাদের প্রতিবাদকে ভাষা দেয়ার জন্যে একটা প্ল্যাটফর্ম সৃষ্টি করেছে।

এত প্রশ্নের উত্তর খুইজেন না। দুইটা মানুষ ২০ বছর সংসার করে, সব বিষয়ে একমত হয় না। শাহবাগে যারা প্রতিবাদ জানাতে গেছেন, এবং যাচ্ছেন এবং যাবেন তাদের সবার সাথে সব বিষয়ে সব মতাদর্শে আপনার ১০০% একমত হওয়ার দরকার নাই।

প্রতিবাদী জনতার ক্ষোভের মূল চাওয়াটার সাথে একমত হলেই, আপনি তাদের একজন।

তাই বাছাবাছি ছাড়েন, সিনিসিজম পরিহার করেন। একবার একতাবদ্ধ হয়ে দেখান যে আপনি একতাবদ্ধ হতে পারেন।

এই রাষ্ট্রযন্ত্রকে, এই পচা গন্ধ হওয়া পলিটিক্যাল সিস্টেমকে দেখান যে, এরা যা ইচ্ছা তা করে আর পার পেতে পারবে না। এদেরকে দেখান যে আমরা প্রতিবাদ

করতে শিখেছি এবং নতুন প্রজন্ম ভেদাভেদ ভুলে একতাবদ্ধ হতে পারে।

আমি একজন তুচ্ছ ব্লগার। আমার এই ব্লগ পড়েছেন মাত্র ৬০ জন। কমেন্ট করছেন আরও কম। মাত্র দুইজন। কিন্তু এভাবে আরো অনেক ব্লগার এবং ফেসবুকারের পোস্টে পোস্টে দাবানলের মতো শাহবাগে লোক জড়ো হওয়ার খবর ছড়াতে থাকে। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে যে ছবি দিলাম এই ধরনের ছবি অনেকেই আপলোড করতে থাকে। এবং বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে খবর, কাদের মোল্লার আঁতাতের রায় প্রত্যাখ্যান করে শাহবাগে তরুণরা জড়ো হচ্ছে।

৬ তারিখ সকালেই শাহবাগে জনারণ্য হয়ে যায়। জনারণ্য হলেও শাহবাগ তখনো চৌরাস্তা পার হয় নাই। মানে ছয় তারিখে শাহবাগ মোড় পর্যন্ত জনতার সীমানা ছিল।

কিন্তু একটা চরম উৎসবমূলক ভাব ছিল এইদিন। ভিজুয়াল মিডিয়া সকাল থেকেই শাহবাগে তাদের ক্যামেরা বসিয়ে লাইভ টেলিকাস্ট করে। এই ভিডিওটা ৬ তারিখের প্রথম আলোর সাইট থেকে নেয়া।

কাদেরের ফাঁসির দাবিতে ফুঁসছে শাহবাগ (ভিডিও)

www.youtube.com/watch?v=ub15RK3ojxc

এই ভিডিওতে দেখবেন, গান, নাটক, শ্লোগান সবকিছু সহ একটা ব্যাপক উৎসবমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় শাহবাগে ৬ তারিখেই।

এবং শুধু শাহবাগ নয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ জড়ো হতে থাকে ৬ তারিখেই। এই নিউজটাতেও খেয়াল করবেন, প্রথম আলো লিখে 'গতকাল বেলা তিনটায় শাহবাগ মোড়ে সমবেত হয়ে অবরোধ শুরু করে ব্লগার অ্যান্ড অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট নেটওয়ার্ক নামের একটি সংগঠন।'

http://archive.prothom-alo.com/detail/date/2013-02-06/news/327212

কথাগুলো খেয়াল রাখবেন। আমি অ্যানালিসিসের সময়ে এই রেফারেন্সগুলোতে ফিরে আসবো।

কিন্তু সারাদেশে তখন ছড়িয়ে পড়েছে শাহবাগের আন্দোলন। ছড়িয়ে পড়েছে কাদের মোল্লার ফাঁসির দাবি।

এই লিঙ্কে দেখবেন, ৬ তারিখেই সিলেট, খুলনা, চিটাগাং, চুয়েট, রাজশাহী, সুনামগঞ্জ, রাজবাড়ি, নোয়াখালি—সব জায়গাতেই লোক জড়ো হওয়ার খবর আছে।

চ্যাপ্টার ১০. কনফিউশান স্টেজ বা স্বাতন্ত্র্য স্টেজ

শাহবাগ পর্ব ৩. কনফিউশন স্টেজ বা স্বাতন্ত্র্য স্টেজ

৭ জানুয়ারি

এই স্টেজের স্থায়িত্ব মাত্র দুইদিন বা দেড় দিন। ৭ এবং ৮-এর অর্ধেক। কিন্তু এটা আমার কাছে শাহবাগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্টেজ। কারণ এই দুইদিনে শাহবাগের বিভিন্ন চরিত্র তার নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বে পতিত হয় এবং শাহবাগের মূল চরিত্ররা কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে তার ভবিষ্যতের চরিত্র এবং গতিবিধি ঠিক করে। আবার একই সাথে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণেই এই সময়ে শাহবাগের মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় ছিল।

এই সময়ে বলা হচ্ছিল শাহবাগের কোনো নেতা নাই। জনতাই নেতা। এটা স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ। শাহবাগের নেতা লাগে না। কারণ জনতাই শাহবাগের নেতা।

কনফিউশনের বাংলা হচ্ছে দ্বিধা, স্বাতন্ত্র্য নয়। কিন্তু শাহবাগের এই সময়টাকে আমি বলব এমন একটা স্টেজ যেটা একই সাথে কনফিউশন এবং স্বাতন্ত্র্য একসাথে পার করেছে। কারণ শাহবাগ এই সময় কনফিউজড ছিল তার চাওয়ার ব্যাপারে।

কারণ তখন সবার মধ্যেই একটা হতবিহবল অবস্থা ছিল। আয় হায়, এত মানুষ? আমরা কি চাই? আমরা কি শুধু ফাঁসি চাই? এবং ফাঁসি যদি চাই, তাইলে ট্রাইবুন্যাল তো বিতর্কিত হবে, তাইলে কী হবে? তাইলে তো জামায়াতের দাবি যে, ট্রাইবুন্যাল ইন্ডিপেনডেন্ট না, সেটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তাইলে এটা আমরা কেমনে চাইব? কিন্তু সেটা যদি না চাই, তাহলে তো আঁতাতের রায় হয় না, এটা সঠিক রায় হয়? এখন সঠিক রায় যদি হয়, আমাদের দাবি তো অনায্য হয়ে যায়? তো এই উভয় সংকটে আমরা কোন প্রশ্নের উত্তর খুঁজবো? জামায়াত কি নিষিদ্ধ চাই? ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র কি নিষিদ্ধ চাই? এখন জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধ করার দায় তো সরকারের। এখন সেইটা চাইলে আবার সরকারের সাথে দ্বন্দ্ব হবে না তো?

আর জামায়াতের নেতাদের শুধু ফাঁসি দিলে কি হবে? জামায়াতের অর্থের

নেটওয়ার্ক তো রয়ে যাবে, সেটাকে যদি আমরা টার্গেট না করি তাহলে তো আগামীতে শিবির ঠিকই সামনে আসবে? শুধু সরকারের চিহ্নিত রাজাকারের বিচার চাই? নাকি সব রাজাকারের বিচার চাই এমনকি আওয়ামী লীগ ভেতরে যেসব রাজাকার আছে তাদেরটাও?

নাকি আমরা তাহরীর চাই। যুদ্ধাপরাধের বিচার দিয়ে আওয়ামী লীগ যেভাবে সব অন্যায় ঢেকে রেখেছে, তার একটা সুরাহা চাই? এই সময়ে আরব বসন্তের প্রেক্ষাপটে তরুণদের চাওয়া নিয়ে আন্দোলনের একটা ধারাবাহিকতা ছিল বিশ্বের বিভিন্ন দেশে।

এ কিন্তু এই চাওয়াটা কে চাইবে? এত মানুষ, এদের নেতা কে? ডিসিশন কে নেবে? কীভাবে নেওয়া হবে? কোনো কি কমিটি হবে? সেই কমিটির সদস্য কারা থাকবে? এই ধরনের অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি শাহবাগকে হতে হয়েছে। এবং এই প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর জানা ছিল না—এইজন্যে এটা কনফিউশন স্টেজ।

যদিও বলা হচ্ছিল, জনতাই ছিল মুখ্য। জনতাই ছিল নেতা। কিন্তু এই ধারণাটার মধ্যেও একটা ফাঁকি ছিল। সেটা আমরা পরে আলোচনা করব। কিন্তু এটা ঠিক এই সময়ে শাহবাগ ছিল অত্যন্ত স্বতঃস্ফুর্ত এবং আওয়ামী লীগ তখন শাহবাগে কোনো ধরনের প্রভাব রাখতে পারে নাই।

এই সময় শাহবাগ ছিল ক্লিয়ারলি একটা অ্যান্টিএস্টাব্লিশমেন্ট এনটিটি।

এই ধরনের পচাগান্ধা রাষ্ট্রে মধ্যবিত্ত তরুণের বিক্ষোভ খুব স্বাভাবিকভাবেই অ্যান্টিএস্টাব্লিশমেন্ট হওয়ারই কথা। এবং তাই হয়েছে।

সরকারি দল আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন নেতা মঞ্চের কাছে গিয়ে পানির বোতলের বাড়ি খেয়ে ফিরে আসছিল। এতেই প্রমাণিত হয় এই সময়ে শাহবাগে একটা স্বতঃস্ফূর্ততা এবং ইন্ডিপেন্ডেনস বা স্বাতন্ত্র্য ছিল।

এই সময়ে মিডিয়া শাহবাগকে চরম হাইপে নিয়ে গেছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবির সাথে সাথে শাহবাগকে তারা প্রমোট করছে তারুণ্যের উৎসব, নবীনের উৎসব এই ধরনের কিছু বাজওয়ার্ড দিয়ে। শাহবাগের কল্যাণে ব্লগাররা তখন হিরো। আমরা যারা একটু আধটু ব্লগিং করি আর ফেসবুকে স্ট্যাটাস মারি—পরিবারে গালি খাই 'কি শুধু সময় নষ্ট কর' তখন আমাদের কেউ কেউ মানুষ হিসেবে গোনা শুরু করেছে।

‘ও আচ্ছা, তুমি ব্লগিং করো। ভালো ভালো। তোমাদেরকে দিয়ে হবে। তোমরা জাতির ভবিষ্যৎ।’ আমরাও তাজ্জব। কি হইতাছে!

ব্লগার শব্দটাই তখন একটা চরম ফ্যাশন স্টেটমেন্ট। সবাই খুঁজছে কারা এই ব্লগার প্রজাতি যারা বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে এমন ধাক্কা দিয়ে গেল?

আওয়ামী লীগ, বিএনপি উভয়েই তখন টালমাটাল। শাহবাগের আগের দুই বছরের মধ্যেই আরব বসন্ত হয়ে আরব বিশ্ব পাল্টে গেছে। শাহবাগকে তখন বলা হলো বাংলা বসন্ত। বলা হলো শাহবাগের তরুণেরা বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে পাল্টে দেবে। পচে গলে যাওয়া এই রাষ্ট্রযন্ত্রের সবকিছু পাল্টে দেবে শাহবাগের তরুণরা। বাংলাদেশ হয়ে যাবে ইউরোপ বা নিদেনপক্ষে মালয়েশিয়া—এই শাহবাগের তরুণদের হাত ধরেই। রাজ্যসহ রাজকন্যা তুলে দেয়ার অপেক্ষায় কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের অনুরোধে ব্লগার পাত্র খুঁজতে হন্যে হয়ে ওঠে ঘটকেরা এবং ‘আমিও ব্লগার’ এই পরিচয় দেয়া বায়োডাটা জমা হতে থাকে দেশের আনাচে কানাচে পিতাদের পোস্টবক্সে।

এই অবস্থায় আমি প্রথম শাহবাগ ভ্রমণ করি ৭ তারিখ রাতে। আমার মাথায় কিন্তু ঘুরছে কনফিউশন স্টেজের প্রশ্নগুলো, কে নেতা? কী চাই আমরা? কী চাইলে ভালো হয়। এবং এই সময়ে ফেসবুকে শাহবাগের মধ্যে যারা একটি চিন্তা করে, তাদের স্ট্যাটাস দেখলে, সেই দ্বিধাগুলো পাবেন।

আমি আমার নোটটা শেয়ার করছি।

নোট ৬: অর্গানাইজিং-এ যারা আছেন, তাদের প্রতি আমার দুই আনার ফ্রি অ্যাডভাইজ

(প্রকাশ: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩)

গতকাল রাতে গিয়েছিলাম।

সে একটা অবিস্মরণীয় দৃশ্য। হাজার হাজার জনতা। কেউ করছে গান, চলছে পথ নাটক। মুক্ত সিনেমা। শ্লোগান দিচ্ছে কেউ। ছাড়া ছাড়া মিছিল। পিতার মাথায় শিশু। ভাইয়ের হাতে বোন। কিছু মানুষ ঘুরছে, খুঁজছে পরিচিত মুখ—এই তুই? কখন আসলি? এত মানুষ স্বপ্ন নিয়ে এসেছে। নিশ্চয়ই আমার মতো অনেকের মনেই কিছু প্রশ্ন জেগেছে। এরপর কী? আন্দোলন কোন পথে যাবে? থাকবে নাকি এই গণজোয়ার? কীভাবে এই আন্দোলন ছড়িয়ে দেয়া যাবে সারা

দেশে? এই কি তাহরির স্কয়ার? দুর্বৃত্ত রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের শুরু? নাকি কালই সব শেষ? গোলাম আযমকে চারটা চটকনা দিয়ে মুক্তি দেবে গোপন আঁতাত? সরকার বলবে, এই ছিল নিরপেক্ষ বিচারকের রায়, আমরা কী করতে পারতাম? কী নিয়ে ঘরে ফিরে যাবে এই অজস্র স্বপ্নাবিস্ট মানুষ? কী জওয়াব দেবে তারা তাদের ভাই-ব্রাদারদের, ওরা কেন গিয়েছিল বাড়িঘর-পড়াশোনা ফেলে? কী তার অর্জন হয়েছে?

যারা অর্গানাইজিং-এ আছেন, আমি তাদের উদ্দেশ্যে আমার কিছু ভাবনা শেয়ার করতে চাই। এটা জেনে শেয়ার করছি যে সবাই, স্পেশালি চেতনা ব্যবসায়ীরা, এই মতামতের সাথে এগ্রি করবেন না। গালাগালি খাওয়ার রিস্ক নিয়েই পোস্টটা দিলাম।

১. খুব সহজভাবে বোঝা যায় এবং সবাই গ্রহণ করতে পারে এই ধরনের তিন চারটা দাবি দিয়ে আন্দোলনকে আরো ক্লিয়ারলি ডিফাইন করুন।

অজস্র মানুষ এসেছে, সমবেত হয়েছে। এটাই গণজাগরণ, সারাদেশে মানুষ জাগছে—দারুণ! কিন্তু কী চাই আমরা? লক্ষ্যটা কী? এই দাবিগুলো খুব ক্লিয়ারলি ডিফাইন করলে সারা দেশের মানুষ সেই দাবিগুলো নিয়ে আন্দোলনকে পাড়ায় পাড়ায় ছড়িয়ে দিতে পারবে। এই দাবিগুলো সহজবোধ্য হতে হবে এবং স্বাধীনতার চেতনা ও সাধারণ মানুষের জীবন-যাপনের সংগ্রামের সাথে সিনক্রোনাইজড হতে হবে। গড়পড়তা কিছু দাবি তুললে হবে না। এমন দাবি আনা যথেষ্ট কঠিন কাজ।

২. আপনাদের দাবিগুলোর মধ্যে বিচারপ্রক্রিয়া আওয়ামী রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত করার একটা দাবি রাখবেন অবশ্যই।

অনেকেই কনফিউশনে আছেন এই চিন্তা করে যে ট্রাইবুন্যালকে নিয়ে প্রশ্ন করলে, পরবর্তী বিচার বাধাগ্রস্ত হবে। আমি তাদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলি। যত জনকে ধরা হয়েছে, তাদের মধ্যে কাদের মোল্লা ছিল সেই রাজাকার যার বিরুদ্ধে মানব হত্যার অভিযোগ সবচেয়ে বেশি ছিল, যাকে নিয়ে ক্লিয়ারলি ডিফাইন্ড অভিযোগ ছিল, পরিষ্কার সাক্ষ্যপ্রমাণ ছিল এবং পাঁচ-পাঁচটা মামলায় অপরাধী প্রমাণিত হওয়ার পরেও মধ্যরাতের আঁতাতে তার রায় ফাঁসি থেকে

যাবজ্জীবন হয়ে গেল। পেপারে অলরেডি আসা শুরু হয়েছে, সরকার আর জামায়াতের মধ্যে আঁতাত হয়েছে এবং যার ফলশ্রুতিতে আওয়ামী লীগ জামায়াতকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ছাড় দিচ্ছে এবং পাঁচটি মামলায় অপরাধী প্রমাণিত কাদের মোল্লার ফাঁসি থেকে যাবজ্জীবন তার মধ্যে একটি। এইসব জেনে শুনে বুঝেও যদি আপনারা আওয়ামী প্রভাবমুক্ত আদালতের দাবি তুলতে না পারেন, তো আপনারা পাবলিকের পালস বুঝতে ভুল করছেন।

৩. প্রথম আলোর ফেসবুক কমেন্টস পড়ে দেখেন। অনেকেই এই আন্দোলনকে আওয়ামী লীগের আর একটা চালের সাথে গুলিয়ে ফেলছে।

জনমানুষকে আরো ক্লিয়ার মেসেজ দিতে হবে। এই আন্দোলনে আমরা যারা সাড়া দিচ্ছি তারা মূলত 'সোশ্যাল মিডিয়া থেকে খবর রাখি' টাইপ শ্রেণি এবং কোনো না কোনো ভাবে পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিজম করি বা করার বাসনা রাখি।
কিন্তু যারা জীবনযুদ্ধে ব্যস্ত বা যারা মেইনস্ট্রিম মিডিয়া থেকে ইনফর্মেশন নেয় বা যারা সরল মনে ষড়যন্ত্রতত্ত্বের ভিত্তিতে সব কিছুকে ডিফাইন করে, তাদের জন্যে আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে ভণ্ডামির থেকে এই আন্দোলনের তফাতটা ক্লিয়ার না। এই অ্যাঙ্গেলটা ভুলে যাবেন না।

সামারি করে আবার বলি।

একটা তিন দফা বা চার দফা দাবি করে সেই দাবিগুলো সারা দেশে ছড়িয়ে দিন। মানুষ শাহবাগ ছেড়ে যাবে কয়েকদিন বাদে। কিন্তু দাবিগুলো নিয়ে পরবর্তীতে বিভিন্ন পর্যায়ে, বিভিন্ন সময়ে, ভিন্ন প্লাটফর্মে ধাপে ধাপে কাজ করা যাবে। কাদের মোল্লার রায় নিয়ে এত ভয়ংকর একটা ভণ্ডামির পর আওয়ামী মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ব্যবসার সাথে এই আন্দোলনের পার্থক্যটা ক্লিয়ারলি ডিফাইন করা অতীব জরুরি। যদি ডিফাইন না করেন, সাধারণ মেইনস্ট্রিম মিডিয়াসেবী মানুষ কনফিউজড হবে।
অলরেডি হচ্ছে।

চ্যাপ্টার ১১. শাহবাগের দ্বিধাসমূহ এবং তার উত্তর

আমি শাহবাগের জনতার একজন। উপরের স্ট্যাটাস থেকে দেখবেন, এই সময়টাতে জনতার যে কনফিউশন, কী তারা চায়, কে এটা চাইবে। এত মানুষতো এরকম বিচ্ছিন্নভাবে চলতে পারে না। এইগুলার ব্যাপারে শাহবাগের জনতার কিছু প্রশ্ন ছিল। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তখনও দেয়া হয় নাই। তাই আমি এই সময়টাকে কনফিউশন স্টেজ বলেছি। এটা আমার বের করা। এর কোনো প্রকাশ্য সিগনাল ছিল না। কিন্তু আমি মনে করি শাহবাগে প্রথমেই যখন মানুষ জড়ো হয়েছে তখনএই প্রশ্ন এবং কনফিউশনগুলো ছিল সব চেয়ে বড় ইস্যু।

এই কনফিউশানের কারণগুলোকে আর একটু ব্যাখা করি।

শাহবাগের মূল ইস্যু ছিল তিনটা: ১. লীগ-জামায়াতের আঁতাতের রায় ২. এর বিরুদ্ধে জনতার বিক্ষোভ ৩. যার দাবি হলো প্রতিটা যুদ্ধাপরাধীর যেন প্রাপ্য বিচার, ফাঁসি হয়।

খুব সিম্পল।

লীগ-জামায়াতের আঁতাতের রায়ের বিরুদ্ধে জনতার বিক্ষোভ যার দাবি হলো প্রতিটা যুদ্ধাপরাধীর যেন প্রাপ্য বিচার, ফাঁসি হয়।

এখন দেখেন, এই তিনটা ইস্যু থেকে চারটা প্রশ্নের জন্ম নেয়।

১. শাহবাগ আওয়ামী লীগের পক্ষে নাই, কারণ এটা আওয়ামী আঁতাতের বিরুদ্ধে। শাহবাগ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে কি না?

২. যেহেতু আঁতাতের রায়, সেহেতু রায়ের বিরুদ্ধে দাবি তোলা হয়েছে। তার মানে যে ট্রাইবুন্যাল রায় দিয়েছে, তারা সরকারের আঁতাতে সঙ্গী হয়েছে। ফলে এই ট্রাইবুন্যালকে সরকারি প্রভাবমুক্ত করাটা শাহবাগের একটা মূল দাবি। প্রশ্ন হলো এই ট্রাইবুন্যালকে সকল আঁতাতের প্রভাবমুক্ত করার জন্যে শাহবাগ দাবি দেবে কি না?

৩. ৩০ লক্ষ মানুষ হত্যার সাথে যারা জড়িত তাদের কোনো লঘুদণ্ড হতে পারে না। তাদের অবশ্যই ফাঁসি হওয়া উচিত।

৪. এবং এই প্রশ্নগুলোর বাইরের একটা প্রশ্ন, ২০ বছর পরে এটা তরুণদের প্রথম জাগরণ। এই সময়ের যে বিশ্বব্যাপী তরুণদের জাগরণ, তার ধারাবাহিকতায় তরুণদের চাওয়ার না পাওয়ার ফ্রাসটেশনের বিস্ফোরণে জন্ম নেয়া শাহবাগ

একটা অ্যান্টিএস্টাব্লিশমেন্ট মুভমেন্ট হিসেবে সমাজের অনাচার এবং রাষ্ট্রের অবিচার এবং দুঃশাসন ও অন্যান্য অন্যায় এবং অপরাধের বিপক্ষে অবস্থান নিবে কি না।

এই চারটা প্রশ্নের মুখোমুখি শাহবাগকে হতে হয়েছে এবং সেটার উত্তর দিতে হয়েছে। কিন্তু কে দিয়েছে সেই উত্তর? কোন সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তি বা দল যারা সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছে? সেটা নিয়ে যে ধোঁয়াশা আছে তা আমি ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব। কিন্তু বাস্তবতা হলো এই ডিসিশনগুলোতে শাহবাগের যে জনতা জড়ো হয়েছিল তাদের ভূমিকা ছিল কি না? এখন জনতা যদি নেতা হয়, তাহলে এই সিদ্ধান্ত জনতারই নেয়ার কথা। কিন্তু আমরা জানি জনতা সেই সিদ্ধান্ত নেই নাই।

এটা আমরা জানি, কেউ জনতাকে প্রশ্ন করে নাই। আচ্ছা, এটা এটা প্রশ্ন, এটা এটা উত্তর, এখন আপনারা হাত তুলে বলেন, কী করব আমরা?

সেটা হয় নাই। এবং হওয়ার কথাও না। কিন্তু হয় যে নাই সেটা পরিষ্কার হওয়া ভালো।

এখন জনতা যদি সিদ্ধান্ত না নিয়ে থাকে তাহলে কোনো ডিসিশনমেকিং বডি অবশ্যই এই সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছে? ওরা কারা, তাদের কম্পোজিশন কী?

আমরা জানি শাহবাগে একটা কমিটি হওয়ার কথা হচ্ছিল কিন্তু আমার জানা মতে কোনো কমিটি হয় নাই। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেয়ার একটা বডি অবশ্যই তৈরী হয়েছিল। আমরা কিছু তথ্যের ভিত্তিতে ধরে নিতে পারি এই বডিটা কে? কিন্তু, সেইটা আমরা নিশ্চিত করে জানি না। আমরা জানি, এই চারটা প্রশ্নে এই বডিটা জনতাকে জিজ্ঞেস না করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এবং এই সিদ্ধান্তগুলো, শাহবাগ এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র কি ভাবে পরিচালিত হবে, তার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। তাই কমিটির অভাবে কোন বডিটা এই সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছিল তা শাহবাগের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এবং এই বডিটাকে কারা সিদ্ধান্ত নিতে অনুমোদন দিলো সেইটাও শাহবাগের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই দুইটি প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর দেয়ার ভার আমি শাহবাগের ইনার সার্কেলের প্রত্যক্ষদর্শীদের হাতে ছেড়ে দিলাম।

যাই হোক, আমরা দেখি এই বডিটা এই প্রশ্নগুলোর কি কি উত্তর ঠিক করেছিল।

প্রশ্ন ১. আঁতাতের রায় করেছে যে সরকার তার বিরুদ্ধে শাহবাগ যাবে কি না।

এটার সিদ্ধান্ত ছিল শাহবাগ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যাবে না।

প্রশ্ন ২. আঁতাতের রায়ে যে ট্রাইবুন্যাল সঙ্গী ছিল তার বিরুদ্ধে শাহবাগ কোনো দাবি করবে কি না। এর উত্তরে সিদ্ধান্ত ছিল, ট্রাইবুন্যালকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করার জন্যে কোনো দাবি শাহবাগ তুলবে না। এবং যে কোনো মূল্যে ট্রাইবুন্যালের ইমেজ রক্ষা করবে এবং ট্রাইবুন্যাল যাই করুক, শাহবাগ ট্রাইবুন্যালের ইমেজ রক্ষা করবে। নইলে জামায়াত শিবির এবং ছাগুরা বলার সুযোগ পাবে, ট্রাইবুন্যাল ইনফ্লুয়েন্সড হচ্ছে।

প্রশ্ন ৩. শাহবাগ যে কোনো পরিস্থিতিতে চিহ্নিত যে কোনো যুদ্ধাপরাধীর সর্বোচ্চ দণ্ড মানে ফাঁসি চাইবে। এর কমে শাহবাগ সন্তুষ্ট হবে না।

প্রশ্ন ৪. শাহবাগ কোনো ক্ষেত্রেই অ্যান্টিএস্টাব্লিশমেন্ট স্টান্স নেবে না। শাহবাগ শুধু বাংলা পরীক্ষা দেবে। এবং এই রাষ্ট্রযন্ত্রকে শুদ্ধ করা বা তরুণদের মনের যে দাবি, এই প্রশ্নগুলো যারা করবে তাদেরকে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। এবং এটা ধরে নেয়া হবে যে, এরা ঘাতক দালালের বিচার চায় না এবং শাহবাগকে বিভ্রান্ত করার জন্যেই এরা এইসব প্রশ্ন করছে।

এই ডিসিশনগুলো নিতে হলে শাহবাগের একটা নেতা নির্বাচন করার প্রশ্ন চলে আসে। এই কনফিউশন স্টেজে সেই প্রশ্নটাও নির্ধারিত হয়। BOAN-এর আহবায়ক হিসেবে ডাক্তার ইমরানকে শাহবাগের মুখপাত্র প্রকারান্তরে নেতা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। এইটা একটা সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন যার খুব ভালো উত্তর আমি পাইনি। আমার মনে হয়েছে, এটা সচেতন প্রক্রিয়াতেও হয় নাই আবার অরগানিক প্রক্রিয়াতেও হয় নাই।

কিন্তু এটা কিন্তু খুব পরিষ্কারভাবে এস্টাবলিশড হয় যে, শাহবাগের মুখপাত্র ডাক্তার ইমরান। যদিও এইটা নিয়ে একটা কনফিউশন রয়ে যায় অনেক দিন পর্যন্ত কারণ সবার মুখ থেকেই এই সময়ে আমরা শুনি শাহবাগের নেতা হচ্ছে জনতা।

এমনকি ডাক্তার ইমরানকেও যদি কেউ জিজ্ঞেস করে শাহবাগের নেতা কে, উনি উত্তর দিয়েছেন, শাহবাগের নেতা হচ্ছে জনতা। কিন্তু এই স্টেজের পর থেকেই শাহবাগের সকল ক্রিটিক্যাল ডিসিশন মূলত BOAN এবং ডাক্তার ইমরানের তরফ থেকে আসে।

আমি একটু সাত তারিখে আমার দেশ পত্রিকার নিউজ থেকে একটু কোট করি:

‘শাহবাগে ব্লগার অ্যান্ড অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট নেটওয়ার্ক’ নামের একটি সংগঠন প্রথমে কাদের মোল্লার যাবজ্জীবন রায় বাতিল করে ফাঁসির দাবিতে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করে...’

ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই দিনে প্রথম আলো এবং আমার দেশ উভয় দলই BOAN কে শাহবাগের অর্গানাইজার হিসেবে মেনে নিয়েছে।

এই দিন জনতা এতই বেড়ে যায় যে, পুলিশ টিএসসি কাঁটাবন এবং আর একদিকে রূপসী বাংলা হোটেল পর্যন্ত রাস্তা বন্ধ করে দেয়।

শাহবাগে জনতার মঞ্চ থেকে ৮ তারিখ মহাসমাবেশ ঘোষণা করা হয় এবং এই মহাসমাবেশ থেকে কোন কোন দাবি দেয়া হবে সেটা নিয়ে শাহবাগের অর্গানাইজাররা এই সময়ে কিছু ব্রেইনস্টর্মিং করে। এবং এই দাবিগুলো কি হবে তা নিয়ে শাহবাগের মধ্যে বেশ কিছু অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

এখন বলি কেন এই সময়টিকে আমি বলছি শাহবাগের স্বাতন্ত্র্য স্টেজ। কারণ এই দিনগুলোতে শাহবাগ ছিল সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র একটি স্বত্বা। যদিও ভেতরে ভেতরে দ্বন্দ্ব চলছিল, কিন্তু সেই দ্বন্দ্বগুলোর ডেফিনিট সুরাহা না হওয়াতে শাহবাগের নিজের সত্তা বজায় ছিল। পেপার-পত্রিকাতে BOAN-এর নাম এলেও শাহবাগে জনতা আসলেই লিড দিচ্ছিল। যেটা এই সময়ের পরে শাহবাগ আর ধরে রাখতে পারেনি। এবং এই সময় পরিষ্কারভাবে শাহবাগ ছিল অ্যান্টিএস্টাব্লিশমেন্ট একটা এনটিটি। আমি বলবো না সরকার-বিরোধী। আমি বলবো, অ্যান্টিএস্টাব্লিশমেন্ট। এই দুইটা শব্দের মধ্যে পার্থক্য আছে। কিন্তু এস্টাব্লিশমেন্টের প্রধান পক্ষ হচ্ছে আওয়ামী লীগ, কারণ তখনকার সরকার হচ্ছে আওয়ামী লীগের সরকার। ফলে সেটা অবশ্যই আওয়ামী লীগের জন্যে অস্বস্তিকর ছিল।

কিন্তু একই সাথে আওয়ামী লীগ শাহবাগের সম্ভাবনাটাকেও পরিপূর্ণভাবে অনুভব করে। এবং এও অনুভব করে, শাহবাগের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় তাদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যক্তি আছে, যাদেরকে সমর্থন দিলে, তারা শাহবাগকে সমস্যা থেকে একটি সম্ভাবনায় রূপান্তরিত করতে পারবে। ফলে শাহবাগকে ক্যাপচার করতে সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে এবং সফল হয়।

কিন্তু তার পূর্বে এই সময়ে শাহবাগের যে অ্যান্টিএস্টাব্লিশমেন্ট চরিত্র ছিল সেটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। এই জন্যে আমি প্রথম আলোর একটা নিউজ দেই। এটা

সাত তারিখের ঘটনা, নিউজে আসে ৮ তারিখ সকালের পেপারে।

জনতার বাধায় সভাস্থল ছাড়লেন হানিফ

এই নিউজে দেখা যাচ্ছে,

রাজধানীর শাহবাগ। চারপাশে প্রতিবাদী মানুষের ঢল। সময় তখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা। যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার ফাঁসির দাবিতে চলছে তৃতীয় দিনের মতো প্রতিবাদ কর্মসূচি। সেখানে উপস্থিত হলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ। ঘোষণা করা হলো, আন্দোলন ও প্রতিবাদের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য দেবেন তিনি।

এ সময় সভাস্থলে শুরু হলো হইচই। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক প্রণব দেব রায় প্রথম আলো ডটকমকে বলেন, হানিফ বক্তব্য দেবেন, এমন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত জনতা প্রতিবাদ জানান। তাঁরা 'সরকারের সমঝোতার রায় জনগণ মানে না', 'আপোষের রায় মানি না' বলে শ্লোগান দিতে থাকেন। এ সময় আওয়ামী লীগের নেতা হানিফ হাত নেড়ে জনগণকে থামানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু জনগণের শ্লোগান বাড়তেই থাকে। শুধু কাদের মোল্লা নয়, সব যুদ্ধাপরাধীকে ফাঁসি দিতে হবে বলে শ্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা।

(খুব খেয়াল করেন, কথাটা। এইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা যাকে চিৎকার চেঁচামেচির মধ্যে অ্যামপ্লিফাই করে শুনতে হবে বারবার। এইটা শাহবাগ থেকে আসা জনতার কণ্ঠ। জনতা বলছে, শুধু কাদের মোল্লা নয়, সব যুদ্ধাপরাধীকে ফাঁসি দিতে হবে এবং তা বলে শ্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। সরকারের সমঝোতার রায় জনগণ মানে না। এই দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ লাইন। যাতে আমাদের বারবার ফিরে আসতে হবে শাহবাগের জনতা কী চেয়েছিল তার রেফারেন্স হিসেবে। শাহবাগের জনতা বলছে যার ভাষা আর শোনা যায়নি, 'শুধু কাদের মোল্লা নয়, সব যুদ্ধাপরাধীকে ফাঁসি দিতে হবে'। 'সরকারের সমঝোতার রায় জনগণ মানে না'।)

এক পর্যায়ে সেখানে দাঁড়ানো আওয়ামী লীগের নেতার আশপাশে বেশ কয়েকটি পানির বোতল ছোঁড়া হয়। ঘটনার এক পর্যায়ে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের কয়েকজন নেতাকে সঙ্গে নিয়ে সভাস্থল থেকে সরে যান মাহবুব উল আলম

হানিফ। বক্তব্য না দিয়েই শাহবাগ থেকে চলে যান তিনি।

এই দিন এবার একটু বিএনপির প্রতিক্রিয়া দেখি।

শাহবাগ নিয়ে বিএনপি প্রথম থেকেই সম্পূর্ণ কনফিউজড অবস্থায় ছিল। কারা শাহবাগ করছে, কেন শাহবাগ করছে, এই বিষয়ে তাদের আইডিয়াই ছিল না। ফলে তাদের এই সময়ে স্ট্র্যাটেজি ছিল থাইল্যান্ডের সেই বিখ্যাত বানরের মূর্তির মতো। কিছু দেখছি না, কিছু শুনছি না, কিছু বলছি না।

অন্যদিকে, আওয়ামী লীগ বুঝতে পারে ঘটনা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাদের শীর্ষ নেতাদের মঞ্চে উঠতে দেয়া হচ্ছে না। এবং রাজাকারদের ফাঁসি তাদের নিজস্ব মেসেজ। এবং লক্ষ লক্ষ লোক জড়ো হয়েছে যেটায় তাদের 'মেসেজ' তাদের হাত থেকে চলে যাচ্ছে। জয় বাংলাকে আওয়ামী লীগের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়ার কথা হচ্ছে।

এই সময়ে আমি অনেক লোকের মুখে একটা কথা শুনি। 'জয় বাংলা' শ্লোগান আওয়ামী লীগের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে। আমার এক কলিগ যিনি ঘোর বিএনপি সমর্থক, তিনি বলেন 'মেয়েদের নিয়ে শাহবাগ গিয়েছিলাম। তাদের নিয়ে জয় বাংলা শ্লোগান দিলাম। কি যে ভালো লাগছে, বোঝাতে পারব না। এবং মেয়েদেরকেও শ্লোগান দেওয়ালাম। যাতে ওরা বোঝে জয় বাংলার মাধুর্য্য।'

কিন্তু দল হিসেবে বিএনপি তাদের এ ধরনের সমর্থকদের চেতনা ধারণ করতে পারে নাই। বিএনপি এইদিন চেয়ারম্যানের গুলশান কার্যালয়ে মিটিং করে। এই মিটিং থেকে শাহবাগ সম্পর্কিত কোনো আলাপ আসে নাই। এত বড় একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। তারা ওই দিন মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেয় 'আগামী ৯ মার্চ বিএনপির জাতীয় কাউন্সিলের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে।' সূত্র—প্রথম আলো।

কিন্তু আওয়ামী লীগ অফিশিয়ালি নাড়াচাড়া শুরু করে।

চ্যাপ্টার ১২. মঞ্চ ক্যাপচার স্টেজ

শাহবাগ পর্ব ৪. মঞ্চ ক্যাপচার স্টেজ

৮ ফেব্রুয়ারি

মঞ্চ ক্যাপচার স্টেজের স্থায়িত্ব মাত্র অর্ধেক দিন।

৮ তারিখ ছিল শুক্রবার। এটা শাহবাগের জন্যে একটা ইম্পর্ট্যান্ট দিন। এতদিন শাহবাগ ছিল, সিট-ইন প্রটেস্ট। মানে দাবি না হওয়া পর্যন্ত এখানে বসে থাকব। কিন্তু ৮ তারিখে ছিল শাহবাগে ঘোষিত মহাসমাবেশের দিন। এইদিন শাহবাগে মানুষের ঢল নামে।

মঞ্চ ক্যাপচার মঞ্চ ক্যাপচার হওয়ার মাধ্যমে এই দিনে শাহবাগের একটা ইম্পর্ট্যান্ট ফেজের সমাপ্তি।

কারণ এই মহাসমাবেশের আগের দিন, বেশ কিছু আওয়ামী নেতাকে মঞ্চে উঠতে দেয়া হয় নাই। কিন্তু মহাসমাবেশ যেটা হয় তাতে, BOAN তার সাথে ছাত্রলীগের নেতারা এবং আওয়ামী ঘরানার সাংস্কৃতিক নেতারা মঞ্চের আশেপাশে সম্পূর্ণ দখল নেয়। এবং বাম নেতাদেরকে এইদিন মঞ্চে উঠতে দেয়া হয় নাই। আমার জানা মতে বেশকিছু অত্যন্ত সুপরিচিত বাম নেতা এইদিন মঞ্চে গিয়েও বক্তৃতা দিতে পারে নাই। এবং মহাসমাবেশের মঞ্চ সম্পূর্ণভাবে BOAN এবং লীগের ইম্পর্ট্যান্ট নেতা BOAN ঘরানার কিছু ব্লগারদের দখলে থাকে কঠোরভাবে।

এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

মঞ্চে কে উঠবে না, কে উঠবে এইসব নিয়ে কিছু গল্প আমি শুনেছি, কিন্তু যেহেতু নিজে দেখেনি তাই সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের সুযোগ না থাকাতে আমি তা নিয়ে লিখছি না। কিন্তু শাহবাগ নিয়ে ব্যক্তিগত স্মৃতি যারা লিখবেন, তাদের জন্যে সেই দায় রেখে গেলাম।

আমি কিছু লোকের মুখে শুনছি, এই দাবিগুলো কি হবে তা নিয়ে বিভিন্ন পক্ষের কিছু গুতাগুতি হয়েছে কিন্তু ফাইনালি BOAN এবং তাদের গ্রুপের ব্লগাররা যেইটা বলছে সেটাই দাবি হিসেবে আসছে।

দাবিগুলো কি হবে তা নির্ধারণ করা কিন্তু একটা ক্রিটিক্যাল ইস্যু। এই সময় শাহবাগ সম্পূর্ণ জাতির কেন্দ্রে এবং এই মুভমেন্ট কী হয়ে দাঁড়াবে তাও সেইদিন ক্লিয়ার না। ফলে শাহবাগ যদি এমন সব দাবি তুলতো যেগুলো সরকার পূর্ণ করতে পারবে না, তাহলে সরকার অবশ্যই একটা অস্বস্তিকর সিচুয়েশনে পড়তো। এই জন্যে এই দাবিগুলো যেন সরকারের জন্যে অস্বস্তিকর না হয়

সেটা নিশ্চিত করা সরকারের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

৮ তারিখের মহাসমাবেশে দাবি ঘোষণা করা হয় নাই। এইদিন কিছু শপথ নেয়া হয়েছে। এবং সব কিছু ইমরান ঘোষণা করেছে। ফলে শাহবাগের নেতা হিসেবে ইমরান নির্ধারিত হয়ে যায়—যদিও পাবলিক ভার্সনটা ছিল, ইমরান শাহবাগের মুখপাত্র কিন্তু জনতাই শাহবাগের নেতা।

এই মহাসমাবেশ নিয়ে ব্লগারদের মধ্যে কিছু কনফিউশন সৃষ্টি হয়। কারণ তারা কিন্তু বুঝতে পারেন, জনতা যদি নেতা হয়েও থাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো ক্ষমতা জনতার বা তাদের নাই। স্পেশালি, ছবির হাটভিত্তিক যেই গ্রুপটার কথা আমি বলেছি, তাদের কথা বার্তায় এই নিয়ে কষ্টটা কিন্তু ফুটে ওঠে। কেউ মুখে বলেন, কেউ বলেন নাই। কিন্তু যারা ইনার সার্কেলের লোক তারা একটা হালকা উপলব্ধির মধ্যে বুঝে নেন, জনতা তাদের হাতে আছে কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ তাদের হাতে নাই। সেটার ফুল এজেন্সি BOAN এবং এর সাথে সংযুক্ত সরকার পক্ষের কিছু ব্লগারদের। তারা আরো বুঝে নেন BOAN যেহেতু আওয়ামী ঘরানার সেহেতু তাদের সাথে পেরে ওঠা সম্ভব না। বরং BOAN কে যতদূর সমঝে চলে জনতার হিস্যা আদায় করা যায় সেটাতেই তারা মনোযোগ দেন, অনেকে সসম্মানে কেটে পড়েন।

আমি জাতীয় স্বার্থে ব্লগার এবং অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট নেটওয়ার্কের পারভেজ আলমের ফেসবুক স্ট্যাটাস কোট করছি:

১. 'মহাসমাবেশ ছাত্র যুব সমাবেশ হবে ঘোষণা দিয়েও আসলে তা করা যায় নাই। দিনশেষে বুড়োরাই বেশি যে যার মতো চেহারা দেখিয়ে গেছেন। রাজনীতিবিদদের বদলে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্যানেলের শিক্ষকরা প্রক্সি দিয়ে গেছেন। জাফর ইকবাল স্যার অসাধারণ বক্তৃতা দিয়েছেন। কিন্তু সেই সুবাদে অবাধে ছিনতাই হয়ে গেছে ছাত্র যুব সমাবেশ।'

২. 'মহা সমাবেশে ব্লগারদের কোনো প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন নাই।'

আমি সেদিনের বিভিন্নজনের স্ট্যাটাস দেখে বুঝেছি, বেশিরভাগ অর্গানাইজার এই সময় ডাক্তার ইমরানকে শাহবাগের অবিসংবাদিত নেতা এবং মুখপাত্র হিসেবে মেনে নেয়। এবং এইটা নিয়ে তাদের অনেকের মধ্যে কিছু সন্দেহ এবং হালকা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

আমি এই মুহূর্তে তার মধ্যে একটা কোট করছি, যেটা আরেকজন সিনিয়র ব্লগার

শেয়ার করেন। এটা ৯ তারিখের সমাবেশের পরের পোস্ট। কিন্তু একই জিনিস নির্দেশ করছে।

http://www.somewhereinblog.net/blog/jontronablog/29765621

আজকের মহাসমাবেশ—কিছু প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি দুঃখ-ক্ষোভ

আমি ইমরানকে চিনি না, তার সাথে আমার গতকাল সন্ধ্যার আগে কখনো কথা হয় নি, যোগাযোগের জায়গাও ছিল না। তবে গতকাল মহাসমাবেশের ঘোষণার পর আমার ভেতরে একটাই আগ্রহের জায়গা ছিল, আগামীকালের মহাসমাবেশ থেকে কী ঘোষণা আসবে? সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণে আয়োজনটা যেভাবে বলিষ্ঠ হয়েছে সেই সাধারণ মানুষ তাদের নিজস্ব ক্ষোভ আক্ষেপের জায়গা থেকে এই অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টদের আহবানে সাড়া দিয়েছে, নিজেদের উপস্থিতি দিয়ে আয়োজনকে জীবন্ত করে তুলেছে, তাদের ভেতরে অনেক ধরনের অস্পষ্ট প্রত্যাশা কিংবা দাবি আছে, তারা সেসব ভেতরে নিয়েই এখানে আসছে, নিজেদের সংহতি প্রকাশ করছে সচেতন উপস্থিতির মাধ্যমে।

এই কয়েক হাজার মানুষের সামনে এই আয়োজকরা কি বক্তব্য কিংবা দাবি উপস্থাপন করবে? সে দাবির সাথে জনগণের প্রত্যাশা কতটুকু মিলবে, তাই উপস্থিত কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম 'ইমরান' সে ব্যক্তি যে সব জানে। আরিফ জেবতিকের কল্যাণে ইমরানের সাক্ষাত পেলাম, তাকে প্রশ্ন করলাম আগামীকাল মহাসমাবেশের ডাক দিয়েছেন আপনি, আপনি উপস্থিত জনগণকে ধন্যবাদ জানাবেন? আর যদি ধন্যবাদই জানান তার সাথে আর কি বক্তব্য তাদের সামনে উপস্থিত করবেন যার ভিত্তিতে এখানে আসা সেই মানুষটার মনে হবে তার উপস্থিতি এ আয়োজনে অবশ্যই প্রয়োজনীয় ছিল। সে এখানে এসে নিজের জন্যে কিছু অর্জন করেছে।

একটা চলমান আন্দোলনে যারা সরব উপস্থিতি রাখে তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ অবস্থান থেকে এক ধরণের প্রাপ্তিবোধ তৈরি হলে তারা একই দাবিতে পরবর্তী আন্দোলনে আসবে। তাদের যদি পরবর্তী কোনো দাবিতে ঐক্যবদ্ধ করতে হয় তাহলে তাদের সামনে এমন কিছু আপনার উপস্থাপন করতে হবে যেটা পেয়ে সে ভাববে, তার অর্জনের খাতা পূর্ণ হলো। আপনি কি ভাবছেন?

ইমরান এ প্রশ্নের কোনো স্পষ্ট উত্তর দেয় নি।

আমি এটা একটা কোট করলাম। কিন্তু আমি আরো অনেকের স্ট্যাটাস থেকে এবং কথায় যেটা বুঝেছি, এই পর্যায়ে শাহবাগের অর্গানাইজাররা ক্লিয়ারলি ইমরানকে তাদের মুখপাত্র হিসেবে মেনে নেয়। কিন্তু মুখে মুখে অনেকেই এটা মানতে অস্বীকার করেন। তারা এখনো অস্বীকার করেন, প্রথম দিন থেকেই শাহবাগের অবিসংবাদী নেতা ছিল ইমরান।

তারা আমাকে বলতে পারেন, 'আপনি না জেনে কথা বলেন, মিয়া অফ যান। শাহবাগের কোনো নেতা-ফেতা কেউ ছিল না। জনতাই শাহবাগ। আমি ছিলাম শাহবাগে, আমি জানি। আমরা নিজেরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিছি, জনতা জনতার সিদ্ধান্ত নিছে। আপনি মিয়া একটা টাউট। কিছু না বুঝে ফাল পারতাছেন। অফ যান।'

তাদের এই দাবির মধ্যে একটা সত্য আছে। এটা একটু বুঝতে হবে।

শাহবাগ বলতে শাহবাগের পুরো এলাকাটাকে বোঝায় আর গণজাগরণ মঞ্চ বলতে বোঝায় মঞ্চকে।

আওয়ামী লীগ এবং BOAN কখনোই পুরো শাহবাগ নিয়ে চিন্তিত ছিল না। তাদের মূল ইস্যু ছিল, শাহবাগের মঞ্চ এবং শাহবাগের ডিসিশন মেকিং চেইনের উপর দখল নেয়া। এখন পুরো শাহবাগে অনেকে অনেক কিছু চিন্তা করে আসতে পারে। কিন্তু শাহবাগের মূল মেসেজ যেইটা আসছে গণজাগরণ মঞ্চ থেকে সেটা কমপ্লিটলি BOAN এবং তাদের সমমনা অল্পকিছু ব্লগারের হাতে ছিল আর BOAN এবং এই আওয়ামী মনা ব্লগাররা সব সময়েই আওয়ামী মেসেজটা নিয়ে শাহবাগে মুভ করছে।

ফলে যেটা হয়েছে, টেকনিক্যালি শাহবাগ অনেকদিন পর্যন্তই কিছুটা স্বতন্ত্র ছিল। কিন্তু সেই স্বাতন্ত্র্য ছিল মূল্যহীন। এই ৮ তারিখ থেকে শাহবাগের জাগরণ মঞ্চে কে উঠবে, কে উঠবে না, মিডিয়ায় কে কী বলবে না বলবে, কে কে মিডিয়ায় শাহবাগের মুখপাত্র হয়ে যাবে, শাহবাগের যে অনলাইন পেজ খোলা হয়েছে সেখানে কী মেসেজ যাবে, এক একটা ঘটনায় শাহবাগ কিভাবে রিঅ্যাক্ট করবে তার সবকিছুর উপর এই ৮ তারিখ থেকেই BOAN-এর এবং তার ধারাবহিকতায় আওয়ামী লীগের একচ্ছত্র দখল ছিল।

ফলে টেকনিক্যালি ৮ তারিখ শাহবাগের মঞ্চ আওয়ামী লীগের হাতে সম্পূর্ণভাবে ক্যাপচার হয়ে যায়। এই সময় বেশ কয়েকজন সিনিয়র

অ্যাক্টিভিস্টের ভাষ্যমতে মঞ্চের আশেপাশের জায়গায় ছাত্রলীগের বিভিন্ন ওয়ার্ডের কর্মীদেরকে পার্মানেন্টলি স্টেশনড করা হয় যারা পালা করে শিফট অনুসারে ডিউটি দিতে থাকে। প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে খুব সিনিয়ার পর্যায়ের কর্মকর্তা ফুল টাইমে মঞ্চের সাথে অবস্থান নেয়।

জনতা তার নিজের মতো শাহবাগে এসেছে গিয়েছে। নিজের মতো বিক্ষোভ প্রতিবাদ করেছে পুরো শাহবাগ জুড়ে। কিন্তু মঞ্চের পাশে, ছাত্রলীগের স্ট্রিক্ট কন্ট্রোল থাকে। এবং কে উঠবে না কে উঠবে, এইগুলো খুব কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এবং ডাক্তার ইমরান শাহবাগের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

৯ ফেব্রুয়ারি।

এই সময়ের এখন শাহবাগে এত কিছু হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু মাহমুদুর রহমানের পছন্দ হয় নাই।

আমার দেশ এবং মাহমুদুর রহমান, এতদিন গণজাগরণের হালকা সমালোচনা করে গেছে। কিন্তু ৮ তারিখে যখন শাহবাগ ক্লিয়ারলি আওয়ামী লীগের হাতে ক্যাপচার হয়ে যায় এবং শাহবাগের মঞ্চ থেকে কিছু বিএনপির জন্যে রিস্কি কথাবার্তা আসা শুরু করে, তখন আমার দেশ শাহবাগকে ক্লিয়ার প্রতিপক্ষ হিসেবে ধরে নেয়।

এই জন্যে দেখবেন, ৮ তারিখে আমার দেশের শাহবাগ নিয়ে মেইন নিউজগুলো ছিল

'শাহবাগে জনসমাগম বাড়ছে: কাদের মোল্লার ফাঁসি না হওয়া পর্যন্ত রাজপথে থাকার ঘোষণা'

'শাহবাগ স্কয়ারে এবার হানিফকে বোতল নিক্ষেপ: তোপের মুখে মন্ত্রী সাহারা খাতুন'

৯ তারিখে সেই হেডলাইন চেঞ্জ হয়ে যায়

'শাহবাগে ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি: গৃহযুদ্ধের উসকানি; বক্তাদের গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার: আওয়ামী বুদ্ধিজীবীদের রণহুঙ্কার''

'চরমপত্র পাঠকারী কে এই ব্লগার ইমরান!'

মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিত্বকারী পত্রিকা প্রথম আলোতে ইমরান সরকারের সাক্ষাৎকার ছাপায়,

‘সুশৃঙ্খল প্রতিবাদই বড় শক্তি’: ইমরান

এই সাক্ষাৎকারে ডাক্তার ইমরান সরকারের একটা কথা খেয়াল করার মতো ‘আপনাদের মিত্রশক্তি কারা,’ জানতে চাইলে তিনি বলেন, একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেছে, বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী ছাড়া দেশের সর্বস্তরের ও মতের মানুষের সঙ্গে আমরা একমত।

ডাক্তার ইমরান খুব ক্লিয়ারলি ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছেন, শুধু জামায়াত নয় বিএনপিও জাগরণ মঞ্চের বিপক্ষ।

পক্ষ বিপক্ষ যখন ক্লিয়ার হয়ে গেল, ৯ ফেব্রুয়ারি শাহবাগের মূলমঞ্চ থেকে দ্বন্দ্বের লাইনটা ক্লিয়ার হয়ে যায়। এবং সেই সময় বিএনপির মাউথ পিস মাহমুদুর রহমান শাহবাগকে নিয়ে তাদের স্ট্র্যাটেজি কী হবে সেটার একটা পরিষ্কার ডাইরেকশন পেয়ে যান। তা হলো, শাহবাগ তখন তাদের স্বভাবজাত শত্রু। ডাক্তার ইমরান সেই শত্রুদলের নেতা।

১০ ফেব্রুয়ারি

আমার দেশ

ফ্যাসিবাদ আক্রান্ত আমার দেশ: শাহবাগ ক্রমেই আওয়ামী নিয়ন্ত্রণে: বক্তৃতা দিয়েছেন মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী: ব্যবস্থাপনায় ছাত্রলীগ সভাপতি-সম্পাদক

প্রথম আলো

মন চায় শাহবাগে ছুটে যেতে: প্রধানমন্ত্রী

ট্রাইব্যুনাল আইনের সংশোধনী মন্ত্রিসভায় উঠছে কাল

শাহবাগের সঙ্গে একাত্ম সংসদ

সাংসদ শেখ ফজলুল করিম সেলিম। তিনি বলেন, ‘শাহবাগ চত্বরে নতুন প্রজন্ম গোটা জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাদের এই দাবি জাতির দাবিতে পরিণত হয়েছে। তাদের সঙ্গে আমি একাত্মতা প্রকাশ করছি।’

আওয়ামী লীগ জামায়াতের সঙ্গে আঁতাত করেছে বলে যে সমালোচনা করা হচ্ছে, তার জবাবে শেখ সেলিম বলেন, ‘আওয়ামী লীগ কোনো আঁতাত ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি করে না। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসেছিলেন বলেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হচ্ছে।’

এটা ছিল, আওয়ামী লীগের রিমার্কেবল টার্ন অ্যারাউন্ড এবং ম্যাচুরিটি।

আমরা দেখেছি, আওয়ামী লীগের আঁতাতের কারণে শাহবাগের জন্ম। যে

আওয়ামী লীগের নেতারা ৭ তারিখ বোতলের বাড়ি খেয়ে মঞ্চে উঠতে পারেন নাই সেই আওয়ামী লীগ, একদিকে শাহবাগের মঞ্চ নিজের কন্ট্রোলে নিয়েছে এবং অন্যদিকে তার সাথে একাত্ম হয়েছে।

আমরা যদি ফিরে যাই, ৫ তারিখের সংসদে সেখানে দেখবেন রাশেদ খান মেনন বলেছিলেন 'এ রায় নিয়ে মানুষের মনে যে প্রশ্ন উঠেছে তার জবাব দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। মাননীয় স্পিকার, সেই সাপ নিয়ে খেলছি। এ সাপের মুখে চুমু দিতে নেই। সাপের মুখে চুমু দিলে ছোবল মারবেই।'

মইন উদ্দীন খান বাদল বলেছিলেন 'আমি আমার স্বাধীনতাকে সমঝোতা করতে পারি না।'

কিন্তু মঞ্চ ক্যাপচার শেষে আওয়ামী লীগ এখন কমফোর্টেবল। কারণ শাহবাগের মঞ্চ তার দলের লোকের দখলে। এবং মঞ্চ যাতে বিগড়ে না যায়, এই জন্যে ডাক্তার ইমরানকে তারা সব সময় প্রটেক্ট করে রেখেছেন। এবং সব সময় ডাক্তার ইমরানের সাথে, ছাত্রলীগের সিনিয়র নেতারা গার্ড অফ অনারের মতো প্রটেকশন দিয়ে গেছেন এবং তাকে নিজের কন্ট্রোলে রেখেছেন।

মঞ্চের কাছে, একজন সিনিয়ার ব্লগারের ভাষায়, এক এক বেলা মহানগরী ছাত্রলীগের বিভিন্ন ওয়ার্ডের জনবল পালা করে ডিউটি দিয়েছে।

শাহবাগের জনতা, জনতার মতোই তাদের দাবি নিয়ে আন্দোলন নিয়ে, নাটক নিয়ে, গান নিয়ে উৎসবে মেতে যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবি জানিয়ে গেছে। কিন্তু মূল মঞ্চ এবং মঞ্চের ডিসিশন মেকিং খুব কড়াভাবে গার্ড দিয়ে গেছে আওয়ামী লীগ। জনতা সেটা বুঝে নাই। সেটা নিয়ে তাদের মাথাব্যথাও ছিল না।

কিন্তু অন্য যারা অর্গানাইজার ছিল, তারা অনেকেই কষ্ট নিয়ে সরে গেছেন বা মেনে নিয়েছেন।

১১ ফেব্রুয়ারি

আমার দেশ

শাহবাগে এক দাবি, বিচার নয় ফাঁসি চাই: বাম-ছাত্রলীগ সমন্বয়ে নতুন কমিটি হচ্ছে

সংসদে মহাজোটের এমপিদের হুঙ্কার: শাহবাগ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ শেখ হাসিনার: ট্রাইব্যুনালের প্রতি আহবান, রায়ে মানুষের আকাঙ্খা বিবেচনায় নিন

সেই ইমরানের নেতৃত্বে স্পিকারকে স্মারকলিপি: সব যুদ্ধাপরাধীর ফাঁসি নিশ্চিত করতে আইন সংশোধন, আমার দেশসহ মিডিয়া বন্ধের দাবি

বিভিন্ন স্থানে আমার দেশ-এ আগুন: বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা: চট্টগ্রামে সাংবাদিক ও পেশাজীবী নেতাদের উদ্বেগ

প্রথম আলো

জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধ হোক: অ্যাটর্নি জেনারেল

শাহবাগের গণজাগরণ ছড়িয়ে পড়ছে গ্রামেও

শাহবাগ নিয়ে বিএনপির 'কিন্তু' 'যদি'

১২ ফেব্রুয়ারি

প্রথম আলো

কাল গণসঙ্গীত, বৃহস্পতিবার মোমবাতি প্রজ্বলন

শাহবাগের আন্দোলন নিয়ে বিএনপির উদ্বেগ

আমার দেশ

লগি-বৈঠার খুনি বাপ্পাদিত্য বসু শাহবাগের নেতৃত্বে

শাহবাগের সমাবেশে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা: আজ ৩ মিনিট নীরবতা: শিবির সন্দেহে ১১ কাদিয়ানি যুবক আটক

১৩ ফেব্রুয়ারি

আমার দেশ: ফ্যাসিবাদী আক্রমণের কবলে ভিন্নমত: নয়া দিগন্ত অফিস প্রেসে আগুন: আমার দেশ-এ হামলার হুমকি: ময়মনসিংহ রংপুর নেত্রকোনায় আমার দেশ নয়া দিগন্তসহ বিভিন্ন পত্রিকায় আগুন

প্রথম আলো

শাহবাগে শহীদ জননীর প্রতিকৃতি দাঁড় করিয়ে জনতার সম্মান

জাতীয় ঐকমত্যের পর জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হবে: হানিফ

শাহবাগের নিরাপত্তায় র‍্যাবের ডগ স্কোয়াড

http://www.banglanews24.com/detailsnews|php?nssl=6a8d46355c24f59261d160460ce474a0&nttl=13022013173774

১৪ ফেব্রুয়ারি

প্রথম আলো

শাহবাগে কাল গণজাগরণ সমাবেশ

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বিলের প্রতিবেদন উপস্থাপন
আমার দেশ
মতিঝিল পল্টন রণক্ষেত্র: ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে জামায়াত-শিবির-পুলিশ সংঘর্ষে আহত ২০০ গ্রেফতার ৩০০
যুদ্ধাপরাধী নূরু মাওলানা গণজাগরণ মঞ্চের নেতা!
বিগত কয়েকদিনের ধারাবাহিকতায় এই সময় জামায়াত নিষিদ্ধ করাটাকে জাগরণ মঞ্চ একটা মূল মেসেজ হিসেবে আসে। এবং এই নিয়ে জামায়াতের সাথে সংযুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সমালোচনা করা হয় এবং সেগুলোর লিস্ট করা হয়। এবং তাদের পণ্য বর্জনের জন্যে আহবান জানানো হয়।
এই দিন আমি একটা স্ট্যাটাস দেই:
'গত দুই দিনের পেপার পড়ে খুব টাস্কিত হইলাম। আওয়ামী লীগ আওয়াজ তুলসে যে, জামায়াত নিষিদ্ধে সংসদে বিল আনতাছে।'
আওয়ামী লীগ যেই দিন সংসদে বিল এনে জামায়াত নিষিদ্ধ করবে, সেই দিন আমি আমার স্টুডিও সেল করে, আওয়ামী লীগের সেন্ট্রাল কমিটিতে চান্দা দিব।
এখন তরুণেরা জেগেছে, এখন আওয়ামী লীগের জন্যে জামায়াত নিষিদ্ধ করা নিয়ে কিছু বলা দারুণ লাভজনক বিষয়। তারা তাদের ব্লাইন্ড সাপোর্টার দের হাতে ফাইট করার জন্যে কিছু এলিমেন্ট তুলে দেবে। এরপর তারা খেলাফতের সাথে চুক্তি করবে, শিবির-এর ফুল নিবে, কাদের মোল্লার রায় ফাঁসি থেকে যাবজ্জীবন হয়ে যাবে, এরপর আবার তারা মঞ্চ দখল করে, যুদ্ধাপরাধ নিয়ে বিচার চাইবে।
এই খেলা তো গত ২০ বছর ধরে দেখতাছি। তবুও কিছু মানুষ এই সব খেলাতে এখনো সরল মনে বিশ্বাস করে।
'একই ভুল যদি আপনি দুইবার করেন, এইটা একটা ভুল। কিন্তু একই ভুল যদি আপনি বার বার করেন, এইটা আপনার মনোবাসনা। এইটা ভুল না।'
ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে তো তখন শাহবাগ নিয়ে উচ্ছাস তুঙ্গে। চারিদিকে গান হচ্ছে। কবিতা হচ্ছে। শাহবাগকে ২৪ ঘন্টা লাইভ সম্প্রচার করা হচ্ছে। শাহবাগের ভেতরে যে দ্বন্দ্ব হচ্ছে তা নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা হয়নি। একদিকে আছে সেক্যুলার মিডিয়া যার নেতৃত্বে প্রথম আলো—তারা শাহবাগ নিয়ে উচ্ছ্বসিত। আরেক দিকে আছে আমার দেশ যার কাছে শাহবাগ হলো

আওয়ামী লীগের প্রোগ্রাম। এর মাঝে কিছু নাই।
কিন্তু শাহবাগ তখন সমস্ত দেশের মনোযোগের কেন্দ্রে।

চ্যাপ্টার ১৩. রাজীব হত্যা এবং শাহবাগের পথ পরিবর্তন

শাহবাগ পর্ব ৫. রাজিব হত্যার পর ফাঁদে পড়ার স্টেজ

১৫ ফেব্রুয়ারি
এই দিন ব্লগার রাজীব বা থাবা বাবা খুন হয়।
১৬ ফেব্রুয়ারি
ব্লগার রাজিব খুন শাহবাগকে সম্পূর্ণ অন্য দিকে নিয়ে যায়। রাজীব হত্যা শাহবাগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বলতে গেলে, রাজীব হত্যা পুরো বাংলাদেশের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। কারণ শাহবাগ এবং বাংলাদেশের রাজনীতি গত ৪০ বছরে যেভাবে চলছিল রাজিব হত্যার ঘটনা সম্পূর্ণভাবে এর মোড় ঘুরিয়ে অন্য পথে নিয়ে যায়। যে সময়ে রাজীবকে হত্যা করা হয় তা জাগরণ মঞ্চ এবং শাহবাগকে এতদিন যে পথে হাঁটছিল তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নপথে নিয়ে যায়।
এই ঘটনাগুলোকে সিরিয়ালি দেখতে হবে।
রাজীব হত্যার প্রেক্ষাপটে ১৬ তারিখে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। রাজীব হত্যার পর আমার দেশের নিউজটা ছিল খুব সাধারণ। আর দশটা হত্যার ঘটনা যেভাবে নিউজ হয়, রাজীব হত্যা নিয়ে সে ধরনের নিউজ হয়। এবং শাহবাগের পরিচয় থাকার কারণে রাজীব হত্যা একটু বেশি হাইলাইট হয়। এই যা।
এই ছিল আমার দেশের নিউজ
শাহবাগ আন্দোলনের ব্লগার রাজীব নৃশংসভাবে খুন
সেই দিন আরও নিউজ ছিল।
শাহবাগের সমাবেশে সেই বাপ্পাদিত্য ও ছাত্রলীগের হুমকি: মাহমুদুর রহমানকে খতম ও পিয়াস করীম, আসিফ নজরুলের চামড়া তুলে নেয়া হবে
প্রথম আলো
শোক, ক্ষোভ ও প্রতিবাদে শাহবাগ উত্তাল (ভিডিও)

http://archive.prothom-alo.com/detail/date/2013-02-16/news/329668

প্রথম আলো রাজীবকে নিয়ে যে নিউজটি করে

রাজীবের জানাজা

পিনপতন নীরবতা। এরই মধ্যে জাতীয় পতাকায় মোড়ানো কফিনে করে শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরে আসেন রাজীব। লাখো জনতার অংশগ্রহণে সন্ধ্যা পাঁচটা ৫৪ মিনিটে সেখানে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। শাহবাগের জনস্রোত রূপসী বাংলা হোটেল, কাঁটাবন মোড়, টিএসসি চত্বর ও রমনা উদ্যান ছাড়িয়ে যায়।

এর আগে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গ থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে রাজীবের মরদেহ শাহবাগে আনা হয়।

আজ গণজাগরণ মঞ্চ থেকে জানানো হয়, জামায়াত-শিবিরের কর্মীরা রাজীবকে খুন করেছে। তাঁকে খুন করে এই আন্দোলন স্তব্ধ করা যাবে না। বাংলার ঘরে ঘরে লাখো রাজীব রয়েছে। রাজীব হত্যার শোককে শক্তিতে পরিণত করে এই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে। আজ কালো ব্যাজ ধারণ করা হয়েছে।

রাজীবের নামে শ্লোগান

রাজীবকে গতকাল কুপিয়ে হত্যার পর থেকে শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরের শ্লোগানে উঠে এসেছে রাজীবের নাম। আন্দোলনকারীরা শ্লোগান দিচ্ছেন, ‘রাজীবের রক্ত, বৃথা যেতে দেব না’, ‘এক রাজীব লোকান্তরে, লক্ষ রাজীব ঘরে ঘরে’, ‘মাগো তোমায় কথা দিলাম, রাজীব হত্যার বদলা নেব’ বলে।

রাজীব হত্যার পর জাগরণ মঞ্চ থেকে অভিযোগ করা হয় যে, শাহবাগের বিরুদ্ধে জামায়াত-শিবির বিভিন্ন পরিকল্পনা করছে জামায়াত-শিবিরের ব্লগগুলো থেকে। এবং এই ব্লগ সাইটগুলো থেকে হত্যার হুমকি দেয়া হচ্ছে। এর প্রেক্ষাপটে সরকার বেশ কিছু ইসলামিক ব্লগ যার মধ্যে জামায়াত শিবিরের একটা ভালো প্রভাব ছিল—বন্ধ করে দেয়।

প্রথম আলোর নিউজ

সোনার বাংলা ব্লগ বন্ধ

http://archive.prothom-alo.com/detail/date/2013-02-16/news/329701

মানবতাবিরোধী অপরাধীর ফাঁসির দাবিতে শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরের আন্দোলনকারীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সোনার বাংলা ব্লগ বন্ধ করে দিয়েছে

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)।

আজ শনিবার দুপুর ১২টার দিকে শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরের মূল মঞ্চ থেকে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। এ সময় জনতা করতালি দিয়ে সরকারের এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়।

শাহবাগে রাজীবের জানাজায় গেলেন জয়

http://archive.prothom-alo.com/detail/date/2013-02-16/news/329705

রাজীবর মৃত্যুর পর রাজীবর জানাজা শাহবাগে হবে কি না সেটা নিয়ে একটা ক্যাচাল হয়। রাজীব একজন স্বঘোষিত নাস্তিক। ফলে একজন স্বেচ্ছা ধর্মত্যাগীর জানাজা করা যাবে কি না, এই নিয়ে আমি ফেসবুকে বেশকিছু ক্যাচাল দেখি।

ফাইনালি রাজীবকে শাহবাগে জানাজায় নেয়া নিয়ে ফারাবী নামের একজন ব্লগার ঘোষণা দেয় যে, যে ইমাম রাজীবর জানাজা পড়াবে তাকে হত্যা করা হবে। এই স্ট্যাটাসের কারণে ফারাবীকে পরে গ্রেফতার করা হয়। এই ফারাবীর নামটা খেয়াল করেন, ফারাবী ইস্যুটা আমি একটু বড় করে অ্যানালিসিস করব কারণ এইখানে থেকে কিছু ডিডাকশন আছে।

রাজীব হত্যার পর ২১ জন ব্লগারের একটা লিস্ট বিভিন্ন মিডিয়াতে আসে যাদের সরকার নিরাপত্তা দেবে বলে ঘোষণা করে। এটা নিয়ে বিভিন্ন ব্লগারদের ফেসবুকে আমি হাসাহাসি করতে দেখি, কারণ এদের মধ্যে বেশির ভাগকেই কেউ চিনে না এবং তাদের ব্লগার হিসেবে কোনো পরিচিতি নাই। অনেকেই মন্তব্য করেন, এই ধরনের লিস্ট থেকে সাধারণ মানুষের মনে এই ফিডব্যাক যাচ্ছে যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এই আন্দোলন হচ্ছে। এবং এই লিস্টটা কে করেছে তা নিয়েও কিছু সন্দেহ উদ্রেক হয়।

এইখানে আর একটা বিষয় হলো, শাহবাগের প্রথম নিহত রাজীব নয়। শাহবাগ চলাকালীন সময়ে একজন লিফটম্যান নিহত হয়েছিলেন জামায়াতের হামলায়। এই লিফটম্যান কিছু শাহবাগের পোস্টার ছিঁড়তে বাঁধা দিলে শিবিরের কর্মীদের হামলার শিকার হন। এবং পরে উনি মারা যান। কিন্তু শাহবাগ থেকে এই লিফটমানকে শাহবাগের প্রথম শহীদের মর্যাদা দেয়া হয় নাই।

১৭ ফেব্রুয়ারি

আমার দেশ

জামায়াতের এদেশে আর রাজনীতি করার অধিকার নেই—প্রধানমন্ত্রী: ব্লগার

রাজীবের পরিবারকে সান্তবনা

প্রধানমন্ত্রীর রাজীবের বাসায় যাওয়াটা মূলত শাহবাগের উপর আওয়ামী লীগের কন্ট্রোল সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠা করার একটা স্টেপ মাত্র। আওয়ামী লীগ তখনও বুঝতে পারছে না তারা কি ট্র্যাপ এ পা দিচ্ছে।

আমার দেশের প্রতিবেদন

শাহবাগ আন্দোলন নিয়ে সম্পাদক মাহমুদুর রহমান—এর মন্তব্য প্রতিবেদন ট্রাম্প কার্ড

http://www.amardeshonline.com/pages/details/2013/02/17/188399

এই পুরো লেখাটার সারমর্ম পাবেন এই লাইনে 'শাহবাগ জমায়েতের প্রথম থেকেই আমি এটিকে সরকারের রিমোট কন্ট্রোলে পরিচালিত একটি ফ্যাসিবাদী আন্দোলন হিসেবেই দেখছি।'

এটা বলে রাখি, শাহবাগের অন্যতম একটা দাবি ছিল ট্রাইবুন্যালের একটা আইনের সংস্কার করা। এই আইনমতে ট্রাইবুন্যাল যে রায় দেবে সেই রায়ের বিরুদ্ধে সরকার আপিল করতে পারবে না। কিন্তু বিবাদী আপিল করতে পারবে।

ফলে শাহবাগসহ অন্য অনেক জায়গা থেকে এই দাবি উঠে যে, এটা একটা অন্যায় নিয়ম। কারণ সরকার আপিল করতে পারবে না কিন্তু বিবাদী পারবে, যার ফলে বিবাদী একটা অসম সুবিধা পাচ্ছে। এবং এর ফলে, কাদের মোল্লার রায়ে সরকারের আপিল এর সুযোগ ছিল না। কিন্তু শাহবাগের দাবিতে এই অংশটুকু সংশোধন করে সংসদ।

একটা বিচারের রায় হয়ে যাওয়ার পরে, সেটা নিয়ে আইন নতুন করে সংশোধন করা যায় কি না, তা নিয়ে পরবর্তীতে সমালোচনা হয়।

প্রথম আলোর রিপোর্ট

ট্রাইব্যুনাল আইনের সংশোধনী সংসদে পাস (ভিডিও)

আপিলের সমান সুযোগ, বিচার করা যাবে জামায়াতেরও

আজ রোববার জাতীয় সংসদে এ-সংক্রান্ত বহুল আলোচিত আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস) (সংশোধন) বিল-২০১৩ সংশোধিত আকারে সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়।

আইনটি পাস হওয়ায় ব্যক্তির পাশাপাশি সংগঠনেরও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার করার পথ উন্মুক্ত হলো। এ ছাড়া আইনে সরকার ও বাদী পক্ষের আপিল

করার সমান সুযোগের ব্যবস্থা রাখা হয়। একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের ৬০ দিনের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তির কথা বলা হয় আইনে। আইনটি ২০০৯ সালের ১৪ জুলাই থেকে কার্যকর হবে।

আগে সরকারপক্ষের শুধু খালাসের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ ছিল। আইনে শাস্তি কমানোর জন্য বাদীপক্ষের আপিলের সুযোগ থাকলেও শাস্তি বাড়ানোর জন্য আপিল করার কোনো সুযোগ সরকারপক্ষের ছিল না। এখন যে কোনো রায়ের বিরুদ্ধে সরকার আপিল করতে পারবে।

বিল পাস আন্দোলনের একটি বড় বিজয় (ভিডিও) প্রথম আলো

http://archive.prothom-alo.com/detail/date/2013-02-17/news/329915

ইত্তেফাক রিপোর্ট: ৫টি ব্লগ ও সহস্রাধিক ফেসবুক আইডি বন্ধ

http://www.ittefaq.com.bd/index.php?ref=MjBfMDJfMTdfMTNfMF8wXzNfMTk4MDA%3D

এই দিনে সরকার ৫ টি কমিউনিটি ব্লগ বন্ধ করে দেয়। শাহবাগ থেকে এই দাবি ওঠার কারণ, সোনার বাংলা ব্লগের কিছু পোস্টে ইতিপূর্বে একটা হিটলিস্ট করার কথা হয়েছিল। যা ব্লগিং কমিউনিটিতে জানা ছিল। ফলে শাহবাগ থেকে রাজীব হত্যার জন্যে সম্ভাব্য খুনি হিসেবে সোনার বাংলা ব্লগের এই ব্লগারদের দায়ী করা হয়। তাই, এই সময়ে জনতার দাবির মুখে সোনার বাংলা ব্লগ বন্ধ করে দেয়াটা ছিল সরকারের ইতিপূর্বের আচরণের ধারাবাহিকতায় একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

কিন্তু, এইটাও দেখতে হবে যে, কমিউনিটি ব্লগে কি লেখা হবে সেইটার উপরে এডমিনের নিয়ন্ত্রন থাকে না। কিন্তু এডমিনের এবং কমিউনিটির দায় থাকে সেইটা সেন্সর করার। সোনার বাংলা ব্লগে সেইটা করা হয়নি। এইটার দায়িত্ব সোনার বাংলা ব্লগের উপরে বর্তায়। কিন্তু, এর ফলে পুরো কমিউনিটি ব্লগকে বন্ধ করে দেয়াটা আমার কাছে অনুচিত মনে হয়েছে। তাছাড়া শুধু সোনার বাংলা নয়, আরও ৪ টি ব্লগ বন্ধ করা হয়েছে যাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের কোনো অভিযোগ ছিল না। এটার প্রেক্ষাপটে আমি একটা ব্লগ লিখি ১৭ তারিখে যা সামুতে প্রকাশ করি। এটা পড়েন।

নোট ৭: সাধু সাবধান—আজকে সোনা ব্লগ, কাল আসবে সামুর উপর

(প্রকাশ: ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩)

স্ট্যাটাস পড়লাম। বেশ কিছু পেইজ খুললে দেখা যাচ্ছে,

This content has been blocked by request of government authority। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। গতদিন, সোনা ব্লগ বন্ধ করে দেয়াতে সবার সাথে আমি হাততালি দেই নাই।

মুক্ত বুদ্ধির চর্চায়, এমন কি অপশক্তিকেও তার মতামত প্রকাশের জায়গা দিতে হয়। পরমতের প্রতি অতটুকু সহনশীলতা চর্চা করতে না পারলে, রাজীবর হত্যাকারীর সাথে আপনার পার্থক্য থাকে মাত্র আড়াই ইঞ্চি। ওরা মারে ছুরি দিয়া, আপনি মারেন সেন্সরশিপ দিয়া।

সোনা ব্লগ, জামায়াত শিবিরের আড্ডাখানা। সোনা ব্লগে গেলে জামায়াত শিবির কী ভাবছে বোঝা যেত। তারপরেও বলা যায়, সোনা ব্লগ অ্যাবসলিউটলি জামায়াত-শিবির এর ব্লগ ছিল না। সেখানে জামায়াত শিবিরের পক্ষে-বিপক্ষে, তাবলীগ হতে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের ইসলামি ভাবধারার মানুষ ছিল। এবং জামায়াত-শিবির বাদেও অনেক ইসলামি ভাবধারার মানুষ বিভিন্ন ইসলামিক ইস্যু নিয়ে ব্লগিং করত।

কমিউনিটি ব্লগিং চর্চায় সারা বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশ ইউনিক। কমিউনিটি ব্লগিং-এ যে কেউ রেজিস্টার করে তার মতামত দিতে পারে এবং পরে সেটা মডারেশান পলিসি অনুসারে বা কমিউনিটি নিজেই তার নিজস্ব মতামত অনুসারে ফিল্টার করে নেয়। যে ব্লগ থেকে হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছিল— ব্লগের অ্যাডমিনদেরকে ধরে ওই পার্টিকুলার ব্লগার এবং প্রয়োজনে কমেনটারদেরকে ধরে আইনের আয়তায় এনে খুনের দায়ে গ্রেফতার করা যেত।

কিন্তু পুরো সোনা ব্লগকে ব্লক করে দিয়া আমরা সরকারকে একটা সিগনাল দিলাম যে, একটি কমিউনিটি ব্লগকে ব্লক করা যায়। আজকে সোনা ব্লগ, কাল আসবে সামুর উপর... এবং সামুকে ব্যান করার একটা প্রোপাগান্ডা গত এক মাস ধরে, বাংলানিউজে দেখতাছি। এরপর আসবে ফেসবুকের উপর। ইউটিউব আজ এক বছর ধরে বন্ধ, আমরা যারা মিউজিক করি ইউটিউব বন্ধ থাকার কারণে, আমরা যে কি পরিমাণ সাফার করতেছি এটা কাউরে বুঝাইতে পারব না। শুধু মিউজিশিয়ান না, পুরো পৃথিবীর বিজ্ঞান এবং জ্ঞান শেয়ারিং সেন্টার এখন ইউটিউব। সেটা বন্ধের একটা এক্সকিউজ ছিল। এখন নতুন এক্সকিউজে

বাকিগুলো বন্ধ হবে।

সেন্সরশিপের যে খড়গ আপনার কাছে আজ কনভেনিয়েন্ট মনে হচ্ছে, কাল সে খড়গ আপনার কীবোর্ডে নেমে আসবে।

আমাদের সাপোর্ট আমাদের চেতনা আমাদের ফিলিংস আমাদের জাগরণ যাতে পলিটিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্টের গুটির চালে পরিণত না হয়।

প্লীজ প্লীজ প্লীজ প্লীজ প্লীজ...একটু ফোরসাইটেডনেস দেখান।

PEACE REASON AND JUSTICE.

ফেসবুক আইডি বন্ধ করা নিয়ে যে সংবাদ সেইটা মনে হয় গুজব ছিল। কারণ, আমি স্টাডি করে জেনেছি, বাংলাদেশ সরকার চাইলে ফেসবুকের কোনো পেজ বন্ধ করতে পারে না। এই টেকনোলোজি বাংলাদেশ সরকারের নাই। এই টেকনোলোজি পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেই নাই। যদিও সরকার এই যন্ত্রপাতি কেনার জন্যে টেন্ডার কল করেছে ২০১৩ সালেই।

চ্যাপ্টার ১৪. মাহমুদুর রহমানের কাউন্টার রেভলিউশান

৬. মাহমুদুর রহমানের কাউন্টার রেভলিউশান স্টেজ প্রপাগান্ডা স্টেজ

খুব সম্ভব ইনকিলাবে আমি প্রথম লেখাটা দেখি। ওরা টের পেয়েছে যে, রাজীবের হত্যার মধ্যে শাহবাগকে ডিলিজিটিমাইজ করার বিশাল একটা সুযোগ তৈরী হয়েছে। কারণ রাজীবের লেখাগুলোতে মহানবী (সা.) কে নিয়ে সীমাহীন কুরুচিপূর্ণ অনেক লেখা ছিল, এইগুলো এমন লেভেলের কুরুচিপূর্ণ যে তার কোনো সীমা পরিসীমা নাই। এবং তারা রাজীবর এই লেখাগুলো নিয়ে একটা নিউজ করে খুব সম্ভব ১৭ তারিখ—আমার দেশের নিউজ করার আগে। ইনকিলাবের অনলাইন আর্কাইভ না থাকাতে এইটা আমি খুঁজে পাই নাই।

রাজীবর এই লেখাগুলো যে রাজীবর না এই বিষয়ে জাগরণ মঞ্চের অনেকে অনেক স্ট্যাটাস এবং বিডিনিউজ নিউজ দিয়েছে। কিন্তু ব্লগস্পেসের সাথে যারা জড়িত তারা অনেক আগে থেকেই রাজীবর এই লেখাগুলোর সাথে পরিচিত ছিল।

রাজীবকে যারা মেরেছে, তারা এমন একটা সময়ে রাজীবকে হত্যা করেছে যে, সেটা একটা পরিষ্কার ট্র্যাপ। আমরা দেখেছি সেই ট্র্যাপে শাহবাগ নিজেই

কিভাবে জেনে বুঝে লাফ দিয়ে ঢুকে গেছে। টেকনিকালি পাশ কাটিয়ে যায়নি এবং এর মাধ্যমে শাহবাগ নিজের স্বপ্ন এবং সম্ভাবনাকে ধ্বংস করেছে। রাজীবর লেখার সাথে যারা পরিচিত তাদের এইটা খুব পরিষ্কার বোঝার কথা। এবং তাদের এইটা বোঝার ব্যর্থতা থেকেও বোঝা যায়, শাহবাগ যে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্যে কত বড় একটা ঘটনা এইটা খুব সম্ভব তারা উপলব্ধি করতে পারেন নাই।

যা হোক, আমি পরে এই ব্যাপারে ডিটেলস আলোচনা করব। ইনকিলাবের লেখাটা দেখার পর আমি ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেই ১৭ তারিখে যা এখনও আমার ফেসবুক পেজে আছে।

'রায়ট অ্যাহেড'

আমার এক বন্ধু আমাকে কমেন্ট করে, কেন, রায়ট কেন? আমি উত্তরে লিখেছিলাম, আগামী শুক্রবার বিকেল ছয়টায় বলবো।

আমি খুব ক্লিয়ার ছিলাম, রাজীবকে যেইভাবে ব্র্যান্ডিং করা হচ্ছে তার ভিত্তিতে শাহবাগকে ডিলিজিটিমাইজ করে একটা যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হবে। এইটা যেহেতু ইলেকশান ইয়ার এবং শাহবাগ যেহেতু রাজনীতিতে ঢুকে গেছে, শাহবাগের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে যারা দাঁড়াচ্ছে তারা রাজীবর এই লেখাগুলো নিয়ে, তুলকালাম ঘটিয়ে ফেলবে।

১৮ ফেব্রুয়ারি

আমার দেশ ১৮ তারিখে প্রথম এই ইস্যু নিয়ে নিউজ করে

আমার দেশ

ভয়ঙ্কর ইসলামবিদ্বেষী ব্লগারচক্র

যেটায় বড় করে হেডলাইন দেয়া হয়, মহানবী (সঃ) আক্রমণের প্রধান টার্গেট। ব্লগে অকল্পনীয় অশ্লীলতা। নিহত রাজীব ওরফে থাবা বাবা নায়ক না খল নায়ক।

প্রথম আলো বা আওয়ামী লীগ বা অন্য পেপারগুলো এখনো ক্যাচাল টের পায় নাই। প্রথম আলো নিউজ করে।

রাজীব হত্যাকাণ্ডে সংসদে শোক ও নিন্দা

এর পরবর্তী দিনগুলোতে আমার দেশ প্রতিবেদন দেয় অনেকগুলো, পুরো শাহবাগকেই তারা ব্লগার ও ইসলামবিদ্বেষী বলে চিহ্নিত করে টানা প্রপাগান্ডা চালায়। সেই প্রপাগান্ডায় আমার দেশ লিডে থাকে। ফেসবুকের জামায়াতপন্থী হিসেবে পরিচিত বাঁশেরকেল্লা গ্রুপ থেকে আমার দেশের প্রতিবেদনগুলোকে

ব্যাক করে একে একে স্ট্যাটাস ছবি এটা-সেটা দিতে থাকে।

কিন্তু আমার দেশের কল্যাণে দাবানলের মতো ছড়িয়ে যেতে থাকে রাজীবর অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর রাসুল (সঃ) বিদ্বেষী লেখাগুলো। মাহমুদুর রহমানের উদ্দেশ্য অতি পরিষ্কার। রাসুল বিদ্বেষী লেখাগুলো কে উপজীব্য করে সারা দেশের মুসলমানদেরকে খুচিয়ে তোলা। এবং শাহবাগকে কাউন্টার করে একটা ইসলামিক জাগরণ সৃষ্টি করা। এবং তার হাতে তখন থাবা বাবার ব্লগ যেসবের অজস্র লাইনের মধ্যে যে কোনো একটা লাইন দিয়ে বাংলাদেশে রায়ট লাগিয়ে দেয়া সম্ভব।

এবং থাবা বাবার ব্লগগুলো অনলাইনে তখন ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়ছে। থাবা বাবার অনেকগুলো ব্লগ ছিল। এর মধ্যে বেশ কিছু বন্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু থাবা বাবার ওয়ার্ডপ্রেস ব্লগটির পাসওয়ার্ড জানা না থাকার কারণে বোধ হয় সেইটি বন্ধ করা যায়নি। ফলে সেটি কয়েকদিনের ব্যবধানে হয়েক লক্ষ হিট পায়। যা এক বছরে শুন্য হিট ছিল। এইটাও পরবর্তীতে কমিউনিটি রিপোর্টের কারণে ব্লক হয়ে যায়। কিন্তু, এর মধ্যে অনেকেই স্ক্রিনশট নিয়ে লেখাগুলো শেয়ার দিতে থাকে।

পরের দিনগুলোতে আমরা সেই ধারাবাহিকতায় অনেকগুলো প্রতিবেদন দেখি। এবং শাহবাগকে কাউন্টার করে মাহমুদুর রহমানের কাউন্টার রেভোল্যুশান জেগে উঠতে থাকে। এই সময়ে মাহমুদুর রহমান লিফট দেন হেফাজতে ইসলামকে।

বাংলাদেশে অনেকগুলো ইসলামিক দল আছে। তাদের মধ্যে একটা গ্রুপ হিসেবে আমি হেফাজতে ইসলামের নাম শুনেছি। হেফাজত যে অত্যন্ত শক্তিশালী কোনো এনটিটি সেটা আমার কখনোই জানা ছিল না। এবং আমি তো শুনেছি, কিন্তু আমার ধারণা বাংলাদেশের শহুরে মধ্যবিত্তের বেশির ভাগ মানুষ এর আগে হেফাজতের সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা ছিল না।।

কিন্তু মাহমুদুর রহমানের কাউন্টার রেভোল্যুশানের জন্যে হেফাজত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অথবা তার কাউন্টার রেভলিউশনের প্রয়োজনেই উনি হেফাজতকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলেন।

১৯ ফেব্রুয়ারি

আমার দেশ

ব্লগারদের ইসলামবিদ্বেষী প্রচারণায় আলেমদের ক্ষোভ: নাস্তিকদের প্রতিরোধে সর্বাত্মক আন্দোলনের ঘোষণা

সরকার ও দেশবাসীর প্রতি শায়খুল ইসলাম আল্লামা আহমদ শফীর খোলা চিঠি

সরকার ও দেশবাসীর প্রতি শায়খুল ইসলাম আল্লামা আহমদ শফীর

খোলা চিঠি

শাহবাগে ইসলাম বিদ্বেষের প্রতিবাদে গর্জে উঠুন

প্রিয় দেশবাসী ! আস্সালামু আলাইকুম

আপনারা জানেন, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ একটি সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও আত্মসংশোধনমূলক সংগঠন। মূলত এটি সর্বজনীন অরাজনৈতিক একটি প্লাটফরম। মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, ইসলামের বিধান ও প্রতীকসমূহের হেফাজত সম্পর্কে মুসলমানদের সচেতন করে তোলা এবং ধর্মীয় ইস্যুতে সামাজিক আন্দোলন অব্যাহত রাখা হেফাজত ইসলামের প্রধান লক্ষ্য।

বাংলাদেশের প্রাচীন ও সর্ববৃহৎ ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দারুল উলূম হাটহাজারী মাদরাসার পরিচালক, বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড (বেফাকুল মাদারিস) এর চেয়ারম্যান, দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় শীর্ষ আলিম পীরে কামেল শায়খুল ইসলাম আল্লামা আহমদ শফী হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের বর্তমান আমীর। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত হেফাজতে ইসলাম মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদা ও তাহযীব-তামাদ্দুন সংরক্ষণে সর্বাত্মক ও নিরাপদ ভূমিকা পালন করে আসছে। এই সংগঠন কখনো কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি বা কারো সঙ্গে রাজনৈতিক বিরোধে জড়ায়নি; আগামীতে এর রাজনৈতিক কোনো এজেন্ডা নেই।

শাহবাগ চত্বরে টানা বার দিন পর্যন্ত চলমান গণ-অবস্থান কর্মসূচিতে এবং সেখানকার জাগরণ মঞ্চের নানা রকম ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড গভীর পর্যবেক্ষণের পর হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে; সর্বস্তরের মুসলমানদেরকে সে সম্পর্কে অবগত ও সচেতন করার লক্ষ্যে এই খোলা চিঠি।

শাহবাগে যেসব ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে

০১. অগ্নিপূজক ও পৌত্তলিকদের অনুকরণে মুসলমানদের সন্তান-সন্ততিদের দ্বারা মোমবাতি প্রজ্বলন

০২. নামাজের সময়সহ দিন-রাত অনবরত মাইকে গান-বাজনা।

০৩. কথিত জাগরণ মঞ্চের মূল উদ্যোক্তা আসিফ মহিউদ্দীনসহ স্বঘোষিত নাস্তিকদের ব্লগে আল্লাহ ও রাসূল (সা.) তথা ইসলাম সম্পর্কে চরম অবমাননাকার ব্লগ লেখা ও জঘন্য মন্তব্য।

০৪. নারী-পুরুষের উদ্দাম নৃত্য, অবাধ যৌনাচার, অশ্লীলতা, মদ, গাজা সেবন ইত্যাদি অসামাজিক ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড ।

০৫. পবিত্র মক্কা-মদিনার ইমাম ও খতিবদের বিশেষ পোশাক কো'বা পরিয়ে ফাঁসির অভিনয়।

০৬. শাহবাগ চত্বরের মঞ্চ থেকে বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক ও দেশের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে হত্যার হুমকি ও অশালীন ভাষায় গালিগালাজ।

০৭. দাড়ি-টুপি পরিহিত ব্যক্তির গলায় রশি বেঁধে রাসূলের সুন্নাত ও ইসলামের প্রতীকসমূহের অবমাননা।

০৮. কোমলমতি, কচি-কাঁচা শিশুদের '....ধরে ধরে জবাই কর' ইত্যাদি অপরাধ প্রবণতামূলক স্লোগান শিক্ষা দেয়া ।

০৯. বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশের আবহমান ইসলামি সংস্কৃতির বিপরীতে ভারতীয় অপসংস্কৃতির নেতিবাচক প্রদর্শনী।

১০. সব ধরনের ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধের উস্কানি দিয়ে দেশকে অনিবার্য সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়া

১১. গভীর রাত পর্যন্ত শাহবাগে অবস্থানকারী তরুণ-তরুণীদের অবাধ মাখামাখি ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ উঠেছে ফেইসবুক, ব্লগসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোয়।

১২. সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য হুমকি দেয়া সত্ত্বেও শাহবাগ চত্বর নিয়ে এক শ্রেণীর গণমাধ্যমে দৃষ্টিকটু ও সীমা ছাড়ানো মাতামাতি।

১৩. রাজধানীর বারডেম ও বঙ্গবন্ধু হাসপাতালের রোগীদের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ ও রাস্তা বন্ধ করা অমানবিক পদক্ষেপ।

১৪. স্বঘোষিত নাস্তিক ব্লগারদের ইসলাম অবমাননার প্রমাণ/প্রতিবেদন তুলে ধরে দেয়া পোস্ট/লেখা প্রকাশ করার কারণে সম্প্রতি নিরপেক্ষ অনেক ইসলামী ব্লগ সরকার কর্তৃক বন্ধ করে দেয়া।

কাদিয়ানী সম্পৃক্ততা
যুদ্ধাপরাধের বিচার মূলত রাজনৈতিক ইস্যু হওয়ায় আমরা সে সম্পর্কে কোনো বক্তব্য বা বিবৃতি দিই নাই। কিন্তু অনুসন্ধানে আমরা যুদ্ধাপরাধের বিচারের নেপথ্যে কাদিয়ানীদের সম্পৃক্ততা খুঁজে পেয়েছি। একই মঞ্চে ঘাদানিক-নেতা, নাস্তিক ও ইসলামবিদ্বেষী শাহরিয়ার কবীর এবং আহমদিয়া মুসলিম জামাতের (কাদিয়ানী) নায়েবে আমীর আবদুল আওয়াল খান পাশাপাশি বসে অনুষ্ঠান করেছে। বর্তমান যুদ্ধাপরাধের বিচারের পেছনে কাদিয়ানীরাও পরোক্ষভাবে বামপন্থী ও সরকারি সমর্থনে সক্রিয় রয়েছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায়, আন্দোলন চলাকালীন সময়ে শাহবাগ চত্বর থেকে ১১ জন কাদিয়ানী যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। বামপন্থী শাহরিয়ার কবীরের মতো মুশরিক ও মুরতাদরা একদিকে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধের অপচেষ্টা চালাচ্ছে, আর অন্যদিকে কাদিয়ানীদের মতো মুরতাদ সংগঠনকে সাথে নিয়ে ইসলাম বিরোধী এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে। তাদের এ অবস্থান সম্পূর্ণ স্ববিরোধী।

অন্তরালে ইসলাম অবমাননাকারী 'অনলাইন চক্র'
মুক্তমনা একটি চরম ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিকদের ওয়েবসাইট। এ ওয়েবসাইটে ইসলাম ও মহানবী (স.) সম্পর্কে কটূক্তি ও নানা ধরনের অবমাননাকর পোস্ট দেওয়া হয়। শাহবাগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এ ওয়েবসাইটটি এখন আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। মুক্তমনার বিভিন্ন পেইজে 'বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে-মুক্তমনা', 'আগামী নির্বাচনে ধর্মভিত্তিক দলের অংশগ্রহণ বাতিল কর-মুক্তমনা' এ ধরনের ইসলাম বিরোধী নানা স্লোগান বড় করে লেখা রয়েছে। আর মুক্তমনাকে যাবতীয় সাহায্য ও উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। এই পতিত সংগঠনটি মুক্তমনা ওয়েবসাইটকে ইসলামবিরোধী কার্যকলাপের কারণে 'জাহানারা ইমাম স্মৃতিপদক-২০০৭' পুরস্কার প্রদান করেছিল। মুক্তমনার ই-বুকে *অবিশ্বাসের দর্শন*, *বিবর্তনের পথ ধরে*, *সমকামিতা*, *যে সত্য বলা হয়নি*, *ইসলাম ও শরিয়া* প্রভৃতি বই পাওয়া যায় যেগুলো ইসলাম, কোরআন ও মহানবী (স.)-এর চরিত্র সম্পর্কে চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ ও অশ্লীল কটূক্তিতে ভরা। সেই মুক্তমনার সাথে সংশ্লিষ্ট মুরতাদ নাস্তিকরাই বর্তমান শাহবাগ নাটকের মূল কেন্দ্রে রয়েছে।

শাহবাগের পেছনে যেসব ব্লগার ও অ্যাক্টিভিস্ট রয়েছে তাদের মধ্যে রাজীব আহমেদ একজন। ব্লগে 'থাবা বাবা' ছদ্মনামে থাকা তার পোস্টগুলোতে সে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে 'মোহাম্মক' বলে ব্যঙ্গ করেছে। মোহাম্মকের সফেদ লুঙ্গী, ঢিলা ও কুলুখ, সিজদা, মদ ও মোহাম্মকসহ অসংখ্য এমন সব অশ্লীল পোস্ট পাওয়া যায় যেগুলো মহানবী (স.)-এর বিরুদ্ধে মার্কিন ও ইউরোপীয় ব্যঙ্গচিত্রকেও হার মানায়।
ব্লগার আরিফুর রহমান ইংল্যান্ডে থাকেন, বর্তমানে লিখছেন ওস্তাদ ও বিভিন্ন 'নিক' নামে (সামহোয়্যার ইন ব্লগ)। ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম স্ট্র্যাটেজি ফোরামের নেতা। আরেকজন নাস্তিক ব্লগার নিঝুম মজুমদারের সাথে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগ দেন। শাহবাগ আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা আসিফ মহীউদ্দিন এখন বাংলাদেশের উদীয়মান নাস্তিক হুমায়ুন আজাদ।
শাহবাগ নাটকের অন্তরালে তৎপর তথাকথিত অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টদের মধ্যে অন্যতম হলো চরম ইসলাম বিদ্বেষী প্রসিদ্ধ ব্লগ সামহোয়্যার ইন-এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্লগাররা। তাদের ইসলাম বিদ্বেষী পোস্টগুলোর কয়েকটি স্ক্রিনশট নিয়ে তুলে ধরা হলো।

নাস্তিক ব্লগারদের ইসলাম অবমাননাকর লেখা/মন্তব্য/ব্লগপোস্ট-এর কয়েকটি নমুনা



কুরআনকে বাজেয়াপ্ত করা হোক!........

২৭ শে জুলাই, ২০১০ বিকাল ৪:১৫
মেজো ছেলে বলেছেন: হিজাব নিয়া লিখলে কিভাবে ইসলাম ধর্মের মান নিয়া টানাটানি পড়ে সেটাই বুঝলাম না। বাংলাদেশে হিজাবের সর্বোত্তম ব্যবহারকারী হইলো হোটেলের পতিতারা, এইটা সবাই জানে।



Ashraful Islam Ratul সাহস থাকলে একবার শাহবাগ আয় রাজাকারের চুদারা তোদের মুহাম্মদ(স.)আর নিজামি বাপকে এক্কে অনোর পোদের ভেতর ঢুকাবো।



-থাবাবাবা- বলেছেন: এই শিশু মোহাম্মদকে একটা সময়ে ঘৃণা করবে, তার নাম শুনলে থুতু ছিটাবে, ঠিক এখন আমরা হিটলারকে দেখলে যা করি। কুরআন হাদিস মানব সভ্যতার জন্য বড় রকমের একটা হুমকি, এগুলোর আবিষ্কারক মোহাম্মদ প্রতারণা আর মানুষের মাঝে অশান্তি সৃষ্টি করার জন্যে ইতিহাসের নিকৃষ্ট মানুষ রূপে আখ্যা পাবেন একটা সময়।





শাহবাগ চত্বরে নাস্তিক-পৃষ্ঠপোষকতা

শাহবাগের তথাকথিত জাগরণ মঞ্চে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছেন ইসলাম ও দেশবিরোধী অসংখ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা শাহরিয়ার কবীর, বিশিষ্ট বাম বুদ্ধিজীবী মুনতাসীর মামুন, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মূর্তি স্থাপনের নেপথ্য নায়ক জাফর ইকবাল, ফতোয়া নিষিদ্ধের রায় প্রদানকারী সাবেক বিচারপতি গোলাম রব্বানী, হিন্দু নাস্তিক অজয় রায়, বাম ঘরানার চিহ্নিত কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ, ইসলামবিরোধী নারীনীতি প্রণয়ন ও সংবিধান থেকে 'আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' বাক্যটি বাদ দেয়ার নেপথ্যে সক্রিয় ব্যক্তিরাই শাহবাগ নাটকের পৃষ্ঠপোষক ও মূল কুশীলব।

সরকারের প্রতি আমাদের দাবী

১. সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে চলমান সব আন্দোলনের প্রতি যেভাবে ব্যাপক সহানুভূতি প্রদর্শন করছে অনুরূপভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশের জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে ইসলাম অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. আল্লাহ, রাসূল, কুরআন, দাড়ি-টুপি, পর্দা-হিজাব প্রভৃতি ইসলামী প্রতীক অবমাননার মাধ্যমে বিরাজিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির অপচেষ্টাকারীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

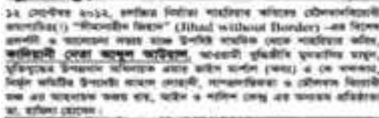
৩. প্রকাশ্য রাজপথে দাড়ি-টুপিধারী পথচারীকে অপমান করার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারপূর্বক অবিলম্বে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪. বাংলাদেশের যেকোনো জায়গায় তাওহীদি জনতার গণজমায়েত, সভা-সমাবেশ, মিছিল-মিটিং ও গণঅবস্থানের গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে হবে। কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির যেকোনো কর্মসূচিতে কোনো বাধা দেয়া যাবে না। অন্যথায় দেশের লাখো মুসলিম জনতা সকল বাধা অতিক্রম করে ঈমান-আক্বীদা ও ধর্মীয় প্রতীকসমূহের মর্যাদা রক্ষায় সর্বাত্মক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান

দেশের সর্বস্তরের মু'মিন-মুসলমান জনগণের উদ্দেশে আমরা বলতে চাই–

শাহবাগকেন্দ্রিক আন্দোলনকে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে বিচার না করে, বিশেষ কোনো দল/গোষ্ঠীর পক্ষে-বিপক্ষে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে সরলীকরণে না গিয়ে, এর অন্তর্নিহিত রূপ ও চরিত্র অনুধাবন করুন। শাহবাগ চত্বরের কথিত জাগরণ মঞ্চের বিগত দুই সপ্তাহের কার্যক্রমকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণে পরিষ্কার হয়ে গেছে– এটা মোটেও স্বাধীনতার স্বপক্ষ-বিপক্ষের লড়াই নয়। এবং দলমতের উর্ধ্বে উঠে নিজের ঈমান, আক্বীদা-বিশ্বাস ও ইসলামের প্রতীকসমূহের হেফাজতের পক্ষে সোচ্চার ও জোরালো ভূমিকা রাখুন। নাস্তিক, মুরতাদ ও ইসলামবিরোধী অপশক্তির আস্ফালনের বিরুদ্ধে সারা দেশে ঐক্যবদ্ধভাবে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তুলুন। আল্লাহ আমাদের সাহায্যকারী।







প্রচারে : হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ
দারুল উলূম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

এই সময় আমি ফেসবুকে বেশকিছু ভিডিও দেখতে পাই যেখানে বেশকিছু মাদ্রাসার শিক্ষক খুব আক্রমণাত্মক ভাষায় রাসুলের (সা.) অপমানের প্রতিশোধ নেবে বলে ঘোষণা দেয়।

শাহবাগকে ক্লিয়ারলি একটা ধর্মবিদ্বেষী ট্যাগ দেয়া হয়। এবং শাহবাগকে বাংলাদেশের ইসলামি জনতার প্রতিপক্ষ বানানো হয়। এবং যে প্রপাগান্ডা চালানো হয়, আমার অভিমত ছিল সেটা একটা ঘোরতর অন্যায়।

শুধু মাত্র বিএনপিকে রাজনৈতিকভাবে রক্ষার করার জন্যে, একজন খুন হয়ে যাওয়া ব্লগারের ঘৃণ্য লেখাগুলোকে উপজীব্য করে মাহমুদুর রহমান পুরো

শাহবাগের সকল ব্লগার এবং নন-ব্লগার মানে সকল শাহবাগীকে ধর্মবিদ্বেষী হিসেবে ট্যাগিং করে এবং বাংলাদেশের ইসলামিক জনগণকে এই ধারণা দেন যে, শাহবাগের সকল শাহবাগী রাজীবর আর একটা কপি।

এটা একটা ভয়ংকর অন্যায় ছিল। খুব সহজে এই কাজটা মাহমুদুর রহমান করেন।

শাহবাগের মধ্যে রাজীব ছিল শুধু একজন চরিত্র। শাহবাগে অসংখ্য মানুষের জমায়েত হয়েছে। এদের মধ্যে নামাজি হাজী বে-নামাজি টাউট নিষ্পাপ সুফি কুলাঙ্গার আস্তিক নাস্তিক মুক্তিযোদ্ধা রাজাকার সৎ অসৎ চোর পুলিশ—সবাই গিয়েছে। শাহবাগে যে রাজনীতি হয়েছে, তার ইন্টেন্সিটি হয়তো বেশি ছিল, কিন্তু বাংলাদেশে বিগত ৪০ বছরের ধারাবাহিকতায় খুব অস্বাভাবিক কিছু ছিল না।

শাহবাগ রাজীবকে দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ বানিয়ে বোকামি করেছে এবং এই নিয়ে আমি পরে ডিটেলস আলোচনা করব এবং এর যৌক্তিক সমালোচনা আমরা করব। কিন্তু পুরো শাহবাগকে ডিলিজিটিমাইজ করার জন্যে, বাংলাদেশ একটা ধর্মযুদ্ধ ফেনিয়ে তোলার যে প্রপাগান্ডা মাহমুদুর রহমান আর আমার দেশ করেছেন সেটার দায় বাংলাদেশকে পুরো ২০১৩ জুড়ে টানতে হয়েছে অজস্র মানুষের রক্তের বিনিময়ে এবং আরো কত বছর টানতে হবে আরও কত রক্তের বিনিময়ে তা খোদা জানে। যাই হোক আমরা আগাই।

১৯ তারিখে প্রথম আলোর প্রতিবেদন:

ধর্ম নিয়ে অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হতে গণজাগরণ মঞ্চের আহবান

রাজীববিরোধী প্রচার: বিচারপতি মিজানের অপসারণ দাবি

বিচারপতি মিজানুরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে: আইনমন্ত্রী

ক্লিয়ারলি এই সময়ে রাজীব একটা বড় ইস্যু হয়ে ওঠে।

'জামায়াতের বিচার হবে, তবে এখনই নিষিদ্ধ নয়'

http://archive.prothom-alo.com/detail/date/2013-02-19/news/330292

'নিষিদ্ধ হওয়ার শঙ্কায় তিন বিকল্প নিয়ে ভাবছে জামায়াত'

কালের কণ্ঠ

'শাহবাগের কয়েক নেতার নিরাপত্তায় নজরদারি'

শাহবাগ পর্ব ৭. শাহবাগের সিট-ইন বিক্ষোভের সমাপ্তি

২০ জানুয়ারি

'আকাশের ঠিকানায় দেশপ্রেমের চিঠি (ভিডিও)

http://archive.prothom-alo.com/detail/date/2013-02-20/news/330667

শহীদদের উদ্দেশে লেখা চিঠি ওড়ানো হবে আজ, কাল মহাসমাবেশ

আগুন ঝরছে তারুণ্যের কণ্ঠে

এই নিউজে আর একটা জিনিস আছে। বারডেমের সামনের রাস্তায় গাড়ি চলছে: বারডেম হাসপাতালের সামনে দিয়ে মৎস্য ভবনের দিকে যাওয়ার সড়ক দিয়ে গতকাল সকাল থেকে অল্পসংখ্যক গাড়ি চলাচল করেছে। তবে বিকেলের দিকে ভিড় বাড়ার পর যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

মানে শাহবাগ ধীরে ধীরে হালকা হওয়া শুরু হয়েছে।

মঞ্চের প্রোগ্রাম থেকে এই দিন শহীদদের কাছে আকাশের ঠিকানায় চিঠি পাঠানো হয়।

প্রথম আলোর এই লেখায় আবার একটা লাইন খেয়াল করবেন 'এই রায় প্রত্যাখ্যান করে ব্লগার অ্যান্ড অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট নেটওয়ার্কের সদস্যরা কাদের মোল্লাসহ একাত্তরের মানবতাবিরোধী সব অপরাধীর ফাঁসির দাবিতে ওইদিন বিকেলে শাহবাগে অবস্থান নেন। এরপর এই আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশ করেন সব শ্রেণি ও পেশার মানুষ।'

আকাশের ঠিকানায় চিঠি পাঠানোর এই প্রোগ্রামটি সাধারণ ব্লগারদের মধ্যে ব্যাপক সমালোচিত হয়। এই সময়ের মধ্যে শাহবাগ এবং জাগরণ মঞ্চ ব্লগারদের কাছেই রীতিমতো হাস্যকর হয়ে উঠেছে।

একজন ব্লগারের স্ট্যাটাস

'হে এলিট ব্লগারস, বেলুন ফুলসে? বেলুনের নিচে বাঁধার জন্য চিঠি লেখা হইসে? আপ্নেরা এই চিঠি আসমানে মুক্তিযোদ্ধাদের দিকে পোস্ট করতেছেন কেন? শহীদ মুক্তিযোদ্ধারা কি আসমানে থাকেন? যখন আপনাদের মগজ থেকে 'সাঈদীর রায় কবে হবে, বাচ্চু রাজাকারকে কবে ধরা হবে, কবে জামায়াত নিষিদ্ধ হবে, কবে রাষ্ট্রপক্ষের প্রসিকিউশন টিমের শক্তি বৃদ্ধি হবে, কেন সাঈদীর দুই ডজন সাক্ষী রাষ্ট্রীয় প্রহরা থেকে হারায়ে যায়?—প্রশ্নগুলা

হাওয়া হয়ে যায় তখন সেটা একটা ভারমুক্ত চর্বিপি-- পরিণত হয়। চিঠি না দিয়ে আপনাদের প্রশ্নহীন ভরশুন্য মগজ পাঠায়ে দেন।'

কিন্তু সেই আকাশের ঠিকানায় চিঠি নিয়ে আমার দেশের কোনো মাথা ব্যথা নাই। আমার দেশ এখন চিন্তিত তার প্রতিবিপ্লব নিয়ে।

আমার দেশ

ব্লগে নাস্তিকতার নামে কুৎসিত অসভ্যতা

এই রিপোর্টে সুপরিচিত সেকুলার ব্লগার আসিফ মহিউদ্দিনের হাতে একটা বোতল হাতে ছবি দেয়া হয়, যাতে বোঝানো হয় আসিফ মহিউদ্দিন মদ পান করছেন।

আরিফ নাম একজন ব্লগারের ছবি দেয়া হয়, যেই ছবিটা সঠিক নয় বলে বিভিন্ন লেখায় আসে। এবং এই লেখায় সামহোয়ার ইন ব্লগ থেকে শুরু করে সবগুলো ব্লগকে ধর্মবিরোধী কার্যকলাপের আখড়া হিসেবে আইডেন্টিফাই করা হয়। বেশ কিছু ব্লগার এর নাম দিয়ে বলা হয় 'এ ব্লগচক্রটি এখন শাহবাগ মাতিয়ে তুলছে।'

নবী করিম(সা.)-এর অবমাননার প্রতিবাদে মুখর আলেমসমাজ: আজ ও শুক্রবার বিভিন্ন সংগঠনের বিক্ষোভ

২১ ফেব্রুয়ারি

শাহবাগের প্রাণ এখন অনেক স্তিমিত। মাহমুদুর রহমানের কাউন্টার রেভলিউশানের প্রপাগান্ডা স্টেজ শেষ করে ভয়ঙ্কর কিছু হবে হবে করেছে। শাহবাগের জনতা এখন অনেক কম। জাস্ট আছে আওয়ামী লীগ আর কিছু ডেডিকেটেড কর্মী যারা শাহবাগের সেই অগ্নিঝরা দিনের মায়া ভুলতে পারছে না।

২১ ফেব্রুয়ারি ছিল শাহবাগের জন্যে সুযোগ। কারণ এই দিন একটা বিশাল বড় ক্রাউড হবে তার প্রত্যাশা ছিল। এবং সরকারও বুঝতে পারছে, মাহমুদুর রহমান শাহবাগকে নিয়ে যে গেম খেলছে তাতে তারা কোনোমতেই জয়ী হতে পারবে না। এইটা এখন শেষ করে দিতে হবে।

তাই একটা শো ডাউন করে, কিছু দাবি জানিয়ে শাহবাগকে শেষ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

শাহবাগে লাখো জনতার মহাগর্জন: প্রথম আলো

http://archive.prothom-alo.com/detail/date/2013-02-21/news/330977

২১ তারিখে যথারীতি শাহবাগে বিশাল ক্রাউড হয়।

এবং এই সমাবেশ থেকে ছয় দফা আলটিমেটাম দেয়া হয়।

আলটিমেটামগুলোর মধ্যে আছে

১। ব্লগার রাজিব, জাফর মুন্সি, বাহাদুর মিয়া ও কিশোর রাসেল হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের সাতদিনের মধ্যে গ্রেফতার করতে হবে।

২। আগামী ২৬ মার্চের আগে একাত্তরের ঘাতক ও গণহত্যায় নেতৃত্বদানকারী জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে সংশোধিত ট্রাইব্যুনাল আইন অনুযায়ী অভিযোগ গঠন এবং জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধে আইনি-প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

৩।অবিলম্বে যুদ্ধাপরাধীদের সংগঠনের আর্থিক উৎস চিহ্নিত করে আইনের আওতায় নিয়ে আসা এবং এ বিষয়ে একটি স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করা।

৪।যুদ্ধাপরাধীদের বিচার-প্রক্রিয়া গতিশীল করতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালকে স্থায়ী রূপ দেওয়া।

৫। গণমানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাস বন্ধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযান জোরদার করা।

৬।জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে যুদ্ধাপরাধী ও জামায়াত-শিবিরের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে এবং তাদের রক্ষক ও সাম্প্রদায়িক উসকানিদাতা গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া।

এবং এই সমাবেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘোষণা ছিল, এখন থেকে প্রতি শুক্রবার বিকেল তিনটার সময় সমাবেশ হবে এবং প্রতিদিনের শাহবাগের জমায়েত আর হবে না। এই ঘোষণা দিয়ে শাহবাগে যে সিট-ইন প্রটেস্ট, সেটার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এবং এই ঘোষণা থকে প্রকারান্তরে সরকারের পক্ষ থেকে শাহবাগের সমাপ্তি ঘটানো হয়। কারণ আওয়ামী লীগ বোকা নয়। আমার দেশ যে সারা দেশে একটা চরম ক্ষোভ চাগিয়ে তুলেছে এটা নিয়ে সরকারের শীর্ষ পর্যায় খুব ভালো মতোই চিন্তিত হয় এবং তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, শাহবাগকে এখন ফাইনালি শেষ করে দেয়াটাই ভালো।

এবং সেই ধারা থেকেই ডাক্তার ইমরান এইদিন শাহবাগের দৈনিক সিট-ইন প্রটেস্টের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এই দাবি জানানোর সময়ে ডাক্তার ইমরানের একটা ভিডিও ইন্টারনেটে

সম্প্রচার হয় যা তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে মানুষের মনে যা যা সন্দেহ আছে তার সবগুলোই দৃষ্টিকটু ভাবে ফুটে ওঠে। এই ভিডিওতে দেখা যায় এই দাবিগুলো জানানোর সময় ছাত্রলীগের সভাপতি নাজমুল ইমরানকে এক পাশে থেকে প্রম্পট করছেন।

এই ভিডিওতে দেখা যায় এবং শোনা যায় ডাক্তার ইমরান এক একটা বাক্য বলার সময়ে ছাত্রলীগের একজন নেতা পাশে থেকে ডাক্তার ইমরানকে প্রম্পট করছেন আর বলছেন: আসতে বলেন, জোরে বলেন, আবেগ দিয়ে বলেন, চিল্লায়েন না, স্বাভাবিক, স্বাভাবিক। ইত্যাদি। এই সময়ে ইমরান সরকারের উল্টো সাইডে ছিলেন আরেকজন সুপরিচিত আওয়ামী ঘরানার সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নাসিরুদ্দিন ইউসুফ।

http://www.youtube.com/watch?v=wPCl3AKpYag

শাহবাগে ইমরান যে রিমোট কন্ট্রোলড অবস্থায় ছিল, তা নিয়ে যদি কারো সন্দেহ থাকে, এই ভিডিওটা দেখার পর সেই সন্দেহ সম্পূর্ণভাবে কেটে যাবে। অন্ততপক্ষে, আমার জন্যে এটা তাই ছিল। শাহবাগ সম্পর্কে আমি আজ যা বলছি, তা অনেক তথ্য পাওয়ার পর জেনে বুঝতে পেরে বলছি। কিন্তু শাহবাগের ঘটনাকালীন সময় সবকিছু এত ক্লিয়ার ছিল না। ডাক্তার ইমরান সরকারের ব্যাপারে আমার অনেক সন্দেহ ছিল কিন্তু তার আগে, আমি বেনিফিট অফ ডাউট দিয়েছি সব সময়। কিন্তু আমার সকল সন্দেহ মূলত এই ভিডিওটা দেখার পরে দ্বিধাহীন ভাবে কেটে যায়।

এবং আমার একটা অনুভুতি হয়, আমাদের অনুভুতি নিয়ে একটা চরম গেম হয়েছে এবং হচ্ছে। আমি অত্যন্ত অ্যাবিউজড ফিল করি।

শাহবাগের আন্দোলন শেষ হয়েছে কি হয় নাই, এই নিয়ে বেশ কিছু বিরোধ দেখা দেয়। কারণ, ব্লগারদের মতে এই ঘোষণাটি কোন আলোচনা না করেই দেয়া হয়।

বিবিসির প্রতিবেদন

শাহবাগের লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি প্রত্যাহার

আমি স্ট্যাটাস দেই

'আন্দোলন নাকি শেষ। ব্লগার ইমরান এই আন্দোলন হইতে, আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের এমপি টিকেট নিশ্চিত করল। আমরা একটা নেতা পাইলাম।

মানুষ কি পাইলো?
আমরা যারা অল্পবিস্তর চিল্লাচিল্লি কৈরা, ফেসবুক গরম রাখছি, আমাদের কম্বল কই?'
এই স্ট্যাটাসে একজন বন্ধু কমেন্ট করেন যে, আমি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছি। তার উত্তরে আমি বলি,
আমি কোনো সেলিব্রেটি ব্লগার না যে আমার পোস্ট দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। নেতারা যদি একদিকে বলে আন্দোলন শেষ হয় নাই, আরেকদিকে বিবিসিকে বলে, 'এই আন্দোলনে অংশ নেয়া একশোটিরও বেশি সংগঠনের সবার সাথে আলাপ করেই তারা রাজপথ ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আর ছাত্রলীগের সম্পাদক যদি, নামতা পড়ার মতো নেতাকে দাবি পড়ায় যেন সে বাংলা পড়তে জানে না এবং সে বিভ্রান্তি যদি আমাদের চোখে পড়ে, আর সেটা নিয়ে যদি আমরা উচ্চকিত হই তো আমরা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করি না, বিভ্রান্তি দূর করি।'
আর এক বন্ধুর স্ট্যাটাসে আমি এই কমেন্টটা দেই
'বস একটা কথা বলি, আন্দোলন কখনও আপনাদের হাতে আসে নাই যে, বেহাত হবে। আমি কাছ থেকে দেখি নাই, কিন্তু ফেসবুক নোট আর স্ট্যাটাস থেকে যা বুজছি, আপনেরা জনগণে আন্দোলন, এইখানে কোনো নেতা থাকবে না এই টাইপের মেসেজ যখন দিতে চাচ্ছিলেন, এবং আগায় আসতে ইতস্তত করতেছিলেন তখন একটা গ্যাপ ক্রিয়েট হইছে, যেটায় নেতা নির্লজ্জের মতো নিজেরে ফ্রন্ট সিটে বসায় নিছে। এবং আমার মনে হয় নাই, আপনেরা কখনও সেই সেটব্যাক থেকে উঠে আসতে পারছেন।
আমি ভিতরের কথা জানিনা। কিন্তু এটাই, কমনলি এস্টাব্লিশড পাব্লিক পারসেপশান।'

চ্যাপ্টার ১৫. মাহমুদুর রহমানের কাউন্টার রেভোল্যুশানে সংঘাতের সূচনা

শাহবাগের পর্ব ৮. কাউন্টার রেভোল্যুশান সংঘাতের স্টেজ

কিন্তু শাহবাগে কি হচ্ছে তা নিয়ে আমার দেশের আর মাথাব্যথা নাই। মাহমুদুর

রহমান এখন তার বেজকে জাগিয়ে তুলছেন।

২১ ফেব্রুয়ারি সকাল মানে ২২ তারিখ শুক্রবার প্রথম সিরিয়াস সংঘাতের আগের দিনের নিউজ: আমার দেশ

শেখ হাসিনাকে নিয়ে কটূক্তির জন্য শাস্তি: রাসুল (সা.) অবমাননাকারীদের বাহবা!

ফুঁসে উঠছে ধার্মিক জনগোষ্ঠী: শুক্রবার সাড়ে ৪ লাখ মসজিদ থেকে বিক্ষোভের ঘোষণা

এই সময়ে বাংলাদেশ ফেনিয়ে উঠছে এবং একটা চরম সংঘাত আসন্ন। শাহবাগের অ্যান্টিথিসিস, বাঁশের কেল্লার ফেসবুক পেজ থেকে রেগুলার যেসব লেখা আসছিল এবং আমার দেশে প্রতিবেদনগুলো যেভাবে আসছিল তার ভিত্তিতে আমার এ ধারণা হয়।

এবং এই সময় আমার একটা উপলব্ধি হয় তা হল, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বলে কিছু নাই। বাংলাদেশ লিমিটেড সেন্সরশিপের প্রয়োজন আছে। বিশেষত আমার দেশ থেকে যেই ভাবে বিভিন্ন ব্লগারদেরকে ব্যক্তিগতভাবে টার্গেট করে প্রতিবেদন দেয়া হচ্ছিল তাতে বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা অসম্ভব ক্ষুব্ধ হচ্ছে। বাংলাদেশে রায়টের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। এবং আমার মনে হচ্ছিল এর ফলে এই দেশের ধারাবাহিকতা নষ্ট হবে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হবে। তার উপর ইন্টারনেট স্পেসের যেসব ক্যাচাল তাতে নিজের পরিচয় ঢেকে কিছু মানুষ যা ইচ্ছা তা বলার একটা সংস্কৃতি আছে। অনেক বিকৃতমনা মানুষ ইন্টারনেটে অসম্ভব ভয়ংকর কথাবার্তা বলে থাকে যা সোশ্যাল স্পেসে অগ্রহণযোগ্য। এটা তারা করতে পারে, কারণ নেটে কেউ কাউকে চেনে না এবং নেটে পরিচয় গোপন করে অনেককিছু বলা যায়।

সেই ধরনের কিছু জিনিসকে জাতীয় দৈনিকের প্রথম পেজে হাইলাইট করে, তার ভিত্তিতে সব ইন্টারনেট ভিত্তিক লেখক বা ব্লগারদেরকে অভিযুক্ত করার এবং সবাইকে এই সব লেখার জন্যে দায়ী করে শাহবাগকে ডিলিজিটিমাইজ করার যে পন্থা মাহমুদুর রহমান এবং আমার দেশ নিয়েছিলেন আমার তাকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং দেশের প্রতি চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা বলে মনে হয়েছে। আমার এইটাও মনে হয়েছে যে, সাইবারস্পেসে রাসুল (সা.) এবং ইসলাম ধর্ম নিয়ে চরম নোংরামিপূর্ণ কথা বার্তা যে অল্প কয়েকজন ব্লগার লিখে থাকেন,

সেইটার একটা নিউজ হতে পারে। কিন্তু সেই লেখাগুলোকে জাতীয় দৈনিকের প্রথম পাতায় ছাপিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে পুরো দেশে সাম্প্রদায়িক হানাহানি করার এবং সন্ত্রাস করার প্রণোদনা দেয়াটা আমার কাছে খুব ভয়ঙ্কর মনে হয়েছিল। এবং এর দায় বাংলাদেশকে দিতে হয়েছে। এই ধারণার ভিত্তিতে আমি নিজেকে অবাক করে দিয়ে লিমিটেড সেন্সরশিপের পক্ষে একটা ব্লগ লিখি যা ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তে প্রকাশ হয়। পড়েন।

সেন্সরশিপ নিয়ে কিছু ভাবনা

১২টি ব্লগ ও ফেইসবুক পেইজ বন্ধ

(প্রকাশ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩)

সোনার বাংলা ব্লগ বন্ধের পর, আমি দুইদিন আগে সব ধরনের সেন্সরশিপের বিরুদ্ধে লিখেছিলাম। কিন্তু এখন আমি লিমিটেড সেন্সরশিপের পক্ষে।

কিন্তু সেই সেন্সরশিপ যেন বিটিআরসিকে চিঠি দিলেই না হয়। বা আওয়ামী বা পরবর্তীতে যে সরকার আসবে, তার বিরোধীতা করলেই যেন এইটা না হয়।

এটার জন্যে হাই লেভেল, বাইপারটিজান একটা কমিটি হওয়া উচিত। যেটা রেসিয়াল হেট্রেডওয়ালা ফেসবুক পেজ এবং ওয়েবসাইট বন্ধ করবে। এটার জন্যে মিনিমাম ১০০০ জনকে রিপোর্ট করতে হবে। এই রিপোর্ট সংস্কৃতিটা বাংলা সাইবার স্পেসের জন্যে প্রয়োজনীয়।

রিপোর্টিংয়ের একটা এস্কেলেশান ম্যাট্রিক্স থাকা উচিত। যাতে ফাইনাল ব্লক পর্যন্ত আসার আগ পর্যন্ত একটা সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পেজ বা ওয়েবসাইট একটা তিন ধাপ বা চার ধাপের একটা ফেজড ওয়ার্নিংয়ের মধ্যে দিয়ে যাবে।

এই কমিটির নিজস্ব ইন্টারঅ্যাক্টিভ ওয়েবসাইট এবং পেজ থাকা উচিত। তারা কোনো সিক্রেট অরগানাইজেশন হওয়া উচিত না। এই পেজ থেকে তারা সম্ভাব্য ব্লকের তালিকায় থাকা ওয়েবসাইট এবং পেজগুলোকে ওয়ারনিং দেবে। এবং যেসব পেজ বা সাইট ব্লক করা হয়েছে তার একটা সুনির্দিষ্ট বর্ণনা দেবে রেফারেন্সসহ কেন তাদের ব্লক করা হল এই ব্যাখ্যা দিয়ে।

আমি ফ্রিডম অব স্পিচ এবং ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। আমি এই জন্যে ইতিপূর্বে ছাগু ট্যাগ খেয়েছি, ‘যতক্ষণ না জামায়াত শিবির নিষিদ্ধ না করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মিছিল করার অধিকার কেড়ে

নেয়াটা, তাদের ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশনের উপর আঘাত' এই কথা বলে।

আমি উইদাউট 'ইফ কিন্তু বাট' যুদ্ধাপরাধ এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের দেশবিরোধী ভূমিকার জন্যে জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধ করার পক্ষপাতি।

কিন্তু যতক্ষণ কোনো আইন দিয়ে তাদের নিষিদ্ধ না করা হচ্ছে ততক্ষণ রাষ্ট্র তাদের ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশনে আঘাত দিতে পারে না বলে মনে করি। কারণ রাষ্ট্রকে দেশে সব মানুষকে ইকুয়াল ট্রিট করতে হবে। এটা রাষ্ট্রের ইকুয়ালিটির একটা দায়। এটাই জামায়াত শিবিরের মতো দলের মতবাদের সাথে একটা প্রগ্রেসিভ রাষ্ট্রের ধারণার পার্থক্য। আমার পজিশন স্টিল দ্য সেম। ফ্রিডম অফ স্পীচ এবং ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন কোনো আরাম এবং প্রয়োজনের জন্যে ডিস্পেন্সেবল না।

কিন্ত আমার দেশ এখন যেটা করছে, তা ডাইরেক্ট ইন্সাইটেশন। এটা ফ্রিডম অব স্পীচের একটা মূল টেনেন্টের পরিপন্থী। সেটা হলো, আপনার ফ্রিডম আরেকজনের ফ্রিডমে ইন্টেরাপ্ট করতে পারবে না এবং হানাহানি বিদ্বেষ ছড়াতে পারবে না।

ফ্রিডম অব স্পীচের লিমিট নিয়ে অনেক ডিবেট আছে। সেই ডিবেটের পরিষ্কার একটা আরগুমেন্ট হলো, সামাজিকভাবে কেউ যদি এমন কিছু ছড়ায় যাতে হানাহানি বা বিদ্বেষ ঘটতে পারে, তো তাকে আইনের আওতায় আনা উচিত।

গত তিনচারদিনের আমার দেশ যদি ফলো করেন তাহলে দেখবেন, তারা ক্লিয়ারলি চাচ্ছে দেশে একটা রায়ট হোক। এবং তারা যেটা করছে, সেটা ফ্রিডম অব স্পীচের একটা ডাইরেক্ট অ্যাবিউজ, এটা ইন্সাইটেসান অফ ভায়োলেন্স।

সরকারের কিছু করা উচিত। সেন্সরশিপ ইজ অ্যান অপশন। তবে শুধু মাত্র সেন্সরশিপ না। ডেমেজ মিটিগেশান স্টেপও নেয়া উচিত।

সকলের শুভ বুদ্ধির জয় হোক।

সবাইকে অমর একুশের শুভেচ্ছা।

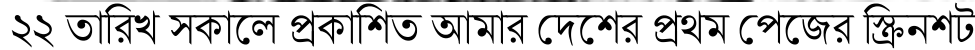
এই দিন আমি আবার স্ট্যাটাস দেই।

'আমি রায়ট দেখতে পাচ্ছি, যার সাথে মিডিয়া সেন্সর এবং ফেসবুক ব্লক হবে।'

২২ তারিখ শুক্রবার

ঐদিন সকাল থেকেই আমি টেন্সড হয়ে ছিলাম। আমি ক্লিয়ার ছিলাম এইদিন

একটা বিশাল শোডাউন হবে। কারণ এই লেখায় আমি আমার দেশের যে লেখাগুলো দিয়েছি সেগুলো আমি তখন ফলো করছিলাম।
এবং সেগুলোতে পরিষ্কার কিউ ছিল, জুমার নামাজের পর শোডাউন হবে।
২২ তারিখ সকালে প্রকাশিত আমার দেশের প্রথম পেজের স্ক্রিনশট দিচ্ছি।



আমার দেশ

ধর্ম ও আদালতের অবমাননা করছে ব্লগারচক্র

ধর্মদ্রোহী শক্তির অপতৎপরতার বিষয়ে দেশবাসীর কাছে চিঠি

২২ তারিখ সকালে প্রকাশিত আমার দেশের প্রথম পেজের স্ক্রিনশট



শাহবাগ অবস্থানের সমাপ্তি

প্রতি শুক্রবার ও বারের আগের দিন সমাবেশ, ২৬ মার্চের মধ্যে জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধের আলটিমেটাম

দেশব্যাপী আলেমসমাজের প্রতিবাদ বিক্ষোভ আজ

জামায়াত নিষিদ্ধের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য নয় : এরশাদ

জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার ঘোষণা

সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী দেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি

উদাত্ত আহবান

২২ তারিখ সকালে প্রকাশিত আমার দেশের শেষ পাতার স্ক্রিনশট

ক্লিয়ারলি আমার দেশ তখন শাহবাগকে কাউন্টার করার জন্যে একটা কাউন্টার রেভল্যুশনের পরিকল্পনা স্টেজ শেষ করে এখন বাস্তবায়ন করছে। কিন্তু যেহেতু আমাদের সেকুলার মিডিয়া সরকারের ন্যারেটিভ বাদে আর কিছু দিতে সক্ষম না সেহেতু তারা সেগুলো বাইপাস করে যাচ্ছে। কিন্তু আমি ফেসবুকে খবর পাচ্ছিলাম এবং ফেসবুকে মানুষের ফিডব্যাক এবং সেটা নিয়ে টেনশনে বুঝতে পারছিলাম একটা সংঘাত আসন্ন।

এই দিনগুলোতে আমার দেশের সার্কুলেশান ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। আমি পত্রিকাওয়ালার কাছে খবর নিয়েছিলাম। এই দিনগুলোতে প্রথম আলো বা অন্য সবগুলো পেপারের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো কাটতি ছিল আমার দেশের। এবং এই সময়ে আমার দেশের নিউজগুলো ফটোকপি করে গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দেয়া হয়।

যেহেতু সব টিভি এবং মিডিয়া শাহবাগকে নিয়ে মেতে ছিল, ফলে এন্টিশাহবাগ পক্ষ সম্পূর্ণভাবে আমার দেশ এবং ফেসবুকের বাঁশেরকেল্লা বা বখতিয়ারের ঘোড়া পেজগুলোর উপর নির্ভর করে।

কিন্তু আমার দেশ খুব পরিষ্কারভাবে জনগণের ধর্মপ্রাণ অংশটাকে ফেনিয়ে তুলতে থাকে। এবং তারা পুরো শাহবাগকে নাস্তিক এবং শাহবাগের ব্লগারদের রাসুলের শত্রু হিসেবে প্রচার করে।

আমি এইদিন আমার দেশের সকালের পেপার এবং বিগত তিন চারদিনের বাঁশের কেল্লাসহ অন্যান্য প্রো-জামায়াত এবং হার্ডলাইনারদের ফলো করে শিওর ছিলাম ২২ তারিখ জুমার নামাজের পর একটা সিরিয়াস শো ডাউন হবে। এবং সারাদেশে রায়ট লাগবে। প্রচুর মানুষ মারা যাবে।

এবং সেটা হয়।

জুমার নামাজের পর বাইতুল মোকাররম রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে। কাঁটাবন মিরপুরসহ ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় এবং সারাদেশে ব্যাপক সংঘর্ষ হয় পুলিশের সাথে।

বিশেষত বায়তুল মোকাররমে সংঘর্ষটা অনেক সিরিয়াস পর্যায়ে যায়। এবং বায়তুল মোকাররম থেকে বিক্ষোভকারীরা শাহবাগ গিয়ে আক্রমণ করবে এই রকম একটা কথা ব্লগে ছড়িয়ে পড়ে, এবং এই সময়ে অনেকে শাহবাগে গিয়ে অবস্থান নেয়।

কিন্তু সে ধরনের কিছু হয় নাই। এবং সারাদেশে পুলিশের সাথে রায়টকারীদের সংঘর্ষ হয়। এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শহীদ মিনারে হামলা হয়।

কিন্তু, এই যে এতো কাহিনী চলছে প্রথম আলোসহ মেইনস্ট্রিম মিডিয়া এতোদিন কিছু টের পায়নি। বা টের পেলেও গুরুত্ব দেয় নাই। এইদিনে প্রথম আলোর সম্পাদক সম্পাদকীয় লেখেন।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আলোকিত হোক দেশ। তারুণ্যের নতুন কর্মসূচি। এবং তাতে বলা হয়, যুদ্ধাপরাধের ন্যায়বিচার দাবিতে শাহবাগ চত্বরে ব্লগার অ্যান্ড অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট নেটওয়ার্কের সদস্যরা যে ব্যতিক্রমী ও চেতনাসঞ্চারি আন্দোলন সূচনা করেছিলেন তাই এখন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে... মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত এই তরুণদের প্রতি আমার অভিনন্দন।

ক্লিয়ারলি, শাহবাগের ইনার দ্বন্দ্ব, মাহমুদুর রহমানের কাউন্টার রেভলিউশান এবং আগামী কয়দিনে বাংলাদেশের উপর যে কি আজাব নেমে আসবে এই সব সম্পর্কে মতিউর সাহেবের কোনো ধারণাই নাই। ক্লিয়ারলি তারা অল্টারনেটিভ মিডিয়াকে ফলো করেন না। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মধ্যে কি সংঘাত ঘনিয়ে এসেছে

এবং তার পরিষ্কার যে সিগনাল ছিল সেইটা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নাই।
আরও সংবাদ ছিল
২৪ ঘন্টার মধ্যে মাহমুদুর রহমানের গ্রেফতার দাবি
হরতাল প্রত্যাখ্যান করে প্রজন্ম চত্বর থেকে নতুন কর্মসূচি
২৩ ফেব্রুয়ারি
এইদিন বিগত দিনের চারিদিকের সংঘর্ষ ছিল প্রধান নিউজ
কিন্তু আমার দেশ ফেনিয়ে তুলছেন তার বেজকে।
রাসুল (সা.) অবমাননার প্রতিবাদে গণবিস্ফোরণ: গাইবান্ধায় নিহত ৩ সিলেটে ১ ঝিনাইদহে ১ সারাদেশে আহত ৪ হাজার, কাল দেশব্যাপী হরতাল: বায়তুল মোকাররম এলাকায় পুলিশের হাজার রাউন্ড গুলি
শুক্রবার এই সংঘাতের পরে প্রথম আলো টের পায় কি হচ্ছে। এই দিন মাহমুদুর রহমানের একটা ভিডিও সাক্ষাৎকার ছাপায়। প্রথম আলো তার প্রতিপক্ষ নিউজপেপার আমার দেশের সম্পাদকের সাক্ষাৎকার ছাপাচ্ছে সেটাও একটা ঘটনা। এর মাধ্যমে প্রথম আলো মাহমুদুর রহমানকে একজন সম্পাদক নয় বরং এই গোলযোগের একটা সিরিয়াস এনটিটি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
শাহবাগের বিরুদ্ধে আমার দেশ-এর অবস্থান অব্যাহত থাকবে: মাহমুদুর রহমান (ভিডিও): প্রথম আলো
২৬ ফেব্রুয়ারি
ইমামকে হুমকি, ফারাবি পাঁচ দিনের রিমান্ডে: প্রথম আলো
http://archive.prothom-alo.com/detail/date/2013-02-26/news/332257
আমার স্ট্যাটাস
যারা যারা জামায়াত নিষিদ্ধের কথা বলেছেন, বুবু তাদেরকে আজ বকে দিয়েছেন। তিনি বলেন, জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। এমনকি আওয়ামী লীগের দলীয় ফোরামেও এ নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। অথচ দিন-তারিখ দিয়ে জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার আগাম বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে।
'বুবু কি তাইলে শাহবাগে রিভার্স খেলেস্নন? একটা প্রবাদ আছে, if you make same mistake thrice, it is not a mistake it is a choice. আমি একটা কারেকশান দিলাম If you make that same mistake again and again for years together, it is not a

choice, you are an Awami league...hu hu hu. bani Zia Hassan

আমার দেশ

হাটহাজারীতে লাখো জনতার মহাসমাবেশে আলেমদের হুঁশিয়ারি: শাহবাগিদের আস্ফালন বন্ধ না হলে ঢাকা অবরোধ: মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতার করলে সারাদেশে আগুন জ্বলবে

শাহবাগীদের এক দাবি: মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতার ও আমার দেশ বন্ধ

খেয়াল করে দেখেন, মাহমুদুর রহমান তখন অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন।

২৩ তারিখ আমি একটা ব্লগ লিখি। যেটায় আগে যেই কথাগুলো আছে সেগুলো ভালোমতো সামারি করা হয়েছে। এই লেখায় সেই সময়ের মনের ফিলিংসটা পাবেন।

নোট ৯

সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভের প্রেক্ষাপটে মুভমেন্টের জন্যে গরীব মানুষের কিছু বাসি কথা—প্লিজ গাইল দিয়েন না।

(প্রকাশ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩)

আমি আপসেট ফিল করছি। অনেক আপসেট।

শুক্রবারের জুমার পরের ঘটনাপ্রবাহ আন্দোলনের জন্যে বিশাল একটা আঘাত। এটা কাম্য ছিল না।

আমাদের ফেসবুক অ্যাক্টিভিজম এবং ব্লগিংয়ের একটা লক্ষ্য আছে। আমরা প্রচলিত রাজনৈতিক শক্তির বাইরে নতুন প্রজন্মের উত্থানে স্বাধীনতার যে মৌলিক চেতনা তার পুনরুত্থান আশা করি। এবং আশা করি এই ঘুণে ধরা পচা রাষ্ট্রে এই জাগরণ পরবর্তীতে একটা সামগ্রিক পরিবর্তনের জোয়ার নিয়ে আসবে। আশা করার কারণও ছিল।

কারণ আজ থেকে মাত্র দুই সপ্তাহ আগে যে অভূতপূর্বভাবে সারা দেশের সকল পেশার, সকল ধর্মের, সকল শ্রেণির সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছিল, সে এক অসামান্য ঐক্য নির্দেশ করে। সেই ঐক্যে কোনো আস্তিক, নাস্তিক, হিন্দু, মুসলমান প্রশ্ন ছিল না।

সেই ঐক্যটা অনেক ইনস্পায়ারিং। অনেক অনেক স্বপ্ন দেখায় সেই ঐক্য। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, আমরা একলা একলা টেবিল টক, আর চায়ের

কাপে রাজা-উজির যতই মারি, আমরা আমজনতা পলিটিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্টের কাছে মাইর খেয়েই যাবো। কিন্তু আমরা যখন ১ লক্ষ লোক এক সাথে শাহবাগে দাঁড়িয়ে একই চাওয়ার কথা বলি, তখন পলিটিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট আমাদের ডরায়, আমাদের কথা শুনতে বাধ্য হয়।

যদিও সেই ঐক্যে শুধু কাদের মোল্লার ফাঁসি চাওয়ার ডাকই শোনা গেছে কিন্তু সেই ঐক্য পুরো দেশের একটা সামগ্রিক পরিবর্তনের ডাক দেয়। কান পাতলেই সেই ডাক পরিষ্কারভাবে শোনা যাচ্ছিল।

আমি বেশ কয়েকজনকে দেখেছি যাদের আমি বিএনপি-মনা বলে জানি, কিন্তু তারা তাদের চার পাঁচ বছরের বাচ্চাকে নিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গণজাগরণ মঞ্চে গেছে। এই গণজোয়ার এই ধরনের সংশয়বাদী অনেককেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল, তাদের সমর্থনের ভুলটাকে। তারাও বুঝতে পারছিল, আমাদের স্বাধীনতার সূর্য সৈনিকদের হত্যার বিচার হওয়া প্রয়োজন। এবং দেশের আপামর জনতা সেটা চায়। আওয়ামী লীগ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে রাজনীতি খেলে, তাই বলে সেই দাবিটা খেলো হয়ে যায় না। একই সাথে সেই ঐক্য দিয়ে আমরা সকল সংকীর্ণতার খপ্পর থেকে 'জয় বাংলা' শ্লোগান কেড়ে এনেছিলাম। সেটাও তো অনেক বড় একটা পাওয়া, যার মহিমা লিখতে গেলে আরেকটা নোট লিখতে হবে। একমাত্র সমাজের সব শ্রেণির মানুষের ঐক্যের কারণেই এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল। এর পূর্বে দেশ ছিল বিভক্ত, জয় বাংলা শ্লোগান দিতে একজনকে চিন্তা করতে হত, সে কোনো দলের পক্ষ নিচ্ছে নাকি।

আমাদের উভয় পলিটিক্যাল পার্টির জন্যে দেশকে বিভক্ত করে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রকম আইডলজিক্যাল ডিবেট জিইয়ে রাখাটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট।

এই ক্ষেত্রে দুই দলের দুই রকম স্ট্র্যাটেজি। একদল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ বিপক্ষের শক্তির ডিভিশন করে, আরেকদল ভারতের দালাল এবং ইসলামের পক্ষ বিপক্ষ শক্তি হিসেবে দেশটাকে বিভক্ত করতে চায়।

এই আইডিয়োলজিক্যাল বিতর্কটা টিকিয়ে রেখে, তা দিয়ে মানুষকে বিভক্ত করে উভয় দল দুর্নীতিকে আড়াল করে পালাক্রমে রাষ্ট্রকে লুট এবং দেশের শেষ কড়ি-বর্গা, সব টেন্ডার, কন্ট্রাক্ট, তেল গ্যাস, রাস্তাঘাট সহ সবকিছু নিজেদের নেতা-কর্মীদের মাঝে বন্টন করে নেয়ার একটা সফল স্ট্র্যাটেজি চালু

রেখেছে।

এই আইডিয়োলজিক্যাল ডিবেট দুইটার বাইরে তাদের কোনো পার্থক্য নাই। তাদের ইকোনমিক পলিসি একই, তাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি একই। তারা এক বারে বসে এক সাথে মাল খায়, নিজেদের মধ্যে ছেলে মেয়ের বিয়ে দেয়, একসাথে ব্যবসা করে, এক সাথে পার্লামেন্টারি সাব কমিটিতে বসে মন্ত্রণালয়ের সম্পদগুলো ভাগ-বাঁটওয়ারা করে নেয়।

তাই, এই দুই দলের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যখন মানুষের মঞ্চ দাঁড়াল, আওয়ামী লীগের রাশ ভারি নেতাদের যখন জনতা পানির বোতল ছুঁড়ে মেরে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দিল তখন পুরো দেশে একটা স্বপ্ন জেগেছিল; এটা একটা নির্দলীয় মঞ্চ... পলিটিক্যাল সিস্টেমের বাইরে সাধারণ মানুষের একটা মঞ্চ, আমাদের মঞ্চ... আমজনতার মঞ্চ।

সেই মঞ্চ যে আশা তৈরি করেছে, তাকে ঘিরে উৎসবে মেতে ওঠে মানুষ। একটা দমবন্ধ, গুমোট পরিবেশের মধ্যে হঠাৎ মুক্ত বাতাস আসার মতো প্রাণ খুলে নিশ্বাস নিয়েছিল মানুষ। ঐ মঞ্চে আস্তিক নাস্তিক হিন্দু মুসলমান ছাত্র মোল্লা কোনো পরিচয় মুখ্য ছিল না। রাজনৈতিক সিস্টেমের বাহিরের এই মঞ্চকে তাই বলা হয়েছিল সামাজিক শক্তি।

আজ আমি হতাশ, কারণ, সেই ঐক্যের মঞ্চে খুব প্ল্যান সহকারে একটা আস্তিক-নাস্তিক ডিবেট তৈরি করে মানুষের মধ্যে ডিভিশন সৃষ্টি করা হয়েছে।

ওই ডিভিশনটা সব রাজনৈতিক শক্তিই কায়মনোবাক্যে চাচ্ছিল। পলিটিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট চেয়েছে, জনমানুষের মঞ্চ বিতর্কিত হোক যাতে লাখে লাখে মানুষ এভাবে শাহবাগে এবং দেশের পাড়ায় পাড়ায় অরাজনৈতিক মঞ্চে ছুটে না যায় এবং এমন করে ভবিষ্যতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দুর্নীতি এবং অন্যান্য লুটপাট কিংবা প্রথাগত রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে একটা প্রতিশক্তি না হয়ে দাঁড়ায়। ডান আর প্রতিক্রিয়াশীল গ্রুপও চেয়েছিল এই মঞ্চ বিতর্কিত হোক এবং যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবি জোরালো না হোক, যেন তাদের রাজনৈতিক মিত্র জামায়াতের সাথে ভোটের সমীকরণে কোনো অনিশ্চয়তা না আসে। এই জন্যে তাদের প্রোপাগান্ডা মেশিন ছিল সব চেয়ে বেশি চড়া।

তাদের এই চাওয়ার মুখে, জাগরণের ১৩তম দিনে, রাজীবের হত্যা ছিল পরিষ্কার একটা ফাঁদ।

থাবা বাবা এমন একটা চরিত্র যা কোনো মুক্তবুদ্ধির প্রতিনিধিত্ব করে না। বরঞ্চ মনোযোগকামী বুদ্ধি প্রতিবন্ধীও বলা চলে, যার মূল উপজীব্য ছিল ধর্মীয় উস্কানি আর সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়ানো।

আদতে থাবা বাবাকে কোনো নাস্তিক বলা যায় না। আমাদের ইতিহাসে কাজী নজরুল, কমরেড মোজাফফর, সাহিত্যিক আবুল ফজল বা প্রফেসর আসহাবউদ্দিনসহ অনেক নাস্তিক আছেন যারা জনমানুষের মনে ঠাঁই করে নিয়েছেন। কিন্তু থাবা বাবা কোনো নাস্তিক ছিল না। থাবা বাবা একটা কুরুচিশীল থার্ড ক্লাস ধর্মবিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক উস্কানিদাতা। যে কোনো সাধারণ ননপ্র্যাক্টিসিং মুসলমানকেও থাবা বাবার লেখা আহত করবে। আর মোল্লাদের কথা তো বলাই বাহুল্য।

একজন মৃত মানুষের সমালোচনা করা ঠিক না। কিন্তু আলোচনার খাতিরে প্রসঙ্গটা আনতেই হলো। তার হত্যাকারীদের অবশ্যই বিচার হওয়া উচিত। একটা সুস্থ স্বাভাবিক দেশে লেখার জন্যে কেউ কাউকে গলা কেটে মেরে ফেলতে পারে না। এটা মধ্যযুগের লক্ষণ এবং ঐ ধরনের অসহনশীল সমাজে যেন আমরা পরিণত না হই এবং এই ধরনের মেন্টালিটির কোনো রাজনৈতিক শক্তি যেন আমাদের শাসন ব্যবস্থায় আসতে না পারে তা আমাদের সর্ব শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে। এবং একই সাথে কোনো অজুহাতে আমাদের ফ্রীডম অব স্পীচ এবং ফ্রীডম অব এক্সপ্রেশনের উপর কেউ যেন সামান্য ফুলের টোকাও দিতে না পারে তা নিয়ে আমাদের সব সময় সতর্ক থাকতে হবে।

কিন্তু ঐটা ভিন্ন ডিসকাশন। রাজীবকে মারা হয়েছে বেছে, খুব হিসেকেরে। রাজীব এমন কোনো সিনিয়ার লিডার ছিল না। জাগরণ মঞ্চের লক্ষ লক্ষ অ্যাক্টিভিস্টদের মধ্যে রাজীব ছিল একজন।

কিন্তু সবার মধ্যে থেকে রাজীবকে বেছে নিয়ে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যই ছিল মঞ্চ সম্পর্কে একটা মিথকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া, যেটা আমার দেশ গ্রুপ জাগরণের শুরু থেকেই প্রচার করছিল। সেটা হল, এই মুভমেন্ট নাস্তিকদের, যারা প্রত্যেকেই থাবা বাবার মতো ধর্মদ্বেষী এবং কাদের মোল্লার বিচার চাওয়ার আড়ালে তাদের উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশ থেকে ইসলাম দূর করা।

রাজিব এই ধরনের লেখালেখি করছে বেশ কয়েক বছর, কেউ পাত্তাও দিত না।

রাজীবর নূরানিচাপা নামের ওয়ার্ড প্রেস ব্লগটা প্রায় এক বছর আগের, সেখানে এক বছরে একটা হিট পড়ে নাই। কিন্তু এতদিন পর গণজোয়ারের সময় তাকে টার্গেট করার উদ্দেশ্য ছিল খুব পরিষ্কার—গণজাগরণকে আস্তিক-নাস্তিক দ্বন্দ্বে ফেলে, থাবা বাবার ঘৃণ্য এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উদ্রেক করার ক্ষমতা সম্পন্ন সেই লেখাগুলো সামনে এনে, ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের উস্কানি দিয়ে মুভমেন্টের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া এবং বাংলাদেশের মানুষকে আরেক অ্যাঙ্গেল থেকে বিভক্ত করা। এবং এই মুভমেন্টটাকে এক পক্ষের জন্যে মুক্তবুদ্ধি এবং অন্য পক্ষের জন্যে ইসলাম বাঁচানোর ডিবেটে পরিণত করা।

পরিষ্কার ভাবে সেই ফাঁদটা দেখা যাচ্ছিল। রাজীবকে নিয়ে নানা সিদ্ধান্তের মাধ্যমে মুভমেন্ট ক্লিয়ারলি সেই ট্র্যাপে পা দিলো।

আমরা যারা কিছুটা হলেও রাজীবের লেখার সাথে পরিচিত ছিলাম, আমাদের ভেবে অবাক লাগে, এটা কেউ বুঝে নাই, রাজীবের জানাজা হতে শুরু করে রাজিবকে দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ হিসেবে যেভাবে ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে তাতে এই আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরের মানুষ আস্তিক-নাস্তিক হিন্দু-মুসলমান ধনী-গরিব সব ধরনের মানুষের পরিবর্তনের আকাঙ্খায় যে একটা মহা ঐক্যের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে সেটা বিনষ্ট হবে।

যারা রাজীবকে হত্যা করেছে, যে উদ্দেশ্যে হত্যা করেছে, রাজীবের মৃত্যুর পরের ঘটনাপ্রবাহে যেসব ডিসিশন নেয়া হয়েছে, তাতে তারা তাদের এক্সপেক্টেশন থেকে অনেক বেশি অর্জন করছে।

শুক্রবার জুমার নামাজের পর যে সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভ হবে এটা আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছিলাম। এবং আমরা অনেকেই নোট লিখেছি মুভমেন্টকে সতর্ক ডিসিশন নিতে। আমি নিজে ১৬ ফেব্রুয়ারিতে পোস্ট দিয়েছি, riot ahead... শুক্রবারের বিক্ষোভটা যে, রসূল(সা.) এর নামে যা কুটনা গাওয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, মুভমেন্টের জন্যে এটা বোঝা খুব জরুরি।

এই শুক্রবারে সারাদেশে যে সহিংস ঘটনা ঘটেছে, তাতে অবশ্যই জামায়াত-শিবিরের হাতে লুটপাট ভাংচুর হয়েছে। কিন্তু ঐ ভাংচুরে যে রাসুল (সঃ) কে অপমান করায় ক্ষুব্ধ সাধারণ মুসলমানেরা অংশগ্রহণ করেছে সেটা যদি কেউ অস্বীকার করে তো সে এই সোসাইটিকে ঠিক মতো বুঝতে পারে নাই। ইতিপূর্বে এর থেকে অনেক সামান্য সামান্য বিষয়ে বাংলাদেশে ব্যাপক সহিংস বিক্ষোভ

হয়েছে যাতে নিরীহ মানুষ মারা গেছে।

বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে, এখন লিটারেসি ৪০% সেখানে কিছু ধর্মীয় উস্কানিমুলক লেখা দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিক্ষুব্ধ করা খুব সহজ। এই কাজটা আমার দেশ, সংগ্রাম এবং ইনকিলাব গত চারপাচ দিন ধরে করেছে। এবং ফেসবুকের বিভিন্ন গ্রুপে থাবা বাবার লেখা হাজার শেয়ার পড়েছে। থাবা বাবার ব্লগের হিট, রাজীব হত্যার পরদিন শূন্য থেকে প্রায় ৪৫,০০০ গেছে এবং সমসংখ্যক শেয়ার হয়েছে। এবং গত চার পাঁচদিন থাবা বাবার বিভিন্ন লেখা নিয়ে সিরিয়াল রিপোর্ট করে আমার দেশ। তাদের রিপোর্টে এটা ক্লিয়ার তারা তৌহিদি জনতার ক্ষোভকে খুঁচিয়ে তুলেছে।

ফলে সাধারণ ধর্মপ্রেমী মানুষ যাদের জামায়াত শিবিরের প্রতি কোনো ফ্যাসিনেশন নাই, তারা অনেকেই এই বিক্ষোভে সামিল হয়। এটাকে শুধু জামায়াত শিবির, জামায়াত শিবির বলে ডাক দিয়ে আরেকটা নতুন মুক্তিযুদ্ধের সাথে তুলনা করলে দেশের বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা হয়।

এবং এই বিক্ষোভকে, জামায়াত-শিবির নামে চালিয়ে দেয়া হলে অনেক সাধারন মুসল্লি, তাবলীগ জামায়াতের লোকজন এবং কওমি মাদ্রাসার ছাত্র যাদের সাথে জামায়াত-শিবিরের আদর্শিক দ্বন্দ্ব আছে, যারা শুক্রবারের দেশব্যাপী ভাংচুর এবং বিক্ষোভে অংশ নিয়েছে তারা মুভমেন্টের উপর আরো চেতবে। এবং তাদের মাথায় এ পারসেপশানটা আরো শক্ত হবে যে, শাহবাগ মুভমেন্ট মূলত ইসলামকে ধংসের একটা নাস্তিকীয় ষড়যন্ত্র। অথচ ১৭ দিন আগে এরা মুভমেন্টের সাথে ছিল এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চেয়ে কণ্ঠ মিলিয়েছিল শাহবাগের জনতার সাথে।

আজকের আমরা জামায়াতের বিচার চাই এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের ভূমিকার জন্যে তাদের ব্যান করতে চাই। এই চাওয়াটায় অন্যান্য ইসলামিক দল এবং গ্রুপগুলোকে আদর্শিকভাবে একসাথে রাখা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। এই জন্যে হিজবুত, তাবলীগ, কওমি মাদ্রাসা, বিভিন্ন পীরবাদী গ্রুপ এবং সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে আদর্শিক পার্থক্যগুলো বোঝাটা খুব জরুরি। তাদেরকে যদি আমরা সাথে না রাখতে পারি, তাহলে জামায়াত—অন্যান্য ইসলামিক গ্রুপ ও দলগুলোকে রাসুলের অপমানটাকে উপজীব্য করে অ্যালায়েন্স করে মুভমেন্টের বিরুদ্ধে ইউজ করবে, যেমন করেছে এই শুক্রবারে। তাই এইসকল

গ্রুপকে খুব ক্লিয়ার সিগনাল দেয়া উচিত যে, এই মুভমেন্টের কোনো ধর্মীয় চরিত্র নাই। এটা বাংলাদেশের পলিটিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্টের বাইরে সাধারণ মানুষের মুভমেন্ট।

এই শুক্রবার—শহীদ মিনার ভাঙা, জাতীয় পতাকা পোড়ানো, সাংবাদিককে টার্গেটসহ বেশকিছু সেন্সিটিভ কাজের মাধ্যমে ডেফিনেটলি জামায়াত আরো বড় ফাঁদ পেতেছে। এই ফাঁদে আবার পা দেয়াটা কিন্তু হবে আরো একটা মস্ত বড় ভুল।

এখনো বড় একটা সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরি হয়ে আছে যে, সুন্দর একটি স্বপ্নের মাধ্যমে দেশের মোল্লা-ধর্মহীন-আস্তিক-নাস্তিক-ছাত্র-পেশাজীবী-ধনী-দরিদ্র-বুড়ো-জোয়ান সবাইকে এক সুতোর বাঁধনে বাঁধা সম্ভব।

সেটা হচ্ছে, যুদ্ধাপরাধী রাজাকারদের বিচার চাওয়া।

সেই ঐক্যটা আস্তিক-নাস্তিক বিতর্কে যেন বিনষ্ট না হয়। আমি আবার বলছি, শুক্রবার যে জ্বালাও পোড়াও, এটাও একটা ফাঁদ। রাজীব হত্যার চেয়ে বড় ফাঁদ। আপনারা কি সেই ফাঁদে পা দিয়ে ডিভাইসিভ পলিটিক্সে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে পড়বেন নাকি স্ট্র্যাটেজিকালি একটু পিছু হটে বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে, ম্যাচিউর ফরোয়ারড থিঙ্কিং ডিসিশন নিবেন, সেই অপশন আপনাদের উপর।

শাহবাগের এই ছিল কাউন্টার রেভল্যুশান স্টেজ

চ্যাপ্টার ১৬. শাহবাগের রাজীব পর্ব নিয়ে আমার কিছু অপ্রকাশিত নোট

থাবা বাবা বা রাজিব হত্যা শাহবাগকে ডিলিজিটিমাইজ করার অস্ত্র তুলে দেয় মাহমুদুর রহমানের হাতে। মাহমুদুর রহমান সেটার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন।

রাজীব হত্যার সাথে জড়িত ইস্যুগুলো নিয়ে আরো কিছু আলোচনার দরকার আছে। এবং বিশেষত শাহবাগ কেন রাজীব হত্যার পর সেই ট্র্যাপে পা দিলো সেটা নিয়ে আমরা অনেকেই সমালোচনা করি।

এই বিষয়ে আমার ভাবনাটা সেই সময়ে লেখা একটা নোটে পূর্ণভাবে আছে। লেখাটা অপ্রকাশিত। লেখাটা পড়েন।

নোট ১০: রাজীব হত্যা নিয়ে অপ্রকাশিত নোট

(প্রকাশ: অপ্রকাশিত লেখার সময়কাল মার্চের প্রথম সপ্তাহ)

ফর গডস সেক, আমি জানতে চাই কার পরামর্শ ছিল, থাবা বাবারে ব্র্যান্ডিং করার? আই মিন, হোয়াট ওয়াজ দে স্মোকিং? এটা মুভমেন্টের পেছন থেকে না, সামনে থেকে সিম্পলি একটা বড় গাদাবন্দুক দিয়ে গুলি করা হয়েছে। যেটা খুব সহজে মুভমেন্ট টেকনিক্যালি একনলেজ করে বাইপাস করে যেতে পারত। কিন্তু মুভমেন্ট এটা সাধে নিজের গায়ে পরে নিল। এটা শুধু মুভমেন্ট না, আজীবনের জন্যে শাহবাগ হতে যত আন্দোলন হবে সবগুলোর মাস ক্রেডিবিলিটি নষ্ট করেছে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মনোস্তত্ত্ব সম্পর্কে, এক চিমটির এক হাজার ভাগের এক আনার পরিমান আইডিয়াও যদি কারো থাকতো, তো তার উচিত হয় নাই থাবা বাবারে শহীদের মর্যাদা দিয়ে শাহবাগে এনে জানাজা পড়িয়ে লাশের রাজনীতি করার।

আমি মিনিমাম ৫ জন লোককে চিনি যারা তাদের বউ বাচ্চা নিয়ে শাহবাগ মুভমেন্টে গেছে। আমাকে এসে বলে গেছে আমি চিন্তা করি নাই, আমি জয় বাংলা শ্লোগান দেব। কিন্তু দিয়ে আসছি আমার ছেলে মেয়েকে শিখিয়ে আসছি যাতে এটা আজীবন তাদের মাথার মধ্যে থাকে। কিন্তু আজকে যেটা পড়লাম। ছি ছি ছি। আমি আর এদের সাথে যাবো না।

আজকে রাজীব মৃত। আমি আজ তাকে কোনো কিছু লিখে অসম্মান করতে চাই না। রাজীব কী লিখতো সেটা নিয়ে ত্যানা প্যাঁচাবো না। কিন্তু এই সোসাইটিতে এই ধরনের বক্তব্য যে দেয়, তাকে হিরো বানিয়ে, জামাতি ট্র্যাপে মুভমেন্ট কেন পা দিল, এই প্রশ্ন আমি কাকে করব?

এটা যে একটা ট্র্যাপ, এটা বোঝার মতো ঘিলু যাদের নাই, তাদের অনেস্টি অব পারপাস সম্পর্কে আমার সন্দেহ না থাকতে পারে কিন্তু ফোরসাইটেডনেস এবং বাংলাদেশের মানুষের মন-মানস সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিয়ে আমি শুধু সন্দিহান না, তাদের মানসিক পরিপক্কতা নিয়ে একটা বিশাল প্রশ্ন আছে।

থাবা বাবার মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পরে, আমরা অনেকেই ব্লগ লিখেছি। সাবধান। ট্র্যাপে পা দেবেন না। এই মুভমেন্টের কোনো ধর্মীয় চরিত্র নাই। এটাতে একটা ধর্মীয় চরিত্র ঢোকানোর চেষ্টা করছে বাঁশেরকেল্লা আর আমার দেশ গং। কিন্তু সেটা বুঝে শুনে ওরা সেই ট্র্যাপে পা দিল। এবং লাশের রাজনীতি করার সুযোগটা করে দিল।

কারণ থাবা বাবার মনে ধর্ম সম্পর্কে এত ঘৃণা ছিল যে তাকে জানাজা পড়িয়ে সাচ্চা মুসলমান বানানোটা সে নিজেই বেঁচে থাকতে চাইত না।

আমি এই যুক্তি পড়েছি যে, এটা রাজীবর ফ্যামিলি চেয়েছে। চাইতেই পারে। তো তারা রাজীবরে তাদের দেশের বাড়ি বা এলাকার মসজিদে জানাজা পড়িয়ে তাদের গ্রামে কবর দিত? শাহবাগের আন্দোলনে এই লাশ নিয়ে শো ডাউন করার কি প্রয়োজন ছিল!

লাভ কী হইল? লাভ হলো ফারাবীর মতো বেইল ছাড়া পাবলিক থ্রেট দিল, সেটা ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়াতে এলো। প্রধানমন্ত্রী সেটারে আওয়ামীকরণ করলেন।

আমি জানি আমার কথায় রাজীবের যারা ঘনিষ্ঠ তারা নিশ্চয়ই কষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু মুভেমেন্ট কি বেনেফিটেড হলো? মুভমেন্টের শত্রুর জন্যে এই আনওয়ান্টেড মিডিয়া অ্যাটেনশানটা কি দরকার ছিল?

এই নিয়ে শুরু হয়েছে ধর্মীয় বিতর্ক। এখন নোট নাজিল হলো, কাফির-নাস্তিক-মুরতাদের মধ্যে জানাজা হয় কি হয় না এ নিয়ে। মুভমেন্ট? আমাদের মুভেমেন্টের কী হলো?

রাজীব হত্যার পরে একজন সিনিয়র ব্লগারকে দেখলাম, অন্যকিছু ব্লগারকে জড়িয়ে স্ট্যাটাস দিতে যে, ওই ব্লগারদের ইতিপূর্বে এক্সট্রিম লেফট পলিটিক্সের ইতিহাস আছে, যারা মানুষ হত্যা করে। হতভম্ব হয়ে সেটা পড়লাম। এইগুলোর মানে কী?

আজকে এই ডিসকাশান আসছে, ফেসবুক থেকে কোট করছি 'একটা দেশের সরকার এবং তাবৎ শক্তিশালী ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া একাট্টা হয়ে যখন একটা আত্মস্বীকৃত কুলাঙ্গার নাস্তিককে রাষ্ট্রীয় বীর বানাতে উঠে পড়ে লাগে, ইতরশ্রেণীর কতগুলো নাস্তিককে আমার পকেটের টাকা দিয়ে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নিরাপত্তা দেয়..।'

এখানে একটা আরগুমেন্ট আসতে পারে যে, আমার একটা সহযোদ্ধা যদি নিহত হয় তো সেটা নিয়ে যুদ্ধ করব না? আমি যদি মারা যাই তাহলে কি আপনারা আমাকে ভুলে যাবেন?

যারা এই যুক্তিটা দেয় তারা শাহবাগের প্রতি তাদের দায়িত্বের গ্র্যাভিটি বুঝেন নাই। একটা ক্ষোভ থেকে পুরো জাতি ঘুম ভেঙে জাগ্রত হয়েছে। দেশে-

বিদেশে পাড়ায় মহল্লায় মানুষ এখন শ্লোগান দিচ্ছে। ডাকটা আপনারা দিয়েছেন। আপনার আগের ডেডিকশনের জন্যে হোক আর আপনার সৌভাগ্যের জন্যে হোক আপনি এখন সেন্টারে আছেন। এখন আপনাকে আমার বৃহত্তর রোল নিয়ে ভাবতে হবে। একজন সহযোদ্ধা যার সাথে আপনি গত কাল টং-এ বসে চা খেয়েছেন, তাকে আজকে নৃসংশভাবে হত্যা করা হয়েছে, এখন কি তাকে আপনি ফেলে দেবেন? এটা যদি সত্যি বিপ্লব হয়ে থাকে তো তাই। বৃহত্তর আন্দোলনের স্বার্থে, তারে নিয়ে কান্নাকাটি করা যাবে না। সে হিউজলি কন্ট্রোভার্সিয়াল ক্যারেক্টার ছিল।

তাকে ব্র্যান্ডিং করতে গিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের ক্ষতি যদি হয় তো আপনার মুখ বুঁজে সেটা সইতে হবে। এটার থেকে যদি ব্যক্তিস্বার্থ আর গোষ্ঠীবদ্ধতাকে বেশি গুরুত্ব দেন তো আপনারা অনেক বড় একটা সম্ভাবনাকে তিরোহিত করলেন।

আজকে থেকে মাত্র দুই মাস আগে ইসরায়েলে একটা ইলেকশন হয়েছে। সেই ইলেকশনে একজন টকশো হোস্ট মাত্র এক বছর আগে দল গঠন করে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে পার্লামেন্টে বিরোধী দল হয়েছে। আমাদের দেশে এমন কিছু হতে পারত। মানুষ এখন পলিটিক্যাল সিস্টেমের উপরে এত বেশি ফ্রাস্ট্রেটেড যে আপনারা বড় কিছুর জন্যে নিজেরে প্রস্ত্তত করতে পারতেন। সময় সব বলে দিত। দেখেন, মাত্র কয়েকদিন আগের শুরু হওয়া শাহবাগ আজকে কত পালা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেল। তো সামনের সময়ের পরিবর্তন আরো কত কিছু হতে পারত। কিন্তু আপনারা ঐতিহাসিক সেই মুহূর্তে ক্লাস টেনের বালকের ইমোশন দেখালেন এবং ঐতিহাসিক মুহূর্তটা ধরতে পারলেন না।

এখন আমি ১৬ তারিখে রাজীব হত্যার পরেই যে ব্লগটা লিখে শাহবাগের বেশকিছু সিনিয়র অর্গানাইজারকে ট্যাগ করছিলাম, সেটা দিচ্ছি।

রাজীবর মৃত্যুর পরেই আমি একটা নোট প্রকাশ করি ১৬ ফেব্রুয়ারিতে। সেটা পড়েন।

ব্লগার থাবা বাবার হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে কিছু কথা

(প্রকাশ: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩)

এই আন্দোলনটা শুরু থেকেই ৩০০ মানুষের হত্যার দোষে দোষী সাব্যস্ত কাদের মোল্লার যাবজ্জীবন রায় দেয়ার ফলে বিচারব্যবস্থার যে গর্ভপাত ঘটেছে তার প্রতিবাদে একটা আন্দোলন। এই আন্দোলনের কখনও ধর্মীয় বা অ্যান্টিধর্মীয় চরিত্র ছিল না।

মাঝখানে অতি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী একটা পক্ষ কোনো ওয়ার্নিং ছাড়া মিডিয়াতে ঘোষণা দেয় যে, এটা ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধের জন্যে আন্দোলন। এর অন্যদিকে আমার দেশ গং আর বাঁশেরকেল্লা পার্টিও দেখাতে চাইছে, এটা আসলে বাংলাদেশে ইসলামের বিরুদ্ধে বামপন্থী নাস্তিকদের হাতে আওয়ামী লীগের প্রক্সি আন্দোলন।

আন্দোলনের মূল অর্গানাইজাররা মানুষের অভূতপূর্ব পারটিসিপেশনে আত্মহারা হয়ে টের পাচ্ছেন না, এই দুইটা পক্ষই তাদের নিজেদের অবস্থানটাকে আন্দোলনের মূল মেসেজ হিসেবে ডিফাইন করছে।

রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে বিযুক্ত করার বিতর্কটা একটা প্রয়োজনীয় বিতর্ক। নিকট অতীতের উদাহরণ বলে, ধর্ম দিয়ে রাষ্ট্রকে চালালে সেই রাষ্ট্র ফ্যাসিবাদী হয়ে ওঠে। সবচেয়ে বড় উদাহরণ, ইসরায়েল আর ইরান। এটার পক্ষেও আবার অনেক যুক্তি আছে। কিন্তু এটা একটা সেন্সিটিভ ইস্যু। বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিগত ২০ বছরে এই ইস্যুতে, এত বেশি অসততার ও এত বেশি পলিটিক্যাল গোল দেয়ার প্রবণতা দেখা গেছে যে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রশ্নের সাথে এই প্রশ্নটাকে না আনাটাই বিচার নিশ্চিত করার জন্যে মঙ্গলজনক।

কাদের মোল্লার যাবজ্জীবন রায় হওয়ার প্রাথমিক যে ক্ষোভ এবং তা থেকে উদ্ভূত গণজাগরণে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ সাড়া দিয়েছে এটা আমাদের জাতির জীবনে আনপ্রিসিডেন্টেড। কোনো নেতা ছাড়া, কোনো রাজনৈতিক দলের ব্যানার ছাড়া মানুষ কখনও এভাবে রাস্তায় নেমে আসে নাই। এই ক্ষোভের ডিসেকশান করলে দেখা যাবে ৩০০ মানুষ হত্যার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির যাবজ্জীবন রায়ের ফলে প্রকাশ পাওয়া অবিচার এবং পলিটিক্যালি মোটিভেটেড জাজমেন্টের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করাটা ছিল মানুষের অন্যতম প্রধান চাওয়া। প্রাথমিকভাবে এটাই ছিল আন্দোলনের প্রধান স্পিরিট।

এটা এইজন্যে বলছি যে, আজ থাবা বাবার দুঃখজনক হত্যাকাণ্ডের পর আবার এই দুইপক্ষ যথেষ্ট রসদ পাবে তাদের নিজেদের পক্ষে। থাবা বাবা একজন খুবই

র‍্যাডিক্যাল নাস্তিক ছিলেন। আজ তার মৃত্যুতে, তার অনেক লেখা সামনে আসবে যেটা দেখে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা আঁতকে উঠবে এই চিন্তা করে, আসলেই তো সোনাব্লগের বাঁশেরকেল্লা গ্রুপ বা আমার দেশ তো ঠিকই বলেছিল।

অন্য দিকে, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার পক্ষের ব্যক্তিরা বলবে, যারা বিরুদ্ধ মতের মানুষকে এভাবে জবাই করে, তাদের প্রতিহত করা জরুরি। ওদের দেখামাত্র গুলি করতে হবে।

এবং এই আস্তিকতা এবং নাস্তিকতা বিতর্ক, এবং এই ধর্মপক্ষ ও ধর্ম নিরপেক্ষতার বিতর্ক এখন এই আন্দোলনের সাথে আর গভীরভাবে সংযুক্ত হবে, যেটা ছিল সোনাব্লগ গ্রুপ আর আমার দেশ গ্রুপের প্রধান চাওয়া।

অথচ, এই আন্দোলনে কখনও কোনো ধর্মীয় চরিত্র ছিল না। এটা বিচারহীনতার বিরুদ্ধে, জাস্টিসের রাজনীতিকরণের বিরুদ্ধে, ৪১ বছর ধরে না হওয়া একটা বিচারকে অবিতর্কিতভাবে সঠিক রায় দিয়ে সমাধান করার জন্যে একটা আন্দোলন।

অন্য একদিক থেকে যদি দেখি, এইটা আমাদের টোটাল বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানুষের অনাস্থার প্রকাশ। শাহবাগ আন্দোলনকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আদালত অবমাননাও বলা যায়। আমাদের জাস্টিস সিস্টেম, সারা পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বলে মতামত দিয়েছে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

যদিও এখন কেউ এই নিয়ে খুব একটা চিন্তিত নয়, এবং এই নিয়ে তেমন কোনো কথা আসে নাই, কিন্ত শাহবাগ আন্দোলনের একটা অন্তর্নিহিত চাওয়া হলো, আইনের শাসন এবং ফেয়ার জাস্টিস সিস্টেমের জন্য আমাদের আকুতি প্রকাশ। যেটা নাই বলেই আজ কাদের মোল্লার ফাঁসি চেয়ে আমাদের রাস্তায় নামতে হয়েছে। যে বিচার ব্যবস্থা ঠিক থাকলে কাদের মোল্লার অবশ্যই ফাঁসি হত। যেটা নাই বলে, আজ এভাবে একজন মানুষ সে ব্লগার হোক, নাস্তিক হোক, বা আস্তিক হোক—এভাবে বাড়ির সামনে জবাই হয়ে যেতে পারে এবং নিশ্চিতভাবে যার কোনো বিচার হবে না।

এই হত্যাকাণ্ড সকল দিক থেকে আন্দোলনের জন্যে একটা বড় আঘাত। এবং এর লং টার্ম ইমপ্লিকেশন সকল দিক থেকে অশুভ। এই হত্যাকাণ্ডের কারণে

অনেকেই অনেক ফাঁদ পাতবে৷ আন্দোলনের অর্গানাইজারদের এই ট্র্যাপগুলোকে দেখে, পথ চলার এবং পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে সতর্কভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার অনুরোধ করছি৷

২৪ ফেব্রুয়ারি

আমার একটা ফেসবুক স্ট্যাটাস

In any moral debate when you are claiming moral high ground, if you allow slightest bit of lies and falsehood in your argument, in course of time that lie will fully encompass your stand and you will slowly cease your moral superiority to your adversaries in the eyes of the neutrals.

২৫ ফেব্রুয়ারি

এই সময়ে সারাদেশ থেকে বিভিন্ন জায়গায় হামলা এবং পুলিশের গুলি করা এবং সন্ত্রাসের ঘটনার নিউজ আসতে থাকে৷ এবং বিশেষত পুলিশের গুলি করার ছবিটা খুবই সহজ একটা দৃশ্য হয়ে যায় টিভিতে যা আমাদের অনেককে শঙ্কিত করতে থাকে৷ বিশেষত গুলি করার পুলিশের ডিউ ডিলিজেন্সের অভাবটা আমাদেরকে বেশি শঙ্কিত করে৷

এই সময়েই রাবার বুলেট শব্দটার সাথে আমরা বেশি পরিচিত হয়ে উঠি৷

এই সময়ে একটা ছেলেকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করার একটা ভিডিও নেটে আসে৷ এবং আমি এটা নিয়ে প্রতিবাদ করে একটা স্ট্যাটাস দেই৷ আমার এক বন্ধু কমেন্ট করেন যে ছেলেটা তো রাবার বুলেট খাইছে, মরে নাই৷ আমি এটার প্রতিবাদ করি৷

এবং এটা তখন প্রতীয়মান হয় সমাজের একটা বড় অংশের মানুষের মনে একটা মাইন্ডসেট জন্মেছে তা হলো, যে কোনো মানুষকে গুলি করার পর, সেটা যদি জামায়াত-শিবির মেরেছে বলা হয়, তাহলে আর প্রতিবাদ করার দরকার নাই৷ এবং কোনো ধরনের ডিউ ডিলিজেন্স ছাড়া বাংলাদেশে বিক্ষোভকারীদের ওপর রাবার বুলেট ছোঁড়া যায়৷

ফারাবীকে ঢাকার গোয়েন্দা পুলিশের কাছে হস্তান্তর: প্রথম আলো

শাহবাগ পর্ব ৯. দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর রায়ের পরের স্টেজ

২৮ ফেব্রুয়ারি

মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর রায় ঘোষণা করা হয়। এবং তাতে দেলোয়ার হোসেন সাঈদীকে ফাঁসির আদেশ দেয়ার পর দেশব্যাপী ব্যাপক সহিংসতা হয়।

প্রথম আলো

দেশজুড়ে জামায়াতের ব্যাপক সহিংসতা: নিহত ৩৫

প্রথম আলোর এই রিপোর্টে, দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর ফাঁসির রায়ের পর রংপুর, গাইবান্ধা, নোয়াখালী, ঠাকুরগাঁও, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, দিনাজপুর, নাটোর, কক্সবাজারসহ দেশের নানা অঞ্চল থেকে ব্যাপক সহিংসতার খবর দেয়া হয়।

আমার দেশ

অগ্নিগর্ভ দেশ, গুলিতে নিহত ৫৬: পুলিশের নারকীয় হত্যাযজ্ঞ, একদিনে গুলি করে মানুষ খুনের রেকর্ড, বিভিন্ন স্থানে জামায়াত-শিবিরের প্রতিরোধ, নিহতদের মধ্যে পুলিশ চারজন, চাঁপাইয়ে প্রতিমন্ত্রীর বাড়ি-গাড়িতে আগুন, সাতকানিয়া লোহাগাড়ায় থানা অবরোধ

রবি ও সোমবার ৪৮ ঘন্টার টানা হরতাল: গতকাল ঢাকায় দিনে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ রাতে হামলা

এরপর ৩, ৪ এবং ৫ মার্চে হরতাল দেয়া হয়। সেই হরতালে সারা দেশে ব্যাপক ভাংচুর, সরকারি অফিসে হামলা আর হিন্দু সম্প্রদায়ের উপরেও হামলা হয়।

আমি এখন আর এই সব নিয়ে আর ডিটেলসে যাবো না। এই সময়ের মধ্যে শাহবাগ মোটামুটি মৃত। বলে রাখা ভালো, শাহবাগকে ঘোষণা দিয়ে বন্ধ করার পরদিন ঢাকায় জুমার নামাজের পর যখন সংঘাত হয় তখন আবার শাহবাগ চালু করা হয়।

শাহবাগের মঞ্চটা তখন আছে। অল্প কিছু লোকের উপস্থিতিতে শাহবাগে কিছু স্টেজ শো ডেইলি হচ্ছে। কিন্তু গুরুত্বের দিকে শাহবাগ তখন সাইড শো। এবং সরকারের সাথে বিএনপি এবং জামায়াতের মূল লড়াই এবং মাহমুদুর রহমানের কাউন্টার রেভলিউশান তখন বাংলাদেশের পলিটিক্যাল সিনারিওর প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ ভুলে গেছে মাত্র ১ মাস আগে, শাহবাগ নিয়ে কি অসাধারণ উচ্ছ্বাস হয়েছিল। বিগত যৌবনা শাহবাগে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন ইস্যুতে কিছু টিভির সামনে আসে ইমরান সরকার।

দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর সাঈদীর রায়ের পরে এই দেশব্যাপী বিক্ষোভ এবং

বাংলাদেশ অস্থিতিশীল হয়ে যাওয়ার এই বিষয়টা নিয়ে আমি ডিটেল একটা নোট লিখি। যে নোটে এই সময়কার দ্বন্দ্বগুলো নিয়ে একটা পরিষ্কার ধারণা পাবেন।

নোট ১০. এটা কোনো গৃহযুদ্ধ নয়। ঠিক এই সিচুয়েশনটাই তারা চেয়েছিল। তাদের গেম প্ল্যান মতোই খেলা চলছে।

এপিক ক্যাচাল পার্ট ৬

(প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০১৩)
আমার একজন ফ্রেন্ড এই নীচের কমেন্টটা করেছিল। আমার এই ফ্রেন্ডকে আমি চরম বাঙালি জাতীয়তাবাদী বলে জানতাম। তার কাছ থেকে এই কমেন্ট আমার কাছে অপ্রত্যাশিত মনে হয়েছিল।

'আমি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চেয়েছিলাম। কিন্তু গত কদিনের ঘটনা প্রবাহে আমি যেটা বুঝতে পারলাম—আমার এই চাওয়ার সাথে দেশের অতি বড় একটা জনগোষ্ঠী একমত নন। এই পরিমাণ জীবনের বলিদান দিয়ে যদি এই বিচার করতে হয়, তাহলে বুঝতে বাকি থাকে না যে মানুষ এটি চায় না। আর যদি চেয়েও থাকে তবে এতো প্রাণের আত্মদানের সাথে এই চাওয়ার যৌক্তিকতা বিনষ্ট হয়ে গেছে। অন্তত আমি আজ তাই মনে করি। আজ আমি অত্যন্ত ব্যথিত। আমি এদেশের নাগরিক হিসেবে আর গর্ববোধ করতে পারছি না। দয়া করে এই বিচার বন্ধ করেন। বন্ধ করেন জীবন দেওয়া আর নেওয়ার এই অমানবিক দুঃখজনক খেলা। সেই বিপ্লব আমি চাইনা, যে বিপ্লব আমার এবং আমার পরিবারের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করবে, যে বিপ্লব জাতিকে গৃহযুদ্ধ সুলভ অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেবে। আমি আমার আত্মিক, আদর্শিক ও নৈতিক দায়বদ্ধতাকে আজ হত্যা করলাম। সরকারকে, জামায়াত-শিবিরকে, বিএনপি কে। সবার কাছে আমার করজোড় মিনতি—আপনারা এই সব বন্ধ করেন। প্রয়োজন পড়লে ট্রাইব্যুনাল বাতিল করেন। সমগ্র জাতি যেদিন একত্রিত হতে পারবে, সেইদিন বিচার করবেন; অন্যথা 'অফ যান'।

এটার উত্তরে আমি এই লেখাটা লিখেছি—''তোমার বক্তব্যের সাথে দ্বিমত করলাম।ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে এই বিচার হওয়াটা খুব জরুরি।''

৩০ লক্ষ মানুষের হত্যার জন্যে যারা দায়ী তাদের অবশ্যই বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে, শাস্তি পেতেই হবে। নইলে রাষ্ট্রের নৈতিকতার ভিত্তি থাকে না। অনেকে এই বিচারকে ইমোশনের ভিত্তিতে দেখেন। কিন্তু আমি এই বিচারকে শুধুমাত্র নৈতিকতার ভিত্তিতে দেখি। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের সময় ৩০ লক্ষ শহীদের প্রাণহানির এবং ১৪ ডিসেম্বর জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যার জন্যে যারা দায়ী, তাদের অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। এবং তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি কাম্য।

শাহবাগের গণজোয়ার প্রমাণ করে এই চাওয়াটার ব্যাপারে দেশের অধিকাংশ মানুষ একমত।

সমস্যা হচ্ছে, যারা বিচারটা করছেন তাদের নিয়তে বড় সমস্যা আছে।

তারা এই বিচারটা এমনভাবে করতে চান যাতে তাদের সব অন্যায়-দূর্নীতি অবিচার ঢাকা পড়ে যায় এবং এই বিচারের ধূঁয়া তুলে দেশকে বিভাজন করে, তারা যাতে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে পারেন। এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গুটি চালছেন, এমনকি তারা যুদ্ধাপরাধীদের সাথেই আঁতাত করছেন। বিচার নিয়ে তাদের বিভিন্ন কার্যকলাপের প্রেক্ষাপটে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অবজেকটিভলি এবং অ্যাবসলুটলি ফেয়ার হচ্ছে কি না তা নিয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করছেন। সন্দেহটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যখন কাদের মোল্লা যে ৩০০ মানুষ হত্যার অপরাধে পরিষ্কারভাবে কনভিক্টেড ছিল, তার রায় ফাঁসি না হয়ে যাবজ্জীবন হয়, যেখানে তার আগের বাচ্চু রাজাকার তার থেকে হালকা অপরাধে ফাঁসি পায়।

শাহবাগ মুভমেন্টের দুটি জায়গায় আমি চরমভাবে দ্বিমত করি।

একটা হলো, তারা বলেছেন যে, এই ট্রাইব্যুনাল নিয়ে প্রশ্ন করা যাবে না। তাতে বিচার প্রশ্নবিদ্ধ হবে। এবং যারা ওই প্রশ্ন করবে তারাও রাজাকার, অথচ যেখানে শাহবাগের জন্মই হইসে আঁতাতের রায়ের প্রতিবাদ করে।

ব্যাপারটা এমন হলো যে, কেউ রেপ করল, তখন বলা হচ্ছে রেপের প্রতিবাদ করা যাবে, কিন্তু শিশ্ন কোনো ভুল করে নাই এবং যে মানুষটা রেপ করেছে তাকেও আমি দোষ দিতে পারব না—যেটা একটা হাস্যকর প্রস্তাবনা।

যেখানে স্কাইপ কেলেঙ্কারিতে ক্লিয়ারলি এসেছিল সরকার কিভাবে ট্রাইব্যুনালকে মোটিভেট করছে। এমনকি বিচারক রায় দিলে সুপ্রিম কোর্টে নিয়োগ পাবে এমন সব চরম কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট টাইপের কথাও আসছে।

কিন্তু আমাদের মিডিয়া ইস্যুগুলো বাইপাস করে গেছে। এবং বিচারপন্থী অ্যাক্টিভিস্টরা এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করাকে ব্লাসফেমি হিসেবে দেখিয়েছেন।

এটা কিন্তু এই বিচারের বিরোধীদের মোরাল পজিশন শক্ত করেছে।

এটা তাদের কাছে প্রুফ করেছে, এই বিচারের পক্ষের লোকেরা তাদের সুবিধার জন্যে যে কোনো রকম অসত্যের আশ্রয় নিতে পারে। তারা কিন্তু এই আরগুমেন্টকে বাইপাস করেন নাই, তাদের মনে প্রোথিত হয়েছে সেটাই যেটা আমার দেশ গ্রুপ প্রচার করছিল—নিরপরাধ মানুষকে সরকার রাজনৈতিক কারণে ফাঁসি দিচ্ছে। এবং এই আরগুমেন্টগুলো দিয়ে তারা তাদের সাপোর্ট বেজ ফেনিয়ে তুলতে পারছেন।

থাবা বাবাকে নিয়েও বিচারপন্থী অ্যাক্টিভিস্টদের ব্যাপক মিথ্যাচার করতে দেখেছি আমি নিজেই। দেখো, যখন একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বা তখন তোমার মরাল পজিশনে এক বিন্দু মিথ্যার স্থান দিতে পারবে না। তাহলে তোমার মূল মোরাল পজিশনটাই প্রশ্নবিদ্ধ হবে।

আরও একটা ইম্পর্ট্যান্ট বিষয় হইল, দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর প্রশ্নটা এই রায়ে ইসলামকে নিয়ে এসেছে, তার আগে কিন্তু এই বিচারে ইসলাম কোনো বিবেচ্য অ্যাঙ্গেল ছিল না।

দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর ইস্যুটা সবচেয়ে কমপ্লিকেটেড। কারণ দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর জামায়াত পরিচয়ের আগের একটা পরিচয় আছে—তিনি সারা বাংলাদেশে ঘুরে বেড়ানো খুবই জনপ্রিয় ইসলামিক বক্তা। তার নিজস্ব একটা ফলোয়ার গ্রুপ আছে। তার এক একটা ওয়াজে এক দেড় লক্ষ লোক আসা কোনো ব্যাপার না। এবং সবার মধ্যে এই সাঈদীর বিচার প্রসেসে অনেক ইস্যু আসছে, যেগুলো স্কাইপ কেলেঙ্কারিতে উঠে এসেছিল—যেগুলো অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। প্রশ্নগুলো কিন্তু কেউ উত্তর দেয় নাই।

প্রশ্নগুলো হয়তো ভুল, কিন্তু উত্তর না দেয়াতে রায়ের বিরোধীদের আরগুমেন্ট আরো শক্ত হইছে যে, এটা একটা ইসলামের বিরুদ্ধে বিচার। এই অ্যাঙ্গেল আমার দেশ গ্রুপ খুঁচিয়ে অনেক বড় করে তুলছে। আমার দেশ কিন্তু জাতীয়তাবাদী গ্রুপ, ইসলামিক গ্রুপ না। এই কথাটা এখানে বলার উদ্দেশ্য, ধর্মপন্থী উপদলগুলোকে 'এই বিচার যে ইসলামের বিরুদ্ধে বিচার' তাই বলে

খুঁচিয়ে তুলেছে আমার দেশ গ্রুপ, কেবল তাদের রাজনৈতিক এবং ভোটের পলিটিক্সের অবস্থানের কারণে।

বাচ্চু রাজাকারের রায়ের পর কিন্তু এই বিক্ষোভ হয় নাই, কিন্তু সাঈদীর রায়ের হয়েছে। এটা নিশ্চিতভাবে জামাতি আর শিবিরের অর্গানাইজ করা। কিন্তু দেশে যে লক্ষ লক্ষ লোক এখন বিক্ষোভ করছে এদের বড় একটা অংশ ইসলামিক আদর্শের অনুসারী যাদের তৌহিদী জনতা বলাটাই সহজ। তারা কিন্তু জামায়াত নন। বাংলাদেশে এত বড় বিক্ষোভ ঘটানোর মতো সমর্থন জামায়াতের নাই বলেই আমরা জানি।

এই তৌহিদী জনতা তাদের বিক্ষোভকে বাংলাদেশে নাস্তিকদের হাত থেকে ইসলামকে রক্ষার করার লড়াই হিসেবে দেখছে।

যারা গণহত্যা, ধর্ষণসহ আরো ভয়াবহ অন্যায়ের সাথে যুক্ত ছিল তাদের সমর্থন নিয়ে বাংলার জনপদ বিভক্ত হবে এটা আমি বিশ্বাস করি না। ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। আমার দেশ এবং অন্যান্য মিডিয়াতে ট্রাইবুন্যাল নিয়ে এবং স্কাইপ কেলেঙ্কারী নিয়ে যে বিষয়গুলো এসেছে তাতে তারা এখন বিশ্বাস করে এই ট্রাইবুন্যাল ফেয়ার নয়। সাঈদীর মতো একজন ইসলামিক বক্তা, যাকে তারা একজন আলেম হিসেব জানে, তাকে মুক্ত করার ঈমানী দায়িত্ব থেকে ভাংচুরে অংশগ্রহণ করেছে তারা। এটা তাদের কাছে জিহাদ সমতুল্য।

গত কয়েকদিন অনেক স্থানে পুলিশের উপর হামলা হয়েছে, সংখ্যালঘুদের উপর হামলা হয়েছে, এবং মন্দির ভাংচুর হয়েছে, থানা-পুলিশ লুটপাট হয়েছে। এটা নিশ্চিতভাবে একাত্তরের প্রেতাত্মা জামায়াত এবং শিবিরের কাজ। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় বিদ্বেষ ফেনিয়ে তোলা। কিন্তু এই তৌহিদী জনতা বলতে যাদের বোঝাচ্ছি, তারা কিন্তু জামায়াত-শিবির এবং আমার দেশ গ্রুপের প্রোপাগান্ডায় বিভ্রান্ত হয়ে নামসে। এরা এত সরল যে অনেকেই বিশ্বাস করে সাঈদীর চেহারা চাঁদে দেখা গিয়েছিল!

এরপর সেকুলার মিডিয়া অনেক জায়গায় তাদের বিক্ষোভ মিছিলে গুলি হওয়ার পর, এতগুলো মৃত্যুকে পুলিশের উপর হামলার পর পুলিশের আত্মরক্ষার হামলা বলে জাস্টিফাই করছে, সেটা তাদের দিনে দিনে আরো ক্ষুব্ধ করেছে। সরকার মিডিয়া ফেসবুকার সবাই এই অ্যাঙ্গেলটা কালেক্টিভলি বাইপাস করছে।

আমি বিশ্বাস করি এই গ্রুপটা একটা ফেয়ার ট্রায়াল হলে সাঈদীর হয়ে রাস্তায়

নামত না।

স্বাধীনতার ৪২ বছরেও ৩০ লক্ষ শহীদের হত্যার দায়ে অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না হওয়াটা আমাদের জাতির জন্যে একটা কলঙ্ক।

এই কলঙ্কের দায় মুক্তির ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের জন্য সাধুবাদ আওয়ামী লীগকে দিতে হবে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ এই বিচার চায়। কিন্তু আমরা দেখেছি, সরকার তাদের সব দূর্নীতি, সব অন্যায়কে এই বিচারের ঢাল দিয়ে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছে। তবুও বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ এই বিচারে সরকারের সাথে ছিল। স্কাইপ কেলেঙ্কারিতে যে সব কথা এসেছে সেটা নিয়ে মানুষ চুপ করে ছিল। এমন কি কাদের মোল্লার আঁতাতের রায়ের ফলে সৃষ্ট শাহবাগ মুভমেন্টের স্ট্যান্ড ছিল—ট্রাইব্যুনালকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না এবং ট্রাইব্যুনালের উপর সরকারের হস্তক্ষেপ নিয়ে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না। তাহলে ট্রাইব্যুনাল বিতর্কিত হবে এবং যুদ্ধাপরাধীদের হাত শক্ত হবে যার ফলে পরবর্তী বিচার প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হবে। আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে, কাদের মোল্লার বিচারের রায়ের আগ পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালের ভুল ত্রুটিগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার একটা জাস্টিফিকেশন ছিল। কিন্তু কাদের মোল্লার প্রহসনের রায়ের পর, সেই ট্রাইব্যুনাল নিয়ে প্রশ্ন না তোলার স্ট্যান্ডটা ঠিক ছিল না।

গত কয়দিনের সহিংসতার প্রেক্ষাপটে আমার অভিমত আরও দৃঢ় হয়েছে যে, সেই স্ট্যান্ডটা ঠিক ছিল।

কারণ, এখন যে ক্ষোভ হচ্ছে তাদের মূল জায়গা হলো তারা কনভিন্সড যে, বিচার নিরপেক্ষ নয়। এখন দেশ আরো বিভক্ত হয়েছে এবং এই বিভাজনের মূল জায়গা হলো ট্রাইব্যুনাল সৃষ্ট নিরপেক্ষতার বিতর্কগুলো। অথচ দেশের ৯৭% মানুষ এ বিচারের পিছনে ঐক্যবদ্ধ বলে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু যে প্রক্রিয়ায় বিচার করা হয়েছে তাতে অনেক বড় একটা গ্রুপকে আজ মোটিভেটেড করা যাচ্ছে যে, এটা একটা পলিটিক্যাল উদ্দেশ্যে বিচার। আমার দেশ গংয়ের এই প্রোপাগান্ডা হালে পানি পাচ্ছে কারণ যুক্তিগুলো একেবারে পানিতে ফেলে দেয়ার মতো নয়।

যারা যুক্তিগুলো কি জানেন না, প্লিজ রিড ডেভিড বার্গমেন http://bangladeshwarcrimes.blogspot.com/ আমাকে গালি দিয়েন না। আমি

এইগুলো বলি নাই। বলছিও না। ডেভিড বার্গমেন একজন সুপরিচিত সাংবাদিক। উনি ট্রাইবুন্যালকে প্রথম দিন থেকে কাভার করেছেন। চ্যানেল ফোর-এর বিখ্যাত ডকুমেন্টারি, যেটাতে বুদ্ধিজীবী হত্যায় নেতৃত্ব দানকারী মইনুদ্দিন রাজাকারের চেহারা উন্মোচন হয়েছে, সেটা ডেভিড বার্গমেনের তৈরী। ফলে তাকে আপনি জামাতি পেইড বলে বাতিলও করে দিতে পারবেন না।

আমাদের তথাকথিত সুশীল সমাজ এমন কি আমাদের শাহবাগের হিরোরাও এই প্রশ্নগুলো ইগনোর করে গেছে। ফলে ডে বাই ডে আমরা যারা বিচার চাই, আমরা আওয়ামী লীগের গুটিতে পরিণত হয়েছি। আওয়ামী লীগ এখন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলছে। আওয়ামী লীগ যে ন্যারেটিভ দিয়েছে তার বাহিরে যে কোনো বক্তব্যকে আজ জামায়াত সিমপ্যাথাইজিং হিসেবে দেখা হচ্ছে। এবং ছাগু বা রাজাকার ডাকা হচ্ছে। ফলে বুঝতে পেরেও পার্সোনাল অ্যাটাকের ভয়ে অনেকে কথাগুলো বুঝেও বলতে পারছেন না।

আজকে সাম্প্রদায়িক হামলা, হিন্দুদের উপর আক্রমণ, মন্দিরে আক্রমণ, মিছিলে গুলি, বিএনপি জামায়াতের হরতালে অংশগ্রহণ করাসহ অনেকগুলো ইস্যুতে সিচুয়েশন ক্রমেই জটিল হচ্ছে। মূল প্রশ্নগুলো আর ইম্পর্ট্যান্ট থাকছে না।

এই সাব-প্লটগুলো এখন আরো নতুন নতুন কনফ্লিক্টের ক্ষেত্র তৈরি করছে।

এবং সাব-প্লটগুলো মূল থেকে বড় বিভাজনের জায়গা তৈরি করতাসে। একদিকে পুলিশের হাতে বিক্ষোভকারী মানুষ মারা যাচ্ছে, যেটা আবার মিডিয়া লুকিয়ে রাখতে চাইছে, ফলে রায়ের বিপক্ষের অংশের ক্ষোভ আরো বাড়ছে। অন্যেদিকে তাদের বিক্ষোভে জাতীয় পতাকা পুড়ছে, মন্দির পুড়ছে, পুলিশকে মারা হচ্ছে। ফলে একপক্ষ এটাকে দেখছেন আরেকটি মুক্তিযুদ্ধের অ্যাঙ্গেল থেকে, দেশকে ধর্মান্ধতা থেকে রক্ষা করার অ্যাঙ্গেল থেকে, আমাদের বাঙালিত্বকে রক্ষার অ্যাঙ্গেল থেকে, বাংলাদেশকে পাকিস্তানে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করার যৌক্তিকতা থেকে। ফলে অনেকগুলো মানুষের মৃত্যুতেও তারা নিশ্চুপ থাকছেন।

এখন বিচারের প্রশ্ন আর ইম্পর্ট্যান্ট থাকছে না। অথচ বিচারটাই সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট ইস্যু। ঐটা ফেয়ারলি অবজেক্টিভলি না হওয়াটাই আজ সব কিছুর

সোর্স। ফলে ঘুরে ফিরে এর জন্যে সরকার দায়ী, যে সরকার আমাদের এত বছরের দাবি যুদ্ধাপরাধের বিচারকে পলিটিক্যাল গেম হিসেবে নিয়ে খেলছে।
এই বিচারের সাথে অনেক মানুষের সেন্টিমেন্ট জড়িত। এবং অনেক মানুষ পুরো জিনিসটা সেন্টিমেন্টালি দেখছে। পক্ষে-বিপক্ষে উভয় সাইডই।
কিন্তু এটা জাস্টিস আর ন্যায়ের বিষয়। এটা সেন্টিমেন্টের বিষয় না।
যারা সেন্টিমেন্টের দিক দিয়ে দেখছেন তাদের এই বিচারের সবকিছু সমর্থন করে যাওয়া বাদে অন্য কোনো উপায় থাকছে না ফলে তারা তাদের যুক্তিবুদ্ধি সরকারকে বন্ধক দিয়ে রেখেছেন। সরকারি ন্যারেটিভের বাহিরে চিন্তা করতেও ভয় পাচ্ছেন, জামায়াতের পক্ষে চলে যাচ্ছেন এই ভয় থেকে। কিন্তু এটা জাস্টিস আর ন্যায়ের বিষয়। এটা সেন্টিমেন্টের বিষয় না।
জাস্টিস আর ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে হলে এই বিচার অবশ্যই হওয়া উচিত। ৩০ লক্ষ মানুষের হত্যার বিচার হবে না এটা হতে পারে না এবং এখনি সুযোগ, পরে-টরে না। এখুনি। কিন্তু আবার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হলে ট্রাইব্যুনালের সবকিছু অন্ধভাবে মেনে নেয়া উচিত নয়। প্রশ্নগুলো জবাব দেয়া উচিত, ইস্যুগুলো অ্যাড্রেস করা উচিত।
আমার কথা হলো, দেশকে যদি ইউনাইটেড করতে হয়, তো ফেয়ার ট্রায়ালের প্রশ্নে অবিচল থাকতে হবে। তাহলে সব সমস্যা মিটে যাবে। অনেকে বলবেন, এটা এত সিম্পল না, কিন্তু আসলে এটা এতই সিম্পল।
অনেস্টি, ইকুয়ালিটি এবং ন্যায় বিচার।
আর যদি পলিটিক্যাল পার্টির দাবার গুটি হয়ে চলতে হয়, তো এখন যা হচ্ছে, তাই তো হওয়ার কথা ছিল।
তাছাড়া এমন কিছু মানুষ মারা যায় নাই। মাত্র ৫০। তাজরীন গার্মেন্টসের আগুনে ১১২ জন শ্রমিক মারা গিয়েছিল। একটা লঞ্চডুবিতেও বাংলাদেশে ৫০০ লোক মারা যায়। এতে তাদের কিছু যায় আসে না। সো পলিটিক্যাল ন্যারেটিভে যদি বিশ্বাস করো তাহলে আপসেট হওয়ার কিছু নাই। ঠিক এই সিচুয়েশনটাই তারা চেয়েছিল। তাদের গেম প্ল্যান মতোই খেলা চলছে।

আমার এই লেখার সাথে আমি আরেকটা আরগুমেন্ট যোগ করি যেইটা শাহবাগের সাথে জড়িতদের একটা গুরুত্বপূর্ণ আরগুমেন্ট। যেই আরগুমেন্টটা

আমি কখনোই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করি নাই। কিন্তু আমি আরগুমেন্টটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। তাই বলছি।

এই আরগুমেন্টটা বলে, বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা কখনই নিরপেক্ষ ছিল না। এবং কখনই পারফেক্ট ছিল না। বরং সব সময়েই ত্রুটিপূর্ণ ছিল। ফলে এতোদিনের একটা ত্রুটিপূর্ণ বিচারব্যবস্থা হঠাৎ ঘাতক দালালদের বিচার করার সময় ফুলের মতো পবিত্র হয়ে যাবে সেইটা আশা করাটা ভুল।

এই জন্যেই তারা বলেন যে আন্তর্জাতিক মানের বিচার বলে কিছু নাই। বাংলাদেশের বিচার বাংলাদেশের মানের হবে। এই যুক্তিটা বলে, ১/১১ এর সুশীল মিলিটারি সরকারও কিন্তু একজন বড় দুর্নীতিবাজকে প্রসিকিউট করে শেষ করে যেতে পারে নাই। তারাও কম্প্রমাইজ করছে। তাদের বিপুল সাপোর্ট ছিল আমেরিকার, জনগণের। কিন্তু পারে নাই। তাছাড়া সুষ্ঠু বিচারের নজির আমরা দেখি নাই বাংলা ভাই বা শায়খ আব্দুর রহমানের বেলায়।

সুষ্ঠু বিচারের দাবিটা একদিনে অর্জন সম্ভব না। এর জন্য যে উন্নতি দরকার সেটা করতে পারে নাই সরকার। তারা প্রথম দুই বছর সময় নষ্ট করেছে। ভালো প্রসিকিউশন টিম তৈরি করতে পারে নাই। প্রসিকিউশন টিমের লোকবল কম ছিল। শেষ বছরে এসে তড়িঘড়ি করছে। এই ট্রাইব্যুনাল প্রথমবারের মতো আমাদের বিচার বিভাগে বড় ধরনের রিফরমের জরুরত বুঝায়ে গেছে।

আমি আবার উচ্চারণ করতে চাই যে আমি একজন রিয়ালিস্ট। কিন্তু রিয়ালিস্ট হয়েও এই আরগুমেন্টটা আমি গ্রহণ করিনি। কারণ একটা বিচার ব্যবস্থায় প্রসিডিউরাল ভুল হতে পারে কিন্তু, পারপাসফুলি একটা বিচারকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার এবং এবিউজ করা আমার কাছে গ্রহনযোগ্য মনে হয় নাই। কেন সেইটা আমি উপরের নোটটাতেই ব্যাখ্যা করেছি।

ক্রিটিক্যালি দেখতে গেলে সাঈদীর রায়ের পরে দেশব্যাপী এই সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনার পর শাহবাগ থেকে মানুষের নজর সরে যায়। এবং বিগতযৌবনা গণজাগরণ মঞ্চ গুরুত্ব হারিয়ে সরকারের পলিসি মেকারদের একটা হাল্কা গুটিতে পরিণত হয়। সেই গুটিটা উপরের থাকে তুলে রাখা হয়। এবং বিশেষ বিশেষ সময়ে সরকার বিপদে পড়লে দাবার বোর্ডে একটা নতুন চাল দেয়া হয়।

চ্যাপ্টার ১৭. শাহবাগের অন্তরের প্রতিরোধের স্বর

শাহবাগের পর্ব ৯. রুমি স্কোয়াড: শাহবাগের ক্ষীণ প্রতিরোধ

আমরা এখন ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে চলে যাবো ২৬ মার্চে। এর মধ্যে অনেক কিছু হয়েছে শাহবাগে। কিন্তু তার সব মঞ্চ ক্যাপচার স্টেজের ধারাবাহিকতা।

এই দিন ভালো জনসমাগম হয়। এবং ২৬ মার্চে ছিল, জাগরণ মঞ্চের পূর্বের ঘোষিত আল্টিমেটামের লাস্ট দিন। ফলে,জাগরণ মঞ্চ নিজেও এই দিন একটা চ্যালেঞ্জের মুখে ছিল।

আল্টিমেটাম পার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু দাবি পূরণ হয় নাই এবং তার প্রেক্ষিতে মঞ্চ কি করে সেইটা একটা দেখার বিষয় ছিল। জাগরণ মঞ্চ যদি আসলেই সিরিয়াস কোন এন্টিটি হয়ে থাকে তবে তার নিজের দাবি ২৬ মার্চের আলটিমেটামের দিন পার হয়ে গেলে কি পদক্ষেপ নেয় তা নিয়ে অনেকের আগ্রহ ছিল।

কিন্তু, যথারীতি সময়ের অমোঘ নিয়মে ২৬ মার্চ পার হয়ে যায়। ২৬ মার্চে মঞ্চ থেকে কিছু কর্মসুচির ঘোষণা দেয়া হয়।

ইতিমধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে শাহবাগ জনতার হাতে নেই। এবং শাহবাগের সাথে সংযুক্ত যাদের মধ্যে BOAN-এর বাহিরের স্বকীয় সত্তা ছিল, তাদের মধ্যে এক এক জন এক এক কারণে চুপ মেরে গেছে।

এবং শাহবাগের ভেতরের শুদ্ধস্বরেরা হার মেনেছেন। শাহবাগ থেকে যা যা দাবি জানানো হয়েছিল, তা পূর্ণ হয়নি। জনতা অপসৃয়মান। মানুষ বুঝতে পারছে শাহবাগ তখন ব্যবহৃত হচ্ছে। আমিও শাহবাগকে তেমনভাবে অনুসরণ করতাম না। অফিসে ব্যস্ত হয়ে গেছি।

এই সময়ের নিউজপেপার পর্যালোচনা করলে দেখবেন বেশ কিছু স্বর এই সময় ধীরে ধীরে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। কিন্তু তারা অনেক লেট। প্রথম রাতে তারা বিড়াল মারেন নাই। তাই তাদের প্রতিবাদের কণ্ঠ আর মিডিয়াতে যায় নাই। কারণ এই সময়ে শাহবাগ মিডিয়ার ফোকাস হারিয়ে ফেলেছে। বলতে গেলে শাহবাগ অনেক বড় একটা অংশের কাছে তাজ্য হওয়া শুরু করেছে। কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো শাহবাগের বদলে দেশপ্রেম বেচা শুরু করেছে।

একটা স্ট্যাটাস ছিল এই সময়ে।

ইনভেস্টমেন্ট গুরু ওয়ারেন বাফেটের একটা কথা আছে, যখন তোমার

চাপরাশি এবং দুধওয়ালা স্টকমার্কেট নিয়ে তোমাকে অ্যাডভাইস করবে তখন বুঝবা স্টক মার্কেট ইনফ্লেটেড এবং তোমার মার্কেট থেকে বেরিয়ে আসার সময় হইছে। অস্কার ওয়াইল্ডের চমৎকার একটা বাণী আছে, দেশ প্রেম হইল বদমাইশের সর্বশেষ আশ্রয় (Patriotism is the last resort of the scoundrels)।

ওই বাণী দুইটার ভিত্তিতে আমার ক্যালকুলেশান হইল যখন দেখবেন কর্পোরেট বেনিয়া মোবাইল কোম্পানিরা দেশপ্রেমের অ্যাড দিতাছে এবং দুর্নীতিবাজ রাজীনীতিবিদরা দেশপ্রেম দেশপ্রেম বলে গলা ফাটাই ফেলতাছে তখন বুঝবেন, দেশের এমন একটা বিরাট ক্যাচাল লাগছে তাতে সবচেয়ে সস্তা কমোডিটি হইল দেশপ্রেম যারে দিয়া সকল জোচ্চুরি আর বাটপাড়ি লুকিয়ে রাখা সম্ভব।

এই সব সময়ে, দুর্ভোগে দুর্ভোগে মানুষের নাভিশ্বাস ওঠে কিন্তু সেইটা নিয়ে বলার কেউ থাকে না।

আদনান সৈয়দ নামের একজন ব্লগারের ভাষায়,

‘আমার শাহবাগ হ্যাকড হইয়া গেছে’। বর্তমান শাহবাগ গণজাগরণ মঞ্চ উদীচীর মতোই একটি খুবই সুন্দর আর যুতসই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এখন সেখানে দেশাত্ববোধক গান হয়, কবিতা আবৃত্তি হয়, লীগের কর্মকতারা বড় গলায় গলাবাজি করেন আর আমাদের প্রাণপ্রিয় ইমরান ভাই তার পিট পিট ঢুলু ঢুলু চোখে এর সব কিছুই খুব সুন্দর আর দক্ষ হাতে দেখভাল করেন।

এই অবস্থায় রুমি স্কোয়াড নামে কিছু তরুণ জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধ করার জন্যে বাস্তব প্রসেস শুরু করার দাবিতে আমরণ অনশন শুরু করে শাহবাগে। এবং তাদের সেই আমরণ অনশন আবার ব্লগারদের মধ্যে শাহবাগকে আলোচনায় আনে।

শাহবাগের ডাক্তার ইমরানের ন্যারেটিভকে শক্তভাবে প্রথম চ্যালেঞ্জ করে যেই সত্তাটি তা হলো রুমি স্কোয়াড। এখনও ব্লগাররা রুমি স্কোয়াডকে শাহবাগের শুদ্ধস্বর হিসেবে জানেন।

এই রুমি স্কোয়াডের ২৯ মার্চের প্রেসবিজ্ঞপ্তি ছিল:

‘গণজাগরণ মঞ্চের ২১ ফেব্রুয়ারির মহাসমাবেশ থেকে যুদ্ধাপরাধী দল হিসেবে জামায়াত-শিবিরের নিষিদ্ধের আইনি প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য ২৬ মার্চ পর্যন্ত যে আল্টিমেটাম দেয়া হয়েছিল সরকার তা না মানায়, এবং এখনো পর্যন্ত এ ব্যাপাওে কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ না নেওয়ায়, শহীদ রুমী স্কোয়াডের সাত

তরুণ এই অনশন কর্মসূচীর সূচনা করেন। ২৭ মার্চ সকাল থেকে এখন পর্যন্ত স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই অনশনে যোগ দিয়েছেন আরো ৯ জন। অনড় এই দাবিতে অনশনে যোগদানকারীর সংখ্যা এখন মোট ১৬ জন।'

কিন্তু ইন্টেরেস্টিংলি আমি খেয়াল করি, রুমি স্কোয়াডকে প্রথম আলো একদমই কাভার করেনি। এবং এইজন্যে রুমি স্কোয়াড কখনই মেইনস্ট্রিম আলোচনায় আসতে পারেনি।

আমার স্ট্যাটাস ছিল।

বাংলাদেশের জনমানস নির্মাণে প্রথম আলোর মনোপলি ভূমিকা রয়েছে।

রুমি স্কোয়াড অনশনে নেমেছে। ছেলেগুলো মৃত্যুমুখে, শুনলাম একজন হসপিটালাইজড হয়ে আবার ফিরে এসেছে অনশনে।

কিন্তু এখনো প্রথম আলো নিউজটা সিরিয়াসলি দেয় নাই, ফলে আন্দোলনের খবর মানুষের কাছে পৌঁছে নাই।

অবস্থা এমন দাঁড়ায়েছে প্রথম আলো যদি নজর না দেয় তো আন্দোলন গণ মানুষের হয়ে ওঠে না।

মধ্যবিত্তের মানস সংগঠনে এই মনোপলি ভূমিকা একটা ভয়ঙ্কর ট্রেন্ড, যার থেকে মুক্তি পাওয়া খুব ডিফিকাল্ট কিন্তু অতীব জরুরি।

রুমি স্কোয়াডের কয় একজন ছেলে অনশন করতে গিয়ে হসপিটালাইজড হয়।এই অবস্থায় রুমি স্কোয়াডের কেউ অনশন করতে গিয়ে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তা সরকারের জন্যে অত্যন্ত বিব্রতকর হত। এবং এই অবস্থায় পরিকল্পনামন্ত্রী ও মুক্তিযুদ্ধের উপপ্রধান সেনাপতি একে খন্দকারকে পাঠানো হয় রুমি স্কোয়াডের অনশন ভাঙতে। তার সাথে ছিলেন শাহরিয়ার কবির।

একে খন্দকার সাহেব মুক্তিযুদ্ধের উপসেনাপতি। একজন বোনাফাইড মুক্তিযোদ্ধা। তিনি ২ এপ্রিলে গিয়ে রুমি স্কোয়াডো অনশন ভাঙান এবং বলেন 'জামায়াত নিষিদ্ধ না হলে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেবো।' তার প্রতিশ্রুতিতে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত অনশন স্থগিত করে রুমিস্কোয়াড। এবং ৪ এপ্রিল পার হয়ে যায় সময়ের অপ্রতিরোধ্য গতিতে। জামায়াত নিষিদ্ধ হয়নি। কিন্তু, আওয়ামী কুটচালে একজন মুক্তিযুদ্ধের উপসেনাপতির ইমেজ ব্যবহার করে বুঝ দেয়া হয় রুমিস্কোয়াডকে। এরপর আর তাদের কথা শোনা যায়নি। শাহবাগের ভেতর থেকে কিছু তরুণের প্রতিবাদের সমাপ্তি হয়।

শাহবাগের ঘটনার পর্যালোচনা আমাদের এখানেই শেষ। আমরা এখন শাহবাগ এবং গণজাগরণ মঞ্চকে ক্রিটিকালি অ্যানালাইজ করব।
এবং তারপরে আবার আমরা ফিরে যাব শাহবাগ থেকে হেফাজত মুভমেন্ট পর্যন্ত।

চ্যাপ্টার ১৮. শাহবাগের বাহাস: ডাক্তার ইমরান, YPD, BOAN, প্রজন্ম ব্লগ, ব্লগ দিবস, বাংলা ব্লগ পলিটিক্স এবং শাহবাগ—একই সুতায়

এতক্ষণ আমরা শাহবাগের স্টেজগুলো দেখলাম। এখন আমরা শাহবাগের বেশকিছু ক্রিটিক্যাল ইস্যু অ্যানালাইজ করব।
আমাদের প্রথম প্রশ্ন জনতা শাহবাগের নেতা এই ধারনার ভিত্তি কি? জনতা কি আসলেই শাহবাগের নেতা ছিল? এই প্রশ্নটা আমি শুরুর থেকেই নিজেকে এবং কিছু ঘনিষ্ঠ অর্গানাইজারকে করেছি। এটার কোনো ভালো উত্তর পাই নাই। তারা বলেছিলেন, এটা ন্যাচারাল প্রসেসে হয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু ইনফরমেশন থেকে এবং অবজারভেশন থেকে সেই উত্তর আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারে নাই। তাই আমি এই প্রশ্নটার উত্তর খুঁজেছি, নিজের জানা, খোঁজা এবং অ্যানালিসিস দিয়ে।
এই প্রশ্নটা করার একটা কারণ আছে। প্রথম কারণ হচ্ছে, শাহবাগের জন্মের পর থেকেই আমি এই ধরনের আলোচনা পেপার পত্রিকা সব জায়গায় দেখেছি, সেটা হলো শাহবাগে কোনো নেতা নাই। জনতাই নেতা। শাহবাগ কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের পিরামিড স্ট্রাকচার ফলো করে চলে নাই। জনতাই নেতা। এটাই শাহবাগের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলা হয়েছে অনেক লেখায়, স্ট্যাটাস, গান এবং মিডিয়াতে। শাহবাগকে বলা হয়েছিল, জনতার শক্তি। সামাজিক শক্তিটাও উচ্চারণ করেছিল কিছু নামজাদা ব্লগার।
এই ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে এসে শাহবাগের শুভশক্তিকে রিপ্রেজেন্ট করে এমন একজন অতীব সজ্জন অ্যানথ্রোপলোজিস্ট যিনি একজন ইউনিভার্সিটির শিক্ষক তাকে প্রশ্নটা করি। তিনি প্রথম দুই তিন সপ্তাহ সম্পূর্ণ সময় শাহবাগে কাটিয়েছেন। তিনি আমাকে বলেছেন, তিনি শাহবাগকে তার নিজের রিসার্চের জায়গায় থেকে দেখেছেন একজন অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে নয়।

তিনিও একই উত্তর দিলেন। তিনি আমার প্রশ্নের উত্তরে বারবার বলেছিলেন, শাহবাগের প্রথম ১২/১৩ দিন আসলেই জনতাই ছিল নেতা। জনতা যেভাবে চেয়েছে সেভাবে শাহবাগ চলেছে।

আমি ২০ ফেব্রুয়ারিতেও শাহবাগের জনপ্রিয় অ্যাক্টিভিস্টের প্রতিবেদন দেখেছি, শাহবাগে জনতাই নেতা।

আমি সেই সময় আইডিয়াটা মেনে নিয়েছিলাম। প্রাথমিকভাবে কিছু সন্দেহ থাকলেও সবার মতো আমিও বিশ্বাস করতাম, শাহবাগে জনতাই ছিল শক্তি।

কিন্তু আমি মাত্র গত কয়েকদিন আগে, এই বই লেখার কাজে শাহবাগের নিউজ ক্লিপগুলো এবং অন্যান্য অর্গানাইজারদের স্ট্যাটাসগুলো যখন আবার রিভিউ করি তখন আমার ধারণাটা পাল্টে যায়। আমার কাছে পরিষ্কার ফুটে ওঠে শাহবাগের জনতাই শক্তি, জনতাই নেতা এই ধারণাটা একটা কালেকটিভ আত্মপ্রতারণা। আসছি।

শাহবাগের শুরু থেকেই শাহবাগের নেতা ছিল ডাক্তার ইমরান এবং যারা গুরুত্বপূর্ণ তারা সবাই এইটা মেনে নিয়েছিলেন। এই জন্যে ডাক্তার ইমরান সরকার এবং তার সংগঠনকে একটু বোঝা দরকার।

সবার প্রথমে YPD ইউথ পিস ফর পিস অ্যান্ড ডেমোক্রেসি

ডাক্তার ইমরান আরো প্রায় ৪,০০০ বন্ধুর মতো আমার ফেসবুক ফ্রেন্ড। উনি প্রথম আমার নজরে পড়েন YPD ইয়ুথ পিস ফর পিস এন্ড ডেমোক্রেসি নামের একটা সংগঠন থেকে। এটা একটা অনলাইন গ্রুপ। আমার কাছে গ্রুপটাকে ইন্টেরেস্টিং লাগে একটাই কারণে। সেটা হলো, আমি দেখলাম এরা আমার দেখা খুব অল্পসংখ্যক ফেসবুক অর্গানাইজেশনের মধ্যে একটা অর্গানাইজেশন যারা অনলাইনের সাথে সাথে অফলাইন অ্যাকটিভিটি করছে।

২০১২ সালের নভেম্বর মাসে একটা ঘূর্ণিঝড় হয়। সেই ঝড়ে YPD একটা প্রোগ্রাম করে, মিশন হাতিয়া। আমি নিজেও ইভেন্টটার দাওয়াত পাই বা এই ব্যাপারে ফেসবুকে তাদের পেজে আমি লাইক-টাইকও দেই। YPD প্রোগ্রামটা করে। তারা হাতিয়াতে গিয়ে ঘূর্ণিদূর্গতদের সাহায্য করে এবং একটা স্কুল করে দিয়ে আসে। তাদের সেই ইভেন্টটা আমার কাছে মনে হয়েছে, ফেসবুক থেকে আসা খুব পজিটিভ একটা ইভেন্ট। কারণ ফেসবুকের অধিকাংশ লোক আমার মতোই কুঁড়ে। কিবোর্ড চেপে হাতি ঘোড়া মেরে ফেলবে, কিন্তু নড়তে বললে

অজস্র এক্সকিউজ শুরু হয়ে যাবে।

ডাক্তার ইমরান এই YPD-এর প্রধান। এবং সেই সময়ের নাড়াচাড়ায় মনে হইছিল, বাঁধন স্বপ্নকথক সংগঠনটার ডেপুটি। আমি শুধু এই দুই জনকেই চিনতাম।

মনে পড়ে, হাতিয়ার সেই স্কুল করার ইভেন্টটাতে চিটাগংয়ের একটা গ্রুপের সাথে YPD-এর ক্যাচাল লাগে। এই গ্রুপটা অভিযোগ করে, YPD ছোট একটা কাজ করে অনেক বেশি আত্মপ্রচারণা করছে এবং তারা অনেক বছর ধরে এই ধরনের কাজ করেও এত প্রচারণা পায় নাই বা করে নাই। আমি সেই ক্যাচালে গিয়ে দুইটা কমেন্টও করি YPD-এর পক্ষে। আমার বক্তব্য ছিল। YPD যে প্রচারণা করতে পারছে সেটা তাদের ক্রেডিট এবং বর্তমান যে দিন কাল পড়ছে তাতে, কেউ যদি একটা ভালো কাজ করে সেটা ফেসবুকে বা ব্লগে প্রচার করে সেটায় আহত হওয়ার কিছু নাই বরং এটা ভালো, কারণ তাতে অন্যেরাও ইন্সপায়ারড হবে। আমি প্রায় ৯০% সিউর আমি এই কমেন্টটা করছিলাম। কিন্তু আমার অ্যাকটিভিটি ফিডে গিয়ে অনেক চেষ্টা করেও কমেন্টা খুঁজে পাই নাই। মানে সেই ক্যাচালটা এখন আর নাই, ডিলিট করে দেয়া হয়েছে।

নিচে সেই ইভেন্টের পেজে লিংক দেয়া হয়েছে।

https://www.facebook.com/thelightofchange/posts/507184639299420

এখানে দেখবেন ডাক্তার ইমরানের পোস্টটায় ৭ জন লাইক দিয়েছেন। এটার থেকে একটা ডিডাকশনে আসা যায় যে ডাক্তার ইমরান এই সময়ে খুব জনপ্রিয় বা ইনফ্লুয়েনসিয়াল কেউ ছিলেন না। বা বাংলা ব্লগের বা ফেসবুকভিত্তিক অ্যাক্টিজম খুব সেলেব্রিটি ক্যারেক্টার ডাক্তার ইমরান নন। এই পোস্টটা অক্টোবর ২০১২ সালের।

এখন আসেন আমরা চলে যাই বাংলা ব্লগের ক্যাচালে।

আপনি যদি ব্লগার হয়ে থাকেন, তাহলে একটা প্রশ্ন করতে পারেন ব্লগার হিসেবে আপনি কখনই ডাক্তার ইমরানের নামও শুনেন নাই।

আপনাকে এইটা মানতে হবে, ব্লগার না হলেও ইমরান সরকার একজন ভালো অ্যাকটিভিস্ট। এবং তিনি অনেক দিন ধরেই যুদ্ধাপরাধের বিচার এবং অন্য ইস্যুতে কাজ করছেন। হাতিয়ার ইভেন্ট তার মধ্যে একটা। ফলে ব্লগার না হলেও আপনাকে এইটা মানতে হবে ডাক্তার ইমরান ভূঁইফোড় কেউ নয়।

আসেন আমরা শাহবাগের জন্মদিনে ফিরে যাই। ৫ ইভেন্ট কাদের মোল্লার রায়ের পরে যে ইভেন্টটি BOAN নামের প্রতিষ্ঠান সংগঠিত করেছিল বলে আমরা জানি এবং যার নেতা হিসেবে ডাক্তার ইমরান আলোচিত হয়েছেন সেই ইভেন্টটার স্ক্রিনশট দিচ্ছি।



BOAN বা ব্লগার অ্যান্ড অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট নেটওয়ার্কের ইভেন্ট যার মাধ্যমে শাহবাগকে ডাকা হয়েছিল বলে দাবি করা হয়

খেয়াল করে থাকবেন। BOAN-এর ইভেন্টটায় এখন প্রায় ৯৭,০০০ লোককে ইনভাইটেড দেখাচ্ছে। আমার যত দূর মনে পড়ে, প্রথম দিন এই ইভেন্ট কলিং এ প্রায় ৪০,০০০ লোক ছিল। যেটা একটা সিগনিফিকেন্ট নাম্বার।

এই ইভেন্টটাই BOAN-এর শাহবাগের অর্গানাইজার হিসেবে নিজেদের এবং ইমরানের ভিত্তি। শাহবাগের সময়কার পেপার পত্রিকা অনুসারে, BOAN ব্লগারদের নেতৃত্ব প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে দেখা হয়। ইতিপূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি। বাংলা ব্লগের ক্যাচাল অনেক পূর্ণ এবং অনেক বিসত্মৃত। তাই BOAN-এর বাংলা ব্লগের নেতৃত্ব দানকারী সংস্থার দাবিটা এবং BOAN আসলেই বাংলা ব্লগের নেতৃত্ব দানকারী সংস্থা কিনা এবং BOAN-এর জন্ম কেন সেটা

একটু খতিয়ে দেখা দরকার।

আমরা BOAN-এর ফেসবুক পেজে যাই এবং দেখি BOAN এর জন্ম কখন এবং কীভাবে।



BOAN এর জন্মদিন ২৯ জানুয়ারি ২০১৩ (স্ক্রিন শট)

আমরা দেখতে পাই যে, BOAN-এর জন্ম হচ্ছে ২৯ জানুয়ারি ২০১৩। শাহবাগের জন্মের মাত্র ৬ দিন আগে। এবং BOAN-এর জন্মের পর পরেই যে স্ট্যাটাসগুলো BOAN শেয়ার করে সবগুলোই হচ্ছে আরব বসন্ত এবং এইসব বিষয়ে।

ডাক্তার ইমরান সরকারের প্রতিষ্ঠান YPD একটা ব্লগ পরিচালনা করে। এটার নাম প্রজন্ম ব্লগ। প্রজন্ম ব্লগের ঠিকানা www.projonmoblog.com-এর যোগাযোগ পেজে গেলে দেখবেন সেখানে দেয়া আছে YPD-এর নাম এবং এর ধানমন্ডি অফিসের ঠিকানা।

প্রজন্ম ব্লগের মাতৃসংস্থা YPD-এর মিশন বা উদ্দেশ্য কী তা তাদের ফেসবুক পেজ থেকে পাওয়া যায়। সেখানে বলা আছে—

Ypd focuses its program on education and training, advocacy and network and youth capacity building aimed at empowering youth with the knowledge of rights and responsibilities of citizens in a democractic country.

YPD র উদ্দেশ্য হলো তরুণদের শিক্ষা এবং ট্রেনিং দিয়ে অ্যাডভোকেসি এবং যোগাযোগ এবং সক্ষমতা বাড়ানো যেন তারা একটি গণতান্ত্রিক দেশের দায়িত্বিবান নাগরিক হিসেবে নিজের অধিকার ও দায়িত্বের বিষয়ে সচেতন হয়।

এই ট্রেনিংয়ের টাকা কোথা থেকে আসবে সেই উত্তরে বলা হয়েছে,

The trainings that will be conducted under fincial supports from various donors.

এই ট্রেনিংটা দেয়া হবে বিভিন্ন দাতাদের আর্থিক সাপোর্ট দিয়ে।

এবং BOAN পেজ জন্মের পরেই যে স্ট্যাটাসগুলো দেয়া হয় তার আরব জাগরণ বা এই সম্বন্ধীয়। অনেকে বলতে পারেন, আচ্ছা, তাহলে তো এরা আগেই জানত। হুমম!

কিন্তু আমি এইখানে কোনো কনস্পিরেসি থিয়োরি দাঁড় করাবো না। আমি মনে করি সেটা কাকতালীয়। কারণ এই সময়ে অনেকেই আরব বসন্ত এবং যুবকদের দ্বারা গণআন্দোলনে আগ্রহী ছিল। এবং বাংলাদেশে এই ধরনের আন্দোলন এখনও কেন হচ্ছে না বা বাংলাদেশ এই ধরনের কিছু হওয়ার জন্যে সঠিক ক্ষেত্র এই ধরনের আলাপ আমি নিজেও করতাম তখন। এটা সেই সময়ের একটা ট্রেন্ড ছিল। এটা ধরে নিতে হবে, তরুণদের দ্বারা আন্দোলনের বিষয়ে ডাক্তার ইমরান এবং BOAN বা YPD-এর সব সময় একটা আগ্রহ ছিল।

BOAN থেকে বাংলা ব্লগ দিবস ১৪১৯

কিন্তু আমার মতে ইস্যুটা সেটা না। এখন আমরা যদি আরো একটু দেখি, তাহলে আমরা দেখতে পাব BOAN-এর জন্মের একটা উদ্দেশ্য ছিল।

boan পেজটার জন্মের দুই তিন ঘন্টার মধ্যেই পেজটা থেকে একটা ইভেন্ট কল করা হয়। সেটা হইল বাংলা ব্লগ দিবস ১৪১৯-এর উদযাপন।





প্রজন্ম ব্লগের উদযাপিত বাংলা ব্লগ দিবসের ইভেন্ট

এই সময় দুইটা এত কাছাকাছি যে অবধারিতভাবে ধরে নেয়া যায়, বাংলা ব্লগ দিবস উদযাপনের জন্যে BOAN পেজটা সৃষ্টি করা হয়।

এবং ইনভাইট পেজের যেই বয়ান আছে সেইগুলো যদি খেয়াল করেন, তাইলে দেখবেন একটা ইন্টেরেস্টিং লাইন আছে:

বাংলা ব্লগ দিবস পালনের ক্ষেত্রে আমার ব্লগকে পথিকৃৎ বলা যায় বিগত কয়েক বছর ধরেই তারা বাংলা ব্লগ দিবসকে জনমানসে জনপ্রিয় করবার লক্ষ্যে সেমিনার, ব্লগারদের নিয়ে সাংস্কৃতিক মতবিনিয়ম সভার মতো অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে। এছাড়াও ব্লগ দিবসকে উপলক্ষ করে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান করেছে আমার ব্লগ যা ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে।'

এইটা খেয়াল না করলে চোখে পড়বে না কিন্তু প্রজন্ম ব্লগের একটা ইভেন্টে প্রজন্ম ব্লগের গুণগান বাদ দিয়ে এইভাবে আমার ব্লগের গুণগান করাটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। এখান থেকে এই অ্যাজাম্পশন করে নেয়া যায় BOAN অর্গানাইজেশনটা যারা গঠন করেছে তারা কিছুটা হলেও আমার ব্লগের সাথে যুক্ত। এখন এখানেই আসে বাংলা ব্লগ পলিটিক্স। যেই পলিটিক্সে আমার ব্লগ একটা গুরুত্বপর্ণ লিড ক্যারেক্টার। প্রজন্মব্লগ বাংলা ব্লগে গুরুত্বপূর্ণ কেউ না।

ফলে ধরে নেয়া যায়, আমার ব্লগ এবং প্রজন্ম ব্লগ এই বাংলা ব্লগ দিবস পালনে কিছুটা হলেও নিজেদের মধ্যে সমন্বয় করেছে।
যদিও একই দিন আমার ব্লগ নিজেও আলাদা করে ব্লগ দিবস পালন করে ভিন্ন জায়গায় যা আমি সেই দিনের পেপারে পেয়েছি। ফলে এইটাও ধরে নেয়া যায় নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ থাকলেও প্রজন্ম ব্লগ এবং আমার ব্লগ সম্পূর্ণ দুইটা আলাদা সত্তা।

চ্যাপ্টার ১৯. বাংলা ব্লগ পলিটিক্স এবং শাহবাগ

এখন আসেন বাংলা ব্লগের ক্যাচালে যাই যা নিয়ে আমি শুরুতে অনেক কথা বলেছি।
বাংলাদেশের এক সময়ের সবচেয়ে বড় ব্লগিং প্লাটফর্ম হইল সামহোয়ার ইন ব্লগ ওরফে সামু। আমি এটা আগেই বলছি সামুতে যেহেতু প্রায় ১ লক্ষ লোক ব্লগিং করে এই জন্যে সামুর ভেতরে এত গ্যাঞ্জাম লাগে যে কেউ কাউকে ডমিনেট করতে পারছিল না। এবং সামুর মডারেটররা এক এক সময় এক এক পক্ষ নিত পাবলিক সেন্টিমেন্ট অনুসারে। ফলে শুধুমাত্র নিজের পক্ষের লোকের প্লাটফর্ম সৃষ্টি করার বাসনায় সামু থেকে বেরিয়ে এসে বিভিন্ন ব্লগ সৃষ্টি হয়েছে।
এখন এই সবগুলো গ্রুপের একটা জায়গা কমন—সেটা হলো এই গ্রুপগুলোর সবগুলোই সামুকে দেখতে পারে না। যদিও সামু মাদার অর্গানাইজেশন, কিন্তু যেহেতু কোনো না কোনো কারণে এরা সামু থেকে বেরিয়ে এসেছে তাই সামুকে নিয়ে সবাই সমালোচনা করে। সামুর অবস্থা হলো প্রথম আলোর মতো। কাউকেই সন্তুষ্ট করতে পারে না। কারণ তারা এত বড় হয়ে গেছে এবং তাদের প্রতিটা স্টেপ এত গভীরভাবে দেখা হয় যে তাদের পক্ষে ব্যালান্স করাটা খুব মুশকিল।
তারা নিরপেক্ষ হইলেও মুশকিল। কারণ বাংলা ব্লগ এবং বাংলাদেশের সমাজ এত গভীরভাবে আইডিয়োলজিক্যালি ডিভাইডেড যে, আপনি নিরপেক্ষ টাইপ ভাব ধরলে গালি আরো বেশি খাবেন। আপনাকে কোনো না কোনো পক্ষ নিতে হবে। কিন্তু সামু কখনোই পরিষ্কারভাবে কোনো পক্ষ নেয় নাই। তারা আলোচনা এবং ব্লগকে উন্মুক্ত রাখছে এবং হালকাভাবে মুক্তিযুদ্ধের প্রগ্রেসিভ ধারার প্রতি

তাদের নিজের সমর্থন দিয়ে রাখছে। এটা কাউকে সন্তুষ্ট না করার মতো আর একটা ছুপা ছাগু টাইপের পজিশন।
এখন ক্যাচাল লাগছে বাংলা ব্লগের জন্ম দিবস নিয়ে। সামুর জন্ম দিন হলো ১৯ ডিসেম্বর। এটা সামু বেশ কয়েক বছর ধরে বাংলা ব্লগের জন্ম দিবস হিসেবে পালন করছিল।
এখন সামু থেকে যারা বেরিয়ে নিজে ব্লগ সাইট করেছে, তাদের কথা হলো সামু হলো একটা বিদেশির করা ব্লগ। সামুর প্রতিষ্ঠাতা একজন বাংলাদেশ নিবাসী নরওয়েজিয়ান এবং তার বাংলাদেশী স্ত্রী। এর জন্মদিন কেন বাংলা ব্লগের মতো একটা পবিত্র অনাঘ্রাতা বিষয়ের জন্মদিন হবে!
আমি এমন আলোচনাও দেখেছি যে এরা সামুর নাম নিয়েও খুব চেতা। কারণ,সামুর একজন প্রতিষ্ঠাতা ‘জানার’ কাছ থেকে জানা যায় যে, টোটো নামের একটা ইংরেজি ব্যান্ডের সামহোইয়ার ইন আফ্রিকা গানটা থেকে সামু নামটার ইন্সপারেশন পাওয়া গেছে। অনেকেই এই ধরনের ভিনদেশী গানের নাম থেকে জন্ম নেয়া সাইটের জন্মদিনকে বাংলা ব্লগের জন্মদিন হিসেবে পালন করতে অনাগ্রহী ছিলেন।
এই ক্যাচাল থেকেই সামুর বাইরের বেশকিছু ব্লগ এক হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিন ১ ফেব্রুয়ারি তারা বাংলা ব্লগের জন্মদিন পালন করবে।
এই দিবসটা বিভিন্ন ব্লগ বিভিন্ন জায়গায় পালন করে। প্রজন্ম ব্লগ ইভেন্টটা পালন করার সিদ্ধান্ত নেয় শাহবাগের বেগম সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে। প্রজন্ম ব্লগ হয়তো চায় নাই অনুষ্ঠানটা সরাসরি তাদের নামে হোক। হয়ত এই জন্যে যে তাতে অনেকে আসবে না। কারণ প্রজন্ম ব্লগ খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্লগ নয় যেটায় সেলিব্রেটিরা আসবে। তাই একটা অর্গানাইজেশন সৃষ্টির দরকার পড়ে।
এই জন্যেই এই ইভেন্টটা সৃষ্টি করতে BOAN নামের ফেসবুক পেজটার জন্ম দেয়া হয়।
একটা ফেসবুক অর্গানাইজেশন তৈরির তিন ঘন্টার মধ্যে একটা ইভেন্ট সৃষ্টি করা থেকে সেটা ধরে নেয়াই সবচেয়ে কমনসেন্স ডিসিশন।
আমি নিজেও এই ইভেন্টের ইনভাইট পেয়েছিলাম। এইখানে ডাক্তার ইমরান সরকারের সাথে এই ইভেন্ট পেজে আমার কিছু বাতচিৎ হয় খুব হালকা

মেজাজে। এটাই আমার ইমরান সরকারের সাথে প্রথম অনলাইন আলাপ। এবং আমার কাছে মনে হয়েছে, নাইস গাই। আমার খুব ইচ্ছা ছিল এই অনুষ্ঠানে যাওয়ার। জাস্ট লোকজনের সাথে পরিচয় হওয়ার জন্যে। কিন্তু যাওয়া হয়নি।

গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি

পরে আমি এই অনুষ্ঠানের কথা পড়ি ব্লগে। এবং হ্যালো টুডে নামের একটা অনুলেস্নখযোগ্য অনলাইন নিউজপেপার থেকে এই অনুষ্ঠানে যারা হাজির ছিল সেটার একটা রেফারেন্স দিচ্ছি।

'অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপস্থাপক অঞ্জন রায়, কলামিস্ট শামসুল আবেদিন খাঁন, কলামিস্ট মহিউদ্দিন আহমেদ, ধিরেন অধিকারী, কানিজ আকলিমা, জনপ্রিয় ব্লগার অমি রহমান পিয়াল, জাস্টিস ফর বাংলাদেশের এক্টিভিষ্ট এস এম সাকিল, ব্লগার অনিমেষ রহমান, আল আমিন বাবু, ব্লগার এন্ড অনলাইন এক্টিভিষ্ট নেটওয়ার্কের আহবায়ক ইমরান এইচ সরকার।

অনুষ্ঠানে অতিথিদের নিয়ে নানা আলোচনায় মেতে উঠেন শিবলি, সানোয়ার পারভেজ পুলক, আরিফ জেবতিক, জানভির আলম, সুজা রহমান, শিবলি হাসানসহ ছদ্মনামের জনপ্রিয় ব্লগার আল্লামা শয়তান, দুরন্ত, আজাদ মাস্টার, আমি বাঙ্গাল, ত্রিশঙ্কু, মাটির মানুষ, শনিবারের চিঠি, গৃহত্যাগী, স্বপ্নকথক, সিএম রুশাদসহ প্রমুখেরা।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মারুফ রসূল।'

নামগুলো খেয়াল করবেন। কারণ এই নামগুলোর অনেকেই পরে শাহবাগের গুরুত্বপূর্ণ রথী মহারথী হয়ে ওঠেন।

এই অনুষ্ঠানের ফেসবুক পেজে প্রায় ৭০০ জন যাবে বলে ক্লিক করে। যেটা একটা বড় নাম্বার। তখনকার লেখা এবং নিউজ রিপোর্ট দেখে আমার মনে হয়েছে এই অনুষ্ঠানে ৭০ থেকে ১০০ জন লোক হাজির ছিল।

কিন্তু একটা ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস খেয়াল করে দেখেন, এই ইভেন্টটা করতে BOAN ৫৫,০০০ মানুষকে ইনভাইট করে। যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে একটা বড় নাম্বার।

ইমরান সরকার কেন শাহবাগের নেতা? এটার একটা গুরুত্বপূর্ণ এলিমেন্ট হচ্ছে BOAN বা তার মাদার অর্গানাইজেশন YPD-এর একটা ইভেন্টে এই ধরনের ৫০,০০০ লোককে ডাক দেয়ার ক্ষমতা। কিন্তু BOAN-এর প্রথম দিকের

পোস্টগুলোতে দেখবেন, সেগুলোতে লাইক পড়েছে মাত্র ৭ টা ১০ টা। এটা একটা অর্গানাইজেশনকে কতজন মানুষ ফলো করছে সেটা নির্দেশ করে। কিন্তু তারপরেও BOAN সেই টেকনিক্যাল ক্ষমতা আছে যার মাধ্যমে তারা ৫০,০০০-এর মতো লোককে একটা ইভেন্টে ডাকতে পারে। BOAN-এর টেকনিক্যাল ক্ষমতাটা BOAN এবং অটোমেটিক্যালি ইমরান সরকারকে একটা নৈতিক অধিকার দেয়, আমি শাহবাগ কল করেছি, এই কথাটা বলার জন্যে।

ফলে মিডিয়ার লোকজন যখন ফেসবুকার বা ব্লগারদের দ্বারা আয়োজিত এই শাহবাগ সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে, তখন তারা এই ইভেন্ট পেজে গিয়ে দেখে ৫০,০০০ লোককে দাওয়াত দেয়া হয়েছে তখন তারাও ডাক্তার ইমরানের দাবিকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখে।

শাহবাগের যখন জন্ম হয়েছে, তখন BOAN ছিল সংগঠিত একটা প্রতিষ্ঠান। ইমরান সরকার যেটার নেতা। কিন্তু আমরা দেখেছি BOAN হইল আসলে YPD যেটা চালায় একটা ব্লগ যার তেমন কোনো পরিচিতি ছিল না। কিন্তু শাহবাগের জন্মের মাত্র ৫ দিন আগে, বাংলা ব্লগ দিবস এই ইভেন্টটা করার কারণে BOAN-এর একটা নেটওয়ার্কিং হয় কিছু সিনিয়র ব্লগারদের সাথে এবং সেইসাথে তাদের পুরনো নেটওয়ার্কিংতো ছিলই।

ফলে, শাহবাগ যখন দাঁড়িয়ে গেছে তখন BOAN-এর সাথে জড়িত ব্লগাররা, যারা BOAN-এর ব্লগ দিবসের অনুষ্ঠানে গিয়েছিল তারা বাংলা ব্লগের ডি-ফ্যাকটো প্রতিনিধি হিসবে শাহবাগকে সব জায়গায় প্রতিনিধিত্ব করছে। এই গ্রুপের প্রতিনিধিরা যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবির সাথে যেমন সংশিস্নষ্ট ছিল, ঠিক তাদের মধ্যে অনেকের ঘোর আওয়ামী লীগার হিসেবে বাংলা ব্লগে পরিচয় আছে। এর বাইরে যারা ছিল, তাদের মধ্যে খুব কম লোকই শাহবাগে ব্লগারদের প্রতিনিধি হিসেবে সামনে আসতে পারছে, চার-পাঁচজন উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে। কিংবা তারা সামনে আসলেও জাগরণ মঞ্চ নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ভয়েস হিসেবে আনতে পারেন নাই।

তাছাড়া ডাক্তার ইমরানের পরিচয় বলে তিনি ছিলেন স্বাচিপের নেতা। এটা তিনি নিজেই স্বীকার করেন। ফলে ডাক্তার ইমরান এর চিন্তা ভাবনা এবং সঙ্গীরা সম্পূর্ণ ভাবে আওয়ামী লীগের এজেন্ডাকে বহন করে। এটা ইমরান সরকার কখনই রাখ-ঢাকও করেন নাই।

ফলে গণজাগরণ মঞ্চ যখন ডিসিশন নিয়েছে তখন BOAN-এর সাথে সংশিস্নষ্ট গ্রুপের চিন্তা-চেতনা এবং সিদ্ধান্তকে প্রতিনিধিত্ব করেছে। ব্লগার কমিউনিটির অন্য কোনো সেগমেন্ট এখানে এক আনা পাত্তাও পায় নাই।

আওয়ামী লীগের এজেন্ডা বহন করা কোন অপরাধ নয়। এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকারী দল হিসেবে আওয়ামী লীগ সব সময়েই বিচারের প্রতি যারা আন্তরিক তাদের সমর্থন পেয়েছে স্বাভাবিক ভাবেই। কিন্তু, শাহবাগের জনতার স্ফুলিংগ স্টেজ এবং স্বাতন্ত্র্য স্টেজের দিকে আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাব, শাহবাগের জনতা একটা এন্টি এস্টাব্লিশ্মেন্ট মুভমেন্ট হিসেবে, সরকারের পক্ষে ছিলনা। এবং তাদের দাবি দাওয়া ছিল, সরকারের জন্যে অস্বস্তিকর যেমন আওয়ামী লীগের ভেতরের রাজাকারদেরও বিচার করতে হবে।

এখন শাহবাগ আওয়ামী ঘরানার ব্লগারদের হাতে ক্যাপচার হয়ে যাওয়াতে, জনতার সেই স্বর হারিয়ে যায় এবং শাহবাগ আওয়ামী লীগের ঘুটিতে পরিণত হয়—যেইটা আমি নিশ্চিত শাহবাগের জনতা চায় নাই।

একটা অ্যান্টিএস্টাব্লিশমেন্ট মুভেমেন্টের নেতা যখন নিজেই এস্টাব্লিশমেন্টের অন্দর মহলের লোক হয়ে যায় সেই নেতা আন্দোলনকে এস্টাব্লিশমেন্টের পকেটে ঢুকিয়ে দেবে এটাই স্বাভাবিক।

আমার উপরের লেখা পড়ে অনেকেই এই কনক্লুশনে চলে আসবে যে শাহবাগ আওয়ামী লীগের অর্গানাইজ করা। এবং এর জন্যে BOAN-এর জন্ম হয়েছে আওয়ামীপন্থী লোকদের হাতে, এরপর তারা শাহবাগকে অর্গানাইজ করেছে এবং সবকিছু হলো আওয়ামী লীগের ষড়যন্ত্র। এই ভাবে YPD, BOAN, বাংলা ব্লগের ইভেন্ট আওয়ামী ঘরানার ব্লগারদের উপস্থিতি, শাহবাগ ইভেন্ট এইগুলো লিংক করা সম্ভব। এটা খুব ন্যারো দৃষ্টিভঙ্গি। আপনি যদি গ্র্যান্ড কনটেক্সটা দেখেন যেটা আমি লেখার চেষ্টা করছি তাহলে দেখবেন এটা কোনো মতেই হতে পারে না।

শাহবাগের জন্ম হয়েছে আওয়ামী লীগের সাথে জামায়াতের গোপন আঁতাত প্রতিবাদ করতে গিয়ে কিন্তু এই সময়ে BOAN খুব সুযোগসন্ধানী একটা অবস্থায় ছিল। এবং সেটার তারা সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে।

ইমরান সরকার সৌভাগ্যবান। তিনি ঠিক জায়গায় ঠিক টাইমে ছিলেন। একটা জিনিস খেয়াল করবেন, ভাগ্য বলে একটা জিনিস আছে। কিন্তু ভাগ্য

অটোমেটিক হয় না। যে চেষ্টা করে তার সাথেই ভাগ্য যুক্ত হয়। এবং ইমরান সরকারের ভাগ্য গড়ে দেয় তার চেষ্টা। এবং তার সাথে আওয়ামী লীগের পূর্বের সংযোগ উভয় পক্ষের জন্য উইন উইন সিচুয়েশন হয়ে দাঁড়ায়।

আর আওয়ামী লীগের একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো, তারা যে কোনো ইস্যুতে সবগুলো দিক খোলা রাখে।

তাদের অনেক উইংস এবং এই উইংসগুলো এক একটা এক এক ধরনের আইডিয়োলজিক্যাল অবস্থান নিয়ে থাকে। এবং যখন যেটার প্রয়োজন হয় তখন আওয়ামী লীগ এই উইংসগুলোকে মুভ করায়।

মনে করেন, ঘাতক দালালদের বিচার ইস্যু। সেন্ট্রাল আওয়ামী লীগ হয়তো আঁতাত করছে কিন্তু তাদের ফুট সোলজার ১০টা দল বিচার চাইতেই থাকবে। যাতে, ঘটনা যদি চেঞ্জ হয় তো এই ফুট সোলজারদেরকে তখন দল মুভ করাতে পারে।

BOAN-এর কাদের মোল্লার ইস্যুতে ইভেন্ট কলিং এই ধরনের একটা বিষয়। BOAN এবং আওয়ামী ঘরানার ব্লগাররা সব সময়েই ঘাতক দালালদের ফাঁসির ব্যাপারে সোচ্চার ছিল। কিন্তু কোনো কারণে যদি আওয়ামী লীগের সাথে জামায়াতের এই আঁতাতটা পার্মানেন্ট হয়ে যেত তখন দেখা যেত এই গ্রুপগুলো চুপ মেরে গেছে এবং ফুললতা পাতা নিয়ে ব্লগিং করছে।

আসলে একদিকে আওয়ামী লীগ জামায়াতের সাথে আঁতাত করছে, অন্যদিকে BOAN বা আওয়ামী ঘরানার ব্লগাররা গলা ফাটিয়ে ফেলছে এতে কোনো দ্বন্দ্ব নাই। এটা বাংলা ব্লগের ইতিহাসের সাথে খুবই প্রচলিত একটা ঘটনা।

এবং আওয়ামী লীগ খুব লাকি একটা দল যে, শাহবাগ ঘটে যাওয়ার মুহূর্তে তারা ইমরানের মতো একজন ডেডিকেটেড কর্মীকে এই জায়গায় পেয়েছে।

চ্যাপ্টার ২০. গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো BOAN-এর ইভেন্ট কলিংয়ের জন্যেই কি শাহবাগ? এবং শাহবাগের বাম পলিটিক্স

শাহবাগের শাহবাগ হয়ে ওঠার কিন্তু একটা ইতিহাস আছে। শাহবাগ এক দিনে হয় নাই। শাহবাগে বিগত এক বছরে ছবির হাটভিত্তিক গ্রুপগুলো, সংগঠনসহ বা সংগঠন ছাড়া বা জাতীয় স্বার্থে অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট বা তেল গ্যাস বা নির্মূল

কমিটি বা এই ফেসবুকভিত্তিক কিছু সংগঠন বেশকিছু ইভেন্ট করেছে। যেমন রামুর ঘটনা পর, যেমন তাজরীন গার্মেন্টসে আগুনের পর বিক্ষোভ, ইভ টিজিং বিরোধী আন্দোলন—এগুলো অর্গানাইজ করেছিল ব্লগারদের সেই গ্রুপগুলোই। এই ইভেন্টগুলো কিছুটা হলেও মিডিয়া কাভারেজ পেয়েছিল এবং ব্লগে এই ইভেন্টগুলোর ঘটনা প্রকাশিত হয়ে বড় করে। তাই কাদের মোল্লার ফাঁসির পরে বাংলা ব্লগকেন্দ্রিক যাদের অ্যাক্টিভিজম তারা সবাই একটা আওয়াজ দিচ্ছিল যে, চল শাহবাগে যাই। রবীন্দ্র সরোবর বা সংসদ প্রাঙ্গণে না। শাহবাগে যাওয়ার এই চিন্তাটা সৃষ্টি হয়েছে বিগত দুই এক বছরের এই ইভেন্টগুলোতে।

আবার আমি প্রশ্ন করি। কেন শাহবাগে?

কারণ শাহবাগের একটা ইতিহাস আছে। BOAN-এর ইভেন্ট কলিংয়ের অবশ্যই একটা মাজেজা আছে কিন্তু সেটা শাহবাগের ডাক দেয় নাই। যেই অর্গানাইজেশনটার নাম কেউ শুনে নাই যে অর্গানাইজেশন তার জন্মের পর সর্বোচ্চ ২৫০ জন লোক লাইক দিয়ে প্রতিষ্ঠানটাকে স্বীকার করছে তারা শাহবাগের প্রণেতা নয়। শাহবাগের ডাক দিয়েছে অনেকেই।

তাই, বলতে হয় কারো ডাকে বা হাওয়া থেকে শাহবাগ হয় নাই। শাহবাগের প্রথম ডাক জনতা দিয়েছে। এবং জনতা এইখানে আসলেই আহবায়ক। আমার বিশ্বাস সেই সময়ের ফেসবুক পেজ কমেন্টস এবং ব্লগগুলো খোঁজ করলে শাহবাগের যাওয়ার চিন্তাটা ছবির হাটভিত্তিক অনেকের কাছেই পাওয়া যাবে। অনেক ফেসবুক ইভেন্ট বা কমেন্টস ছাড়া নিজেরাই গেছে। অনেকে বন্ধুর সাথে কথা বলে গেছে।

তাই শাহবাগের প্রথম যে আলাপ ছিল যে জনতাই নায়ক সেটা সত্য। কারণ শাহবাগের এই মুভমেন্টটার শুরু খুব অর্গানিক ভাবে হয়েছে। প্ল্যান করে বা কোনো ইভেন্ট কলিংয়ের মাধ্যমে হয় নাই।

এবং শাহবাগের প্রাথমিক যে জমায়েতটা, সেটা শাহবাগের পূর্বের যে জমায়েতগুলো ছিল সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা স্টেটমেন্ট। এইজন্যে এটা আমি আবার বলছি, শাহবাগের প্রথম যে জনতা তারা শাহবাগের ইতিপূর্বের জনতাকে প্রতিনিধিত্ব করে।

পার্থক্য হচ্ছে এইদিন ইন্টেন্সিটি বেশি ছিল। পার্থক্য হচ্ছে এইদিনই মিডিয়া ঘটনাটা পিক করে, পার্থক্য হচ্ছে এইদিন ব্লগারদের রাগ ক্ষোভ অনেক বেশি

ছিল। পার্থক্য হচ্ছে সেইদিন অনেকেই ডাক দিয়েছিল। পার্থক্য হচ্ছে সেইদিন সরকারের আঁতাত ঘটনাটা বিগত বছরের দূর্নীতির চুরির লুটপাটের একটা ধারাবাহিকতা মনে করে সবাই রাগে জ্বলে যাচ্ছিলো। এবং সবাই সেটা ভেন্টিলেট করার জায়গা খুঁজছিল। সেটা বাই ডিফল্ট ছিল শাহবাগ।

আবার প্রশ্ন করব, কেন শাহবাগ, কেন ব্লুব্যান্ড কলের রবীন্দ্র সরোবর বা সোহরায়ার্দি উদ্যান, বা শহীদ মিনার বা মতিঝিল বা সংসদের মাঠ নয়? কারণ আগে যেটা বললাম শাহবাগের ব্লগার এবং ফেসবুক আর অনলাইনভিত্তিক আন্দোলনের একটা ধারাবাহিকতা সৃষ্টি হয়েছে গত দুই বছরে। রামুতে হামলা, তাজরীন গার্মেন্টসে আগুনে মানুষ মরা, তেল গ্যাস কমিটির বিক্ষোভ সবগুলোতেই ছেলেপেলে ফেসবুকভিত্তিক ব্লগার জাতীয় স্বার্থে ব্লগার এবং অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট এবং ছবির হাটভিত্তিক গ্রুপগুলো নাড়াচাড়া করেছে, শাহবাগে দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিয়েছে, একটা মাইক নিয়ে ভাষণ দিয়েছে।

ব্লগার এবং অ্যাক্টিভিস্ট বলে যারা পরিচিত তারা কোনো দিন BOAN-এর নাম শোনে নাই। শোনার কথা না, কারণ এটার জন্মই হইল ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩—শাহবাগের জন্ম ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩। বরং ব্লগারদের রিপ্রেজেনটেটিভ সংগঠন হিসেবে জাতীয় স্বার্থে ব্লগার এবং অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট নামের একটা গ্রুপ সব সময় নাড়াচাড়া করছে। এবং সরকারের বিরুদ্ধে বেশ কিছু প্রতিবাদের কারণে এরা পুলিশের নজরে ছিল। ইতিপূর্বে, তাদের নেতাদেরকে পুলিশ ধরে প্যাঁদানি দিয়েছে। এরা বাদেও আরো কিছু ছোট ছোট গ্রুপ ফেসবুকে নিজেদের অর্গানাইজ করার চেষ্টা করেছে, নাগরিক ইস্যুতে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কখনই বড় কিছু হয়ে উঠতে পারে নাই। যারাই একটু বড় হতে গেছে তারাই পুলিশ এবং সরকারের টার্গেট ছিল।

এটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে রাজনৈতিক দলেরা ক্রমাগত দেশকে লুটপাট করছে এবং দেশের মেইনস্ট্রিম মিডিয়া কালো টাকার দাস হয়ে আছে তখন জনগণের ভেতর থেকে চিন্তাশীল অংশরা যখন ব্লগে একটা সংগঠন করবে সেটা অ্যান্টিএস্টাব্লিশমেন্ট ঘরানার হয়ে সরকারের দূর্নীতি এবং দালালিসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রতিবাদ করবেই। এবং এরা পুলিশের প্যাঁদানি খাবেই।

আমি মনে করি এরাই শাহবাগের জন্মদাতা। ছবির হাটভিত্তিক

অ্যান্টিএস্টাব্লিশমেন্ট এনটিটিগুলো।

BOAN ইভেন্ট কল করলেও এটা হত না করলেও এটা হত। এবং এই BOAN জাস্ট সেটার সুযোগ নিয়েছে মাত্র। আওয়ামী লীগ অসম্ভব লাকি একটা দল। এই অবস্থায় তারা BOAN-এর মতো একটা সংগঠন পেয়ে যায়, যারা মাত্র ৫ দিন আগে তৈরী হয়েছে, একটা অনুষ্ঠান হয়েছে এবং এর ফলে কিছু লোকের নেটওয়ার্কিং হয়েছে। এবং ইমরান সরকারের মতো একজন ডেডিকেটেড অ্যাকটিভিস্ট BOAN-এর সাথে ছিল।

এবং আওয়ামী লীগ যখন বুঝতে পারে শাহবাগ একটা বড় শক্তি হয়ে উঠতাছে তখন তারা BOAN-এর পেছনে তাদের সাংগঠনিক শক্তি জুড়ে দেয়। ফলে BOAN এবং ইমরান এবং তার সাথের সংযুক্ত ব্লগাররা অনেক শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। ইমরান সরকার কেন নেতা, তার অন্যতম একটা কারণ, ডাক্তার ইমরান নেতা হতে চেয়েছিল। এটা একটা বড় সাহস আর গুণের ব্যাপার। আমি ইমরান সরকারের মধ্যে নেতা হওয়ার অনেক গুণাবলি দেখি। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে তিনি নেতা হতে চেয়েছিলেন এবং এই ব্যপারে তার কোনো দ্বিধা নাই।

কিছুদিন আগে, হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউর একটা আর্টিকেলে এই জিনিসটা পড়েছিলাম। এই আর্টিকেলে একজন নেতার সাতটা গুণের কথা দেখলাম। এর মধ্যে একটা গুণ দেখে খুব অবাক হয়েছিলাম। সেটা হলো একটা নেতার প্রথম গুণ হলো সে নেতা হতে চায়। এটা ইমরান সরকারের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় ছিল। কিন্তু এটা বাম দলের কারো মধ্যে ছিল না, এটা জাতীয় স্বার্থে ব্লগার আর অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট গ্রুপের মধ্যে ছিল না, এটা ছবির হাটের কোনো কুতুবের ছিল না।

ইনাদের দেখলাম, ১৯ ফেব্রুয়ারি যখন শাহবাগ সরকারে পকেটে ঢুকে পুরা বিরানি হয়ে গেছে তখনও স্ট্যাটাস দিচ্ছেন আর পেপারে লিখছেন জনতাই নেতা। এটা একটা আত্মপ্রতারণা। আমি মনে করি এটা বাম দ্বিধা। এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব।

আমি এই প্রশ্নটা কিছু বাম অ্যাক্টিভিস্টের কাছে, শাহবাগে যারা খুব অ্যাকটিভিলি কাজ করছেন। তারা আমাকে বলেছিলেন যে, তারা প্রথম দিকে কিছু সিনিয়র বাম নেতাদের কাছে গিয়েছিলেন। কয়েকবার গিয়েছিলেন। শাহবাগ যখন ৮ তারিখ বা ৯ তারিখের দিকে আওয়ামী লীগের প্রেসারে পড়েছে

এবং ক্যাপচার হয়ে যাচ্ছে সেইসময় তারা বাম নেতাদেরকে আহবান জানান তাদের শক্তি এবং জনবল দিয়ে শাহবাগকে রক্ষা করতে। মঞ্চকে ক্যাপচার করতে বা মঞ্চের দখল ঠেকাতে।

তারা আলাদা আলাদা ভাবে ঠিক এই কথা আমাকে বলছেন 'সিপিবি, বাসদ এবং অন্য বাম দলগুলোর আসলে কখনই আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যেতে চায় না এবং যাবে না। যদিও তারা নিজেরা প্রগ্রেসিভ মুভমেন্ট করে বলে কিন্তু তারা আসলে সরকারের একটা এক্সটেনশন মাত্র' আমি খুব অবাক হয়েছিলাম যে, সম্পূর্ণ আলাদা ক্যাম্পের কিছু লোক আমাকে একই ব্যখ্যা দিয়েছিল শাহবাগে এত সহজে আওয়ামী লীগের হাতে ক্যাপচার হয়ে যাওয়ার ব্যাখা হিসেবে।

শাহবাগে বন্ধু তরুণ বাম নেতাদের আমি বলেছি, সারাজীবন আফসোস করবেন। এই যে এত বছর বিপ্লব বিপ্লব করে গলা ফাটিয়ে ফেললেন। বাংলাদেশ দুইদলের দখলে মানুষের জাগরণ কবে হবে সেই নিয়ে এত পদ্য লিখলেন, অ্যাক্টিভিজম করলেন, দল করলেন, সেই বিপ্লব যখন সামনে আসল তখন আপনারা পালায় গেলেন। যখন বুড়ো হয়ে যাবেন, তখন বলবেন এই যে লক্ষ লক্ষ লোক—এরা একদিনই আমাদের নেতৃত্ব চেয়েছিল। আমি ভয় পেয়ে পালায় গিয়েছিলাম।

তারা নীরব হয়ে কথাটা শুনে গেছেন। প্রতিবাদ করেন নাই।

দুই একজন প্রতিবাদ করেছেন। পেপার লিঙ্ক দিয়ে বলেছেন, এই দেখেন আমি প্রতিবাদ করেছি। কিন্তু সেইগুলো অনেক পরের। শাহবাগ ক্যপচার হয়ে গিয়েছিল তিন দিনের মাথায়। উনারা প্রতিবাদ করেছেন ৩০ দিনেরও পরে। যখন শাহবাগ নিয়ে কারো আর তেমন টেনশান নাই। শাহবাগের শুদ্ধস্বরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবাদ, রুমি স্কোয়াডের তরুণদের। আর কারো স্বর শাহবাগের ক্যাকোফোনি ছাপিয়ে শোনা যায়নি, তাই এই সব ম্রিয়মান প্রতিবাদের কোনো বেইল নাই।

বাস্তবতা হচ্ছে। শাহবাগকে আওয়ামী লীগ খুব সহজে ক্যাপচার করেছে। খুব অল্প প্রেসারে শাহবাগ বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে।

এটা অনস্বীকার্য যে শাহবাগে ট্র্যাডিশনাল বাম, প্রগ্রেসিভ, বা নতুন প্রজন্মের বামদের একটা ডেফিনিট সুযোগ ছিল। কারণ বাংলাদেশের প্রগ্রেসিভ এবং

জনস্বার্থবিরোধী ইস্যুগুলোতে প্রতিবাদে এত বছর ধরে তারা রিপ্রেজেন্ট করছিলেন। এবং ব্লগার কমিউনিটি এই মুভমেন্টগুলোর সাথে সম্পূর্ণ ভাবে এক লাইনে ছিল। যেমন তেল গ্যাস বিরোধী আন্দোলন, যেমন গার্মেন্টসে মজুরি এবং নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিয়ে আন্দোলন এবং ঘাতক দালালের বিচার নিয়ে আন্দোলন।

এবং শাহবাগ যখন হয়েছে তখন ছবির হাটভিত্তিক গ্রুপগুলোর কোনো নিজস্ব এনটিটি না থাকাতে তারা বামদের ছায়া পেলে নিজেরাও একটা শক্তি হতে পারত। এবং বামেরা সেটার অ্যাডভান্টেজ নিতে পারত। চিন্তা করতে পারছেন আপনার সামনে লক্ষ লক্ষ জনতা। যারা সবাই টগবগে রক্তের এবং লুটেরা পলিটিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্টের বহির্ভূত শক্তি।

আওয়ামী লীগ শাহবাগে মাত্র একটা সুঁই পেয়েছিল সেটা হইল BOAN। এবং সেটা তারা ফুল ক্যাপিটালিজ করেছে। কিন্তু শাহবাগে বাকি সবাই যারা ছিল তারা হয় প্রগ্রেসিভ বা বাম ঘরানার বা দলের বা একই লাইনে অ্যালাইনড। বামদের পক্ষ থেকে সেইভাবে শাহবাগ সিজ করার বা আওয়ামী লীগের হাত থেকে মুক্ত করার কোনো প্রবণতাই ছিল না। এটার আরো একটা কারণ হয়তো বামদের মধ্যে পুরনো ঢাকার অলিগলির মতো হাজারটা প্যাঁচ। ফলে কে কাকে মানবে কে কাকে মানবে না। এই সব বিষয়েও হয়তো ছবির হাট থেকে আসা অ্যাকটিভিস্টদের দ্বিধা ছিল। আর বলার অপেক্ষা রাখে না ছবির হাট একটা আড্ডার জায়গা কোনো সংগঠন না। কিন্তু BOAN একটা সংগঠন।

এখানে আরো একটা ইস্যু আছে। শাহবাগ ক্যাপচার করতে আওয়ামী লীগ যখন প্রেসার দিলো তখন এই প্রেসারটা খুব সিরিয়াস ছিল। সেই সময় যারা সামনের সারিতে ছিল তাদের দুই-একজনের মুখে শুনেছি সেই সময় তাদের উপর এমন থ্রেট এসেছিল যে তারা যদি বেশি তেড়িবেড়ি করে তো তাদের গুম করে দেয়া হবে। আমাকে একজন সিনিয়র অ্যাক্টিভিস্টের নাম নিয়ে একজন বলেছিলেন, ওই ভাইয়া গুম হয়ে যাবে এমন গুজবও ছড়িয়ে পড়েছিল।

এই হুমকি উপেক্ষা করা অসম্ভব ছিল। কারণ শাহবাগে যারা সামনে ছিল তারা সবাই ছিল পাতি বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত অবস্থান থেকে এসেছেন। তারা কেউ সংগ্রাম করে মৃত্যুর হুমকির ভিতরে জীবন কাটায় নাই। ফলে যখন জানের উপর রিস্ক আসছে তারা ভড়কে গেছেন এবং পিছু হঠেছেন। তাদের কথায় আমি বুঝেছি

এটা একটা মেজর ইস্যু ছিল। এবং আমি নিজেই যদি এই অবস্থায় পড়তাম তাহলে আমিও হয়তো তাদের মতো সিদ্ধান্ত নিতাম। তার উপরে সাংগঠনিক কোনো সাপোর্ট নাই, সাপোর্ট শুধু জনতার। আর জনতা খুব অস্থিরমনা এক জিনিস। জানের উপর হুমকি যখন আসে তখন বোঝা যায় জনতা একটা বায়বীয় এনটিটি। সংগঠন ছাড়া জনতার কোনো বেইল নাই।

এই সময়ে তারা পিছু হঠেন। এটা খুব স্বাভাবিক। কারণ এই চিন্তা সবার মধ্যে আছে যে আওয়ামী লীগ অসম্ভব শক্তিশালী একটা দল। তাদের অস্তিত্ব যদি হুমকির মুখে পড়ে তবে তারা যে কোনো মুহূর্তে যে কোন কিছু করতে পারে।

শাহবাগের তরুণদের ঐক্যবদ্ধ হওয়াতে একটা বিকল্প শক্তি দাঁড়াতে পারত। কিন্তু আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি এবং জামায়াত কোন মতেই সেইটা হতে দিত না। সেই ধরনের কিছু হলে সংঘর্ষ হত। সেই সংঘর্ষের দায় নেয়ার মতো সাংগঠনিক শক্তি শাহবাগের প্রণেতাদের ছিল না।

এবং শাহবাগ যখন প্রথমে হলো তখন একটা আরব বসন্ত টাইপের ভাব হয়েছিল এবং এর ফলে সেই সময়ে সরকারে ধাক্কা লাগবে এই রকম আলাপও অনেকে দিচ্ছিল। এবং আরব বসন্তের ধারাবাহিকতায় ক্রমাগত মার খেতে খেতে এবং সরকারি দুর্নীতিতে ত্যক্ত-বিরক্ত মধ্যবিত্ত যুবসমাজ একটা সরকার বিরোধী বিক্ষোভে নামবে এই রকম একটা এক্সপেকটেশন ছিল। এবং অনেকে ধরে নিচ্ছিল শাহবাগ সেটাই। এবং শাহবাগের সেই ধরনের একটা চরিত্র ছিল প্রথম তিন দিন, যখন সরকারের মন্ত্রীদেরকেও পানির বোতল ছুঁড়ে মারা হয়েছে।

এবং এই অবস্থায় আওয়ামী লীগ শাহবাগ দখলের জন্যে যে কোনো পরিমাণ ফোর্স অ্যাপ্লাই করবে সেটা সবাই জানত। এবং এটা মাথায় রেখেই হয়তো কেউ শাহবাগকে ধরে রাখার জন্যে ফাইট দেয় নাই। ফলে জাস্ট ভয় দেখিয়ে খুব অল্প ফোর্সে শাহবাগকে আওয়ামী লীগ ক্যাপচার করেছে।

ইমরান সরকার যখন ক্লেইম করেছেন যে তিনি নেতা, সবাই তার বশীভূত হয়েছে। BOAN-এর চিহ্নিত প্রো-সরকার ব্লগাররা যখন ডি-ফ্যাকটো ব্লগার হিসেবে সবাইকে ঠেলে সামনে আসছে তাদের কেউ চ্যালেঞ্জ করে নাই। জাগরণ মঞ্চের আশে পাশে ছাত্রলীগের ওয়ার্ড কমিটির লোক দিয়ে যখন ক্যাপচার করে রাখা হয়েছে তখন আর কেউ সাহস করে নাই সেটাকে চ্যালেঞ্জ

করতে।

এইটার সাথে সাথে একটা ইন্টেরেস্টিং ব্যাপার আমাকে বলেছেন বেশ কয়েকজন। শাহবাগের কয়েকজন সুপরিচিত ব্লগারকে সরকারের পক্ষ থেকে ব্ল্যাকলিস্ট করা হয় মিডিয়াতে। বলে দেয়া হয় এই ব্লগারদের কোনো চ্যানেলে বা টক শোতে ডাক না দিতে। এই অল্প কয় জন ব্লগারদের নিজস্ব স্বর ছিল এবং ভালো গ্রহণযোগ্যতা ছিল। তারা বিভিন্ন সময়ে ডাক্তার ইমরানের ন্যারেটিভকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন বা করতে সক্ষম ছিলেন।

এরা সবাই কিছুটা হলেও জাতীয় স্বার্থে ব্লগার অ্যান্ড অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টের সাথে সংযুক্ত ছিল। এই প্রতিষ্ঠানটি শাহবাগের পূর্বে মোটামুটিভাবে ছবির হাট এবং দেশব্যাপী প্রগ্রেসিভ ব্লগারদের একটা সংঘটন হিসেবে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিল। তারা বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছে নিজেদের ভয়েসটা শোনাবার জন্যে।

২৭ মার্চে ইত্তেফাকে নিউজ হয়েছিল

ইমরানের 'নরম' কর্মসূচির বিরুদ্ধে মঞ্চের একাংশ

গতকাল রাত সাড়ে আটটার দিকে গণজাগরণ মঞ্চের আহবায়ক ডা. ইমরান এইচ সরকার কর্মসূচি ঘোষণা করলে একে 'আপোষের কর্মসূচি' আখ্যা দিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন আন্দোলনরত তরুণদের একাংশ। তারা সাথে সাথেই বিক্ষোভ মিছিল করেন। মিছিলটি শাহবাগ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি, চারুকলাসহ বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। শ্লোগান ওঠে 'আপোষ নয়, সংগ্রাম-সংগ্রাম, সংগ্রাম'।

বিক্ষোভে অংশ নেয়া ১৯ টি সংগঠনের মধ্যে রয়েছে—জাতীয় স্বার্থে ব্লগার অ্যান্ড অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট, গণরায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী অধিকার মঞ্চ, শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্কোয়াড, আমরা, শহীদ রুমিস্কোয়াড, জেগে আছি, বিক্ষুব্ধ নারী সমাজ, ফাঁসির মঞ্চ, মুভিয়ানা, রাস্তা, অর্বাক, ম্যাজিক মুভমেন্ট, ঘাসের কেল্লা, আহমদ ছফা রাষ্ট্রসভা-সর্বজন, আদিবাসী ফোরাম, সাংস্কৃতিক মঞ্চ, তীরন্দাজ।

এই সংগঠনগুলো সম্পর্কে আমার চিন্তা হচ্ছে তারা অনেক পরে গিয়ে শাহবাগের ডাক্তার ইমরানের ন্যারেটিভ থেকে নিজেদের আলাদা করার চেষ্টা করেছেন। এবং এই সময়ে মিডিয়ার কোনো হাইলাইট ছিল না। শাহবাগ তিন

নাম্বার দিনেই ক্যাপচার হয়ে যায়। কিন্তু তারা শাহবাগের অগ্নিঝরা দিনগুলোতে হয় নিজেদের প্রভাব বলয় হারানোর ভয়ে খুব বেশি প্রতিবাদী হননি, অথবা নিজেদের অ্যাকটিভিজিমের ফসল শাহবাগের প্রতি তাদের মমতা এতো বেশি ছিল যে নিজের সন্তানের বিরুদ্ধে তারা যেতে চাননি।

শাহবাগের ডাক্তার ইমরান এবং আওয়ামী লীগ ন্যারেটিভের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কিছুটা সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল হয়ত প্রাতিষ্ঠানিক বাম দলদের কিন্তু তাদের সেই মানসিকতা ছিল না এবং তারা সরকারের বিরুদ্ধে যাবে না সেটা তারা ক্লিয়ার করে দিয়েছিল।

এখানে আমি কেন ডাক্তার ইমরানের পিছনে লাগলাম? কারণ ক্লিয়ারলি একটা অ্যান্টিএস্টাব্লিশমেন্ট মুভমেন্ট কখনো এস্টাব্লিশমেন্ট দ্বারা ব্যাকড হতে পারে না। হয় যখন, তখন সেটা এস্টাব্লিশমেন্টের পকেটে ঢুকে এস্টাব্লিশমেন্টের স্বার্থ রক্ষা করে।

আমি ইমরান সরকারের একটা সাক্ষাৎকারে পড়েছিলাম, তিনি বলেছেন শাহবাগ হচ্ছে শান্তিপূর্ণ মুভমেন্ট।

যে মুভমেন্টে সরকার নিজেই ল্যাট্রিন বসিয়ে দেয়, ইলেকট্রিসিটি দেয় গানের কনসার্টের মঞ্চের জন্যে, সেই মুভমেন্ট তো শান্তিপূর্ণ হবেই।

বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে, পুরো রাষ্ট্রযন্ত্র লুটপাটের জন্যে ম্যাক্সিমাইজড সেখানে একটা বিতর্কিত ইস্যুতে তরুণদের মুভমেন্ট কখনোই শান্তিপূর্ণ হয় না। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো অ্যান্টিএস্টাব্লিশমেন্ট মুভমেন্ট শান্তিপূর্ণ হয় নাই।

তখনই হয় যখন একটা লম্পট ভণ্ড এস্টাব্লিশমেন্টের চাওয়া তরুণদের চাওয়ার সাথে মিলে যায়। কিন্তু সেই মিল হওয়াটা খুব অস্বাভাবিক। শাহবাগে সেটা হয়েছে মঞ্চ 'ক্যাপচার স্টেজ'-এর পর থেকে।

বাংলাদেশের অনেক অনেক লোক শাহবাগকে শাহবাগীদেরকে দায়ী করে শাহবাগের পরবর্তী ঘটনাবলির জন্যে। আজকে তাদের কাছে এই মেসেজটা যাওয়া উচিত যে, শাহবাগের সবাই সরকারের দাস নয়। শাহবাগে এমন কিছু শাহবাগী আছে, যারা এই ঘাতক দালালদের ফাঁসির সাথে বাংলাদেশের ভেঙে পড়া বিচার ব্যবস্থার সংযোগ দেখে এবং যারা এই ট্রাইব্যুনাল যে জাস্ট আওয়ামী লীগের স্বার্থ রক্ষা করার গুটি হয়ে সরকারের ইচ্ছায় সরকারকে রক্ষার

করার জন্যে পরিচালিত হচ্ছে এবং এই বিচার হচ্ছে শুধু মাত্র আওয়ামী লীগের অন্যায় ঢেকে রাখার একটা চাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেটা শাহবাগে যারা গিয়েছিল তাদের অনেকে বোঝে। এবং এরা অনেস্টলি কোনো ‘ইফ কিন্তু বাট’ ছাড়া বিচার চায়। এমন এক বিচার যেটা কারো দ্বারা প্রভাবিত নয়। ৩০ লক্ষ মানুষের হত্যার বিচার করতে এরা আন্তরিক এবং আওয়ামী লীগ-বিএনপি-জামায়াত সকল দলের রাজাকারের বিচার এরা চায়। কারণ এরা ন্যায় বিচার চায় ৩০ লক্ষ শহীদ আর ২ লক্ষ রেপ হওয়া মা বোনের।

ইমরান সরকারকে নিয়ে ত্যানা প্যাঁচানো আমার এইখানেই শেষ। ব্যক্তি নিয়ে আলোচনা আমার খুব অপছন্দের কাজ। এইটা আমার ছোটলোকি মনে হয়। কিন্তু আমি সেই অপছন্দেও কাজটা করলাম। কারণ, জনতাই নেতা নাকি ডাক্তার ইমরান এইছ সরকার নেতা এই প্রশ্নটা পরিষ্কার হওয়ার দরকার ছিল। শাহবাগের ইমরান সরকার লক্ষ জনতার থেকেও বড় হয়েছেন। শাহবাগের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করেছেন এবং এর অনেক কিছুর দায় পুরো বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে নিতে হয়েছে। এই জন্যে ডাক্তার ইমরান কেন নেতা, এইটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নটার একটা ডিটেল ব্যাখা দেয়া দরকার ছিল।

চ্যাপ্টার ২১. শাহবাগ কিভাবে ডিসিশন নিত?

গণজাগরণ মঞ্চে ডাক্তার ইমরান ডিফ্যাক্টো নেতা ছিল কি ছিল না এইটা নিয়ে ডিবেট থাকবে। এবং আমি আমার মত ইন্টারপ্রেট করছি। কিন্তু তার চেয়ে বড় প্রশ্ন বোধ হয় শাহবাগ কিভাবে ডিসিশন নিত?

নেতা হওয়ার মূল ইস্যু হইল ডিসিশন। জাগরণ মঞ্চকে শুরু থেকে অনেকগুলো ডিসিশন নিতে হইছে। বলতে গেলে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে ডিসিশন নিতে হইছে। শাহবাগের কিছু মূল প্রশ্নের কথা আমি কনফিউশন স্টেজে বলছি। এরপরেও প্রতিদিন কে মঞ্চে উঠবে, কে মিডিয়ার মুখোমুখি হবে, রাজীব হত্যার পর কিভাবে রিঅ্যাক্ট করা হবে, মিডিয়াতে কখন কোন ভাষ্য হবে, কোন কোন দাবি বিভিন্ন সময় জানানো হবে এই সব বিষয়ে সব সময়েই ডিসিশন নিতে হইছে।

এই ডিসিশানগুলো শাহবাগ কিভাবে নিছে সেইটাকে বোঝা দরকার। একটা জিনিস পরিষ্কার হওয়ার দরকার যে শাহবাগের কখনোই কোন কমিটি হয় নাই। এইটা একটা ইম্পর্ট্যান্ট প্রশ্ন। কেন শাহবাগের কোনো কমিটি হয় নাই। যদি হত, তাহলে একজন ডিফ্যাক্টো নেতা থাকুক কি না থাকুক শাহবাগের ভেতরকার মানুষেরা বলতে পারত, যা ডিসিশন নিছে কমিটি নিছে।

এবং এই কমিটি যদি হইতো তাহলে শাহবাগের বিভিন্ন গ্রুপগুলোর একটা ফর্মাল রিপ্রেজেন্টেশন হইতো। এবং কমিটির মিথষ্ক্রিয়াতে ডিসিশনগুলো একটা বিভিন্নমুখী আইডিয়ার চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ত।

কিন্তু এইটা হয় নাই। এইটা উনারা হওয়াইতে পারেন নাই। আমাকে এখন কেউ যদি বলে, মিয়া, আপনি তো ছিলেনই না। আপনে কি জানেন? আমি তাদের কে বলব, মিস্টার ইনসাইডার, কমিটি হয় নাই কেন? কেন এত দিনের শাহবাগে আপনেরা একটা কমিটি করাইতে পারেন নাই?

উনারা কি উত্তর দিবেন এইটা উনারা জানেন। কিন্তু আমি যেইভাবে দেখি এই কমিটি না হওয়ানোর মূল ইস্যু ছিল শাহবাগের ডিসিশন মেকিংয়ের উপর BOAN-এর একচ্ছত্র আধিপত্য ধরে রাখা।

এবং এইটা আমার অবজারভেশানের সাথে মিলে। শাহবাগের ক্রিটিকাল ডিসিশন সব সময় BOAN এবং BOAN-এর সাথে ঘনিষ্ঠ ব্লগারদের কাছ থেকেই এসেছে। এবং এক পর্যায়ে এই গ্রুপে আওয়ামী লীগের নেতা এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের যাদেরকে শাহবাগে সব সময় দেখা গেছে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। এই ডিসিশনগুলো নেয়ার সময় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ফর্মাল মিটিং হয়েছে বঙ্গবন্ধুর ক্যাফেটেরিয়া বা অন্য কোথাও।

এবং অন্য অনেক ব্লগার এই ডিসিশনের সাথে জড়িত থাকলেও ক্রিটিকাল ইস্যুতে শাহবাগ এই গ্রুপটার মতামতকেই প্রকাশ করেছে।

কিন্তু এইটা ঠিক, ডিসিশন মেকিং প্রসেসে অনেকেই জড়িত ছিল। এই জন্যেই শাহবাগের অন্য অনেক স্টেকহোল্ডার এখনো বলতে পারেন যে, শাহবাগের মূল সিদ্ধান্তগুলোর সময় আমিও ছিলাম।

কিন্তু এইখানে যে ফাঁকিটা হইছে তা অনেক বাবা নির্ভর পরিবারে দেখা যায়।

পরিবারের ছোটখাট ডিসিশনগুলো মা নেন। মনে করেন, কাজের লোক কে হবে, খাবার কি হবে? দাওয়াতে কি গিফট হবে? কিন্তু ক্রিটিকাল ইস্যুতে যেমন বাচ্চা কোন স্কুলে পড়বে, মেয়ের পছন্দ করা পাত্রকে মেনে নেয়া হবে কিনা, সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে কি করা হবে? এইসব সিদ্ধান্তে সব সময়ই বাবার মতামত গৃহীত হয়। বাবার সাথে মা যদি দ্বিমত হয় তো বাবার সিদ্ধান্তটা সব সময় এস্টাবলিশ হয় ১০০% টাইমে কোন ইফ কিন্তু বাট ছাড়া। কেউ প্রতিবাদ করে না। কারণ সবাই জানে বাবাই পরিবারের প্রধান।

আমি মনে করি শাহবাগের ক্ষেত্রেও এই বিষয়টা হইছে। কিছু ডিসিশন অন্য ব্লগার বা অন্য গ্রুপগুলোর হাতে ছিল। কিন্তু মূল ডিসিশানে কখনই আমি আবার বলি কখনোই ইমরান সরকার, বাই প্রক্সি প্রো-আওয়ামী লীগ ব্লগার, বাই প্রক্সি আওয়ামী লীগের চিন্তার বাহিরে হয় নাই। এবং শাহবাগে এমন একটা সিচুয়েশন সৃষ্টি করা হইছিল যে, তিন নাম্বার দিন থেকেই যে সরকারি যেই ন্যারেটিভটা দেয়া হইছে সেইটার বাহিরে কোন সিদ্ধান্ত আলোচনা করাও ছিল অগ্রহণযোগ্য একটা ব্যাপার। পরিবেশটাই ছিল সেই রকম। ইমরান সরকার আর তার ব্যাকাররা যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন বাংলা পরীক্ষার দিন বাংলা পরীক্ষা দিতে হবে এবং এই

এজেন্ডাই সামনে পুশ করা হবে তখন আপনি স্বতন্ত্র সত্তা হলেও সেই মূল ডিসিশনের বাহিরে যেতে পারছেন না। এবং এই ধরনের কথা বললেই আপনি ছুপা ছাগু। শাহবাগের টগবগে রক্তের তারুণ্যের উৎসবের সময় কে নিজেকে ছুপা ছাগু বানাবে? এত আনকুল হইলে তো ইজ্জত থাকবে না।

আমি ছোট্ট একটা রেফারেন্স টানি। আমি শাহবাগ নিয়ে একটা গান করেছিলাম। তাতে একটা লাইন ছিল, 'শহিদেরা কি চেয়েছিল এই দেশ, কেঁচি গেটে পুড়ে কয়লা শ্রমিক, লুট করে ব্যাঙ্ক, নদী সেতু রেলওয়ে ওরা সেজেছে দেশপ্রেমিক। শ্লোগানে শ্লোগানে আমার ভেঙে যায় গলা, ধর্ষিতা বাংলা মা, তার শূন্য ভাতের থালা বাড়িয়েছে তোমার পানে আজ শাহাবাগে।'

এই গানটার মিউজিক ভিডিও বানিয়েছিলাম কিছু ছবিকে কোলাজের মতো করে। এবং এইখানে তাজরিন গার্মেন্টসের শ্রমিকদের পোড়া লাশের ছবি ছিল। এই ছবিটাকে একজন ছুপা ছাগু হিসেবে অভিহিত করে।

এরপর আমি গানটা আর ভিডিওটা নামিয়ে ফেলি।

এই ইস্যুটা হলো। মঞ্চ থেকে মেসেজ যখন নির্ধারণ করা হয়ে গেছে যে শাহবাগ শুধু বাংলা পরীক্ষা দেবে তখন সেইটা খুব শক্তভাবে রক্ষা করা হইছে যে কোনমতেই এই মেসেজের বাহিরে যেন কেও না যায়। ফলে শাহবাগের জনতা বা ইনসাইডার কেউ কখনই 'কনফিউসান স্টেজ'-এর যে উত্তরগুলো নির্ধারণ করা হয়েছিল তার বাহিরে যেতে পারে নাই।

চ্যাপ্টার ২২. জানার বিষয়—শাহবাগ এবং গণজাগরণ মঞ্চ আলাদা জিনিস

এই খানে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বুঝতে হবে। যেটা স্ট্র্যাটেজি শিক্ষার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা লেসন। স্ট্র্যাটেজি শিক্ষা বলে আপনাকে ক্ষমতার কেন্দ্র দখল করতে হবে। এবং কেন্দ্রকে দুর্বল করার জন্যে তার সকল ক্ষমতার উৎস এবং সরবরাহ লাইন কেটে দিতে হবে।

BOAN-এর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটা করে।

এই জন্যে আপনার বুঝতে হবে, শাহবাগ এবং গণজাগরণ মঞ্চ দুইটা আলাদা জিনিস।

এক অর্থে আওয়ামী লীগ কখনই শাহবাগকে দখল করে নাই। তারা দখল করছে

গণজাগরণ মঞ্চ। এইটা আওয়ামী লীগের ব্যাপক পরিপক্কতার আর একটা উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

শাহবাগের ডিসিশন মেকিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি ক্রিটিকাল ডিসিশন বাদে অনেক ছোটখাটো ইস্যু BOAN শাহবাগের সতীর্থদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। ঠিক সেই ঘটনাটা ঘটে জাগরণ মঞ্চ আর শাহবাগের ক্ষেত্রে।

BOAN মূলত দখল করেছে জাগরণ মঞ্চ যেইটা শাহবাগের মূল মঞ্চ এবং মূল ডিসিশানের প্ল্যাটফরম। যেইখান থেকে সব ভাষণ বক্তৃতা আসছে। সেইখান থেকে সিদ্ধান্তগুলো আসছে। মিডিয়ার মুখোমুখি হইছে। সেইখান থেকে ঘোষণা আসছে। সেন্ট্রাল লোকেরা ঘোরাফেরা করছে।এইটা মনে করেন রাজধানীর মতো সেন্টার।

BOAN এবং বাই প্রক্সি আওয়ামী লীগ শুধু জাগরণ মঞ্চ দখল করেছে কিন্তু বাকি শাহবাগের বিশাল ভূমি তারা দখল করে নাই, দখল করার কোন দরকার ছিল না। বাকি শাহবাগের বিশাল পটভূমি জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ আসছে গেছে, পথ নাটক করছে, রাস্তায় ছবি আঁকছে, গান করছে, উৎসব করছে পুরো শাহবাগ জুড়ে। কিন্তু জাগরণ মঞ্চ সব সময়ই (৮ তারিখের পরে) BOAN এবং বাই প্রক্সি সরকারের হাতে ছিল।

ফলে যেইটা হইছে শাহবাগের সাথে জড়িত অনেকেই এই ভ্রমটার মধ্যে ছিলেন যে, তারাই শাহবাগের ইম্পর্ট্যান্ট মুভার শেকার। কিন্তু গুটি যে জাগরণ মঞ্চের হাতে এবং জাগরণ মঞ্চ যে BOAN-এর হাতে আর BOAN যে আওয়ামী লীগের পকেটে এইটা উনারা সব সময়ই স্বীকার করছেন কিন্তু সেইটার মাজেজাটা উনারা উপলব্ধি করতে পারেন নাই বা করলেও সেটার প্রতিবাদ জোর গলায় করেন নাই।

এবং এইটা শুধু অর্গানাইজাররা না, শাহবাগের জনতাও উপলব্ধি করতে পারে নাই। জনতা তার মতো নিজের ভয়েস দিয়ে গেছে উৎসব করছে। ঘাতক দালাল দের বিচার চাইছে। জনতারও সীমাবদ্ধতা ছিল। জনতাও কখনই কনফিউশন স্টেজে যেই সিদ্ধান্তগুলো নেয়া হইছিল শাহবাগ সরকার বিরুদ্ধে যাবে না, ট্রাইবুনাল শুদ্ধ করার দাবি দিবে না, শুধু ফাঁসি চাইবে, অ্যান্টিএস্টাব্লিশমেন্ট হবে না, সব রাজাকারের বিচার চাইবে না, এই ডিসিশনগুলোর বাহিরে যেতে পারে নাই।

যাদের বয়ান এই সিদ্ধান্তগুলোর সাথে অসম্মত ছিল তারা শাহবাগে যায় নাই। বা গেলেও চুপ করে, বিড়ি ফুঁকে চলে আসছে। নিজের ভয়েস দেয় নাই। কারণ শাহবাগ এই সময় খুব পরিষ্কার সিদ্ধান্ত দিছিল, এই সিদ্ধান্তগুলোর বাহিরে যারা চিন্তা করে, তারা ছুপা ছাগু।

ফলে সেই সময়ের উন্মাদনার মতো সংস্কৃতিক আবহে এই ধরনের কথাগুলো বলার মতো ভয়েস কেউ ছিল না। আমিও আজকে এক বছর পরে এসে এই সব কথা বলছি। কিছু কিছু সেই সময় বলেছি বটে, কিন্তু বলে গালি খেয়ে চুপ মেরে গেছি। এই গ্রন্থের প্রধান দুইটা অংশ সেই সময় লেখা কিন্তু তখন পাবলিশ করি নাই।

তবুও শাহবাগের জনতার কিছুটা হলেও স্বতন্ত্রতা ছিল। কিন্তু গণজাগরণ মঞ্চ ছিল খুব কঠোর ভাবে সুরক্ষিত। এর পাশে ২৪ ঘন্টা শিফট করে পাহারা ছিল। এইটায় কে উঠতে পারবে, কে পারবে না। কে বলতে পারবে, কে পারবে না। কি বলতে পারবে কি পারবে না, তা নিয়ে কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়ম মেনে চলা হয়েছে সম্পূর্ণ শাহবাগের আন্দোলনের সময় জুড়ে।

এইটা শাহবাগের অন্যতম প্রধান ইস্যু যেইটা এই গ্রন্থের পাঠকের জানা উচিত, শাহবাগ এবং জাগরণ মঞ্চ দুইটা আলাদা জিনিস। সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ আলাদা সত্বা।

চ্যাপ্টার ২৩. শাহবাগ এবং ফারাবী

শাহবাগের দিনপঞ্জি বর্ণনা করার সময়ে আমি কয়েকবার ফারাবী নিয়ে নিউজ হাইলাইট করেছি আগে। সেইটা খেয়াল করেছেন নিশ্চয়ই। এইটা করার একটা কারণ আছে। কারণ ফারাবীর ঘটনা দিয়ে শাহবাগের কিছু জিনিস বোঝা যায়।

প্রথমে বলি ফারাবী কে।

ফারাবী একজন ফেসবুকার বা ফেসবুক ভিত্তিক ব্লগার। যে ছবির হাটের প্রগতিশীলদের সম্পূর্ণ অ্যান্টিথিসিস। ফারাবী ইসলামিক ইস্যু নিয়ে ফেসবুকে লেখালেখি করত। কিন্তু সে ছিল একটু সরল টাইপের একটা ছেলে। সিরিয়াস কোন চরিত্র না।

সে বিভিন্ন মানুষের মেইল বক্সে তার নোট শেয়ার করত। আবার জিনজাতির ইতিহাস নিয়ে এটা সেটা কথা বলেও অনেক হাসির উদ্রেক ঘটাত। এবং

অনেকের মুখে শুনেছি সে ইনবক্সে গিয়ে মোবাইলে ফ্লেক্সিলোড করে দিতে রিকোয়েস্ট করত। এই বিষয়ে আমি শিওর না। কিন্তু অনেকের মুখে শুনেছি।

ছবির হাটের বিশেষত নারী সদস্যেদের মধ্যে ফারাবী নিয়ে অনেক হাসাহাসি দেখতাম। ছবির হাট ভিত্তিক গ্রুপগুলোর সাথে ফারাবীর ফেসবুকে ক্যাচাল লেগেই থাকত। বা ফারাবীর বিভিন্ন স্ট্যাটাসে ইনারা ক্যাচাল করতেন আর ফারাবিও এদের পোস্টে গিয়ে ক্যাচাল করত যেইটা ছিল ইসলামিক টাইপ এবং সেক্যুলার টাইপের মধ্যে, আস্তিক নাস্তিক বিতর্ক বা এই ধরনের ইস্যুর একটা হালকা মাত্রার নন-সিরিয়াস ঠোকাঠুকি।

ছবির হাটের গ্রুপগুলোর আলাপে একবার দেখলাম ফারাবী ছবির হাটে ভ্রমণে এসেছে এবং এইটা নিয়ে ছবির হাটে বেশ আলোড়ন পড়ে যায়। এবং অনেকেই বলেন ফারাবীর মতো মৌলবাদীর সাথে তারা মিশবে না, আবার অনেকেই ফারাবীর সাথে ছবি তুলে শেয়ার দেয়। এইটা নিয়ে খুব হাসাহাসি হয়। ফারাবীর ফেসবুকে ওয়ালে গিয়েও দেখলাম ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসের ছবির হাটের ভ্রমণের একটা ছবি যেইটায় টাইটেল হচ্ছে, একঝাঁক মুক্তমনাদের সাথে আমি ফারাবী।

মোট কথা, হালকা ধরনের চরিত্র ফারাবী ছবির হাটের এই গ্রুপটার অনেকের সাথে সংশিস্নষ্ট ছিল। এবং তাদের মধ্যে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ ক্যাচাল ছিল।

যাই হোক।

শাহবাগে রাজীব হত্যার পর রাজীবের লাশ যখন শাহবাগে আসল তখন ফারাবী একটা স্ট্যাটাস দেয় যে, যেই ইমাম রাজীবের মতো ধর্মত্যাগীর জানাজা পড়ে তাকে হত্যা করতে হবে (বা করা হবে, বা করবে—এই ধরনের কিছু)।

টিপিকাল ফারাবী।

এই স্ট্যাটাসটাকে শাহবাগ খুব সিরিয়াসলি নেয়। এবং শাহবাগ থেকে ফারাবীর গ্রেফতারের ডাক ওঠে। এবং ফারাবীকে গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেফতার করতে উদ্যোগ নেয়। ফারাবী পালিয়ে যায়। এবং এই নিয়েও নিউজ পেপারে আসে। পরে ফারাবী গ্রেফতার হয় ২৫ ফেব্রুয়ারি। এই নিয়ে প্রথম আলোতে পর পর তিন তিনটা প্রতিবেদন আসে। তিনটাই বেশ বড় বড়। মানে প্রথম আলো এবং সে সময়ের মিডিয়া ফারাবীর গ্রেফতার অনেক গুরুত্ব দিয়ে ছাপে। এবং শাহবাগের নেতৃবৃন্দের কাছে ফারাবীর গ্রেফতার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল।

এই পুরো ঘটনা থেকে আপনি কয়েকটা ডিডাকশান নিতে পারবেন।

এর মধ্যে প্রথমটা হলো শাহবাগের নেতৃত্বে যারা ছিলেন, তারা বোঝেন নাই কি বড় একটা দায়িত্ব তাদের হাতে। তারা নিজেদেরকে ছবির হাটের সীমানার থেকে বেশি বড় কিছু ভাবেন নাই। বা ভাবতে পারে নাই। তারা রিয়ালাইজ করেন নাই। তাদের ইচ্ছা, তাদের চিন্তা, তাদের ভাবনার দিকে তখন পুরো রাষ্ট্র তাকিয়ে আছে।

তাদের আড্ডার গ্রুপের ঝগড়া এবং ক্যাচালকে শাহবাগের সেই নেতারা রাষ্ট্রযন্ত্রের একটা মূল ইস্যুতে রূপান্তরিত করেছিলেন।

আসলে, শাহবাগে কি হচ্ছে সেইটা সরকার বা মিডিয়া কেউ ঠিকমতো ঠাহর করতে পারে নাই। প্রথম দিকে সবাই মনে করছে এইটা মিশরের তাহরীর টাইপের কিছু। তাই সরকার শাহবাগ কে ক্যাপচার করছে। গুরুত্ব দিছে। এবং শাহবাগ থেকে যেইসব সিগনাল আসছে মিডিয়া এবং সরকার সেইটা অনুসারে মুভ করছে।

রাজীবের বাসায় প্রধানমন্ত্রী গেছেন। রাজীবের জানাজায় প্রধানমন্ত্রী পুত্র জয় আসছেন। ফারাবী স্ট্যাটাস দিছে তার স্টাইলে। এর পর তাকে গ্রেফতারের ডাক উঠছে। তাকে খুঁজে খুঁজে গ্রেফতার করা হইছে। সেইটা রাষ্ট্রের প্রধান পেপারগুলায় গুরুত্বপূর্ণ নিউজ হইছে পর পর তিন দিন।

শাহবাগের নেতৃবৃন্দের ইম্যাচিউরিটি এবং তারা যে রাষ্ট্রের এত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসে আছেন এবং সেইটা নিয়ে তাদের সচেতনতার যে অভাব ছিল সেইটাই ফারাবী এপিসোডে পরিষ্কার হয়ে যায়। এবং এই সব ছেলে খেলায় পরবর্তীতে এই রাষ্ট্র নিম্নে ৫০০ উর্ধে ১০০০ মানুষের প্রাণ ধ্বংস হয়। এবং এর দায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে যুগে যুগে টানতে হবে।

অবশ্যই তার দায় শাহবাগের গণজাগরণের নয়। সেই দায়, মাহমুদুর রহমানের এবং সরকারের। কিন্তু, রাজীব হত্যার পর এই শক্তিগুলোর হাতে এই অস্ত্রগুলো তুলে দেয় শাহবাগের নেতৃত্ব।

আমি এই জন্যে ফারাবী এপিসোডটা হাইলাইট করলাম। কারণ শাহবাগের নেতৃত্বের বাংলাদেশ রাষ্ট্র সম্পর্কে এবং নিজেদের অ্যাকশনের প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতার যে অভাব ছিল এইটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। সেইটা যেমন BOAN-এর ছিল না এমনকি ছবির হাটের গ্রুপগুলোরও ছিল না। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জীবনের

এই মাহেন্দ্রক্ষণে এসে এই ধরনের কাণ্ডকীর্তির ফলাফল হিসেবে ছবির হাট এবং শাহবাগ তার উপর অর্পিত ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়।

এইটা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দীনতা, চিন্তার দীনতা, বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের দীনতা, প্রগ্রেসিভ মুভমেন্টের শৈশব লেভেলে পড়ে থাকার একটা উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

শাহবাগ ক্যাপচার হওয়ার অন্যতম কারণ যেমন, আওয়ামী লীগের শক্তি, ঠিক তেমনি আর একটা কারণ, শাহবাগের সাথে সংশিস্নষ্ট গ্রুপগুলোর বুদ্ধিবৃত্তিক দীনতা। আওয়ামী লীগের মানি, মাসল, শক্তি এবং চিন্তার সাথে লড়াই করার মতো সক্ষমতা তাদের ছিল না। ফারাবীর ঘটনাটা আমি এই জন্যে এত হাইলাইট করলাম।

চ্যাপ্টার ২৪. শাহবাগের উৎসব, তারুণ্য এবং দেশপ্রেম

শাহবাগের বিস্ফোরণ শুরু হওয়ার একদিনের মধ্যেই শাহবাগ নিয়ে পেপার এবং মিডিয়ার বয়ান যদি দেখেন তাতে তারুণ্য, উৎসব, জাগরণ এই ধরনের বাজওয়ার্ড খুব হাইলাইট হইছে। এইটার একটা কারণ আছে, যেইটাকে অল্প করে হইলেও আলোচনা হওয়া দরকার।

শাহবাগ কোন ইফ কিন্তু বাট ছাড়া শহুরে মধ্যবিত্ত তরুণদের বিপ্লব ছিল যেইটার একটা প্রধান এলিমেন্ট ছিল দেশপ্রেম।

শহুরে-মধ্যবিত্ত-তরুণ-দেশপ্রেম—এই চারটা শব্দই যারা বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট মার্কেটিং করে তাদের জন্যে ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট।

বাংলাদেশের সকল পুঁজি এবং টাকাপয়সা শহরে বিশেষত ঢাকা শহরে কেন্দ্রীভূত। ফলে শহুরে মার্কেট পণ্য বিক্রেতাদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ টার্গেট মার্কেট।

এরপরে আসেন মধ্যবিত্ত। মধ্যবিত্ত বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মার্কেটিং সেগমেন্ট। কারণ বাংলাদেশ এফএমসিজি মানে (ফাস্ট মুভিং কনজিউমার গুডস) বেচে যেইসব কোম্পানি তাদের জন্যে মধ্যবিত্ত সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেগমেন্ট। কারণ নিম্নবিত্তের কেনার ক্ষমতা নাই, আর উচ্চবিত্তের সাইজ ছোট। তাই যারা টুথপেস্ট বা সাবান বেচে বা বিভিন্ন ধরনের প্যাকেট ফুড বা এই

ধরনের প্রোডাক্ট বেচে তাদের জন্যে মধ্যবিত্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেগমেন্ট।

এরপরে আসেন তরুণ। বাংলাদেশে টেলকো কোম্পানিগুলো যেমন গ্রামীণ, বাংলালিংক, রবি বা অন্য সব কোম্পানির বিগত ১০ বছরের প্রোডাক্ট সেল করার সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল তরুণ বা তারুণ্য। এই জন্যে দেখবেন সবগুলো কোম্পানি তারুণ্য যৌবন এই বিষয়গুলোকে তাদের মার্কেটিং এ ফুটিয়ে তুলে। এইটা যে কোন মোবাইল কোম্পানির অ্যাড দেখলেই বুঝবেন।

এরপরে আছে দেশপ্রেম। বাংলাদেশ অত্যন্ত ডিভাইডেড একটা দেশ। কিন্তু একটা জিনিস আমাদের সবার আছে। (বা আছে বলে আমরা মনে করি) সেইটা হলো দেশপ্রেম। এবং শাহবাগ ছিল দেশপ্রেম প্রকাশের একটা প্রধান আউটলেট।

ফলে শাহবাগ যখন হইছে তখন এফএমসিজি, মোবাইল, ব্যাঙ্কিং হতে শুরু করে সবগুলো কোম্পানি তাদের প্রধান মার্কেট সেগমেন্টের মধ্যে একটা ট্রেন্ড দেখতে পারে। এইসব কোম্পানিতে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে এমবিএ-ওয়ালা পিএইচডিওয়ালা মেধাবি কর্মকর্তা পোষা হয় রিসার্চ করে শহুরে, মধ্যবিত্ত, তরুণদের ট্রেন্ড বোঝার জন্যে।

ফলে শাহবাগের জন্ম হওয়ার পর পুরো দেশের নজর যখন শাহবাগের দিকে তখন আমরা দেখি স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর বিভিন্ন প্রোগ্রামের সুন্দরী প্রেজেন্টাররা নিজেরাও মাথায় পট্টি বেঁধে শাহবাগে সাক্ষাৎকার নিচ্ছে এবং ২৪ ঘন্টা লাইভ সম্প্রচার করছে। কারণ এই সম্প্রচার এবং সম্প্রচারের ফাঁকে ফাঁকে বিজ্ঞাপন বাংলাদেশের কর্পোরেট জগতের জন্যে ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনালে বাংলাদেশের খেলার মতো আকর্ষণীয় ছিল। ফলে ভিজুয়াল মিডিয়া তার অ্যাডভারটাইজারদের জন্যেও শাহবাগকে নিয়ে আরও মেতে ওঠে।

এই শাহবাগের জাগরণ যদি গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে হইত তাহলে তাদের একটা নিউজ করা বাদে কোনো আগ্রহ থাকতো না। কারণ তাদের অ্যাডভারটাইজার বা যাদের টাকায় চ্যানেল চলে তাদের আগ্রহ থাকতো না।

এইটা খুব স্বাভাবিক একটা ঘটনা। পুরো বাংলাদেশটাই এখন এই ভাবে বাণিজ্যায়িত। এমন কিন্তু না শাহবাগের বাণিজ্যিক উপাদান খুব প্ল্যান করে সাজানো হইছে বা এমনও না যে কেউ বসে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে টিআরপি রেটিং বাড়ানোর জন্যে কারেন্ট ট্রেন্ড শাহবাগকে এখন ফোকাস করা হবে।

এইটা এখন বাংলাদেশের বাণিজ্যায়িত এস্টাব্লিশমেন্টের একটা অর্গানিক ব্যাপার। এইটা ন্যাচারাল প্রসেসেই হয়।
এবং শাহবাগ শেষ হয়ে যাওয়ার অনেকগুলো মাস পর্যন্ত আমরা দেখি বাংলালিংক, রবি, গ্রামীণ সবাই দেশপ্রেম থিম নিয়ে অ্যাডভারটাইজমেন্ট এবং প্রমোশন করছে। যেমন রবির বিজ্ঞাপন ছিল কে বেশি দেশপ্রেমিক, ইত্যাদি ইত্যাদি।

চ্যাপ্টার ২৫. শেষ কথা

শাহবাগ। অনেক বড় একটা নিঃশ্বাস নিয়ে শব্দটা উচ্চারণ করা যায়। শব্দটার মধ্যে অনেক মিষ্টি একটা মাধুর্য আবার একটা রাজকীয় গাম্ভীর্য আছে। এই আন্দোলন যদি হারমাছি লেন বা জাঙ্গালিয়াতে হত তাহলে সেই কাব্যময়তা আমরা মিস করতাম।
শেষের দিকে একদিন শাহবাগ গিয়েছিলাম। দিন-তারিখ খেয়াল নেই। কোন স্ট্যাটাসও দেইনি। র‍্যাবের সিকিউরিটি গেট দিয়ে শৃঙ্খলিত দাসের মতো একলাইনে হেঁটে শাহবাগের ভেতরে ঢুকলাম। ঢুকতে ঢুকতে শুনছিলাম মঞ্চ থেকে একটা মেয়ে ভাষণ দিচ্ছে ফাঁসি চাই টাইপের কিছু শ্লোগান। সামনে জনা পঞ্চাশেক লোক।
বিকেল ছিল। পাশে পাবলিক টয়লেট এবং একটা কনসার্টের জায়গা পার হয়ে আমি ছবির হাটে ঢুকি। যেই শাহবাগ ৭ তারিখে দেখেছিলাম লক্ষ লক্ষ মানুষ অসাধারণ উন্মাদনা সেই শাহবাগ থেকে এই শাহবাগ অনেক দূরে।
আমার মনে হয়েছিল, শাবাস, আওয়ামী লীগ!
আমি অনেকবার বলেছি যতদূর আপনারা পড়লেন সেইটা বলতে গেলে আমার ফেসবুকে দেখা শাহবাগ। আর তার সাথে আমার অল্প কিছু পরিচিত অ্যাকটিভিস্টের সাথে ইনফরমাল আলাপ, নিজের অবজারভেশনভিত্তিক অ্যানালিসিস। এইটা শাহবাগ নিয়ে পরিপূর্ণ গবেষণা নয় এইটা আমার নিজস্ব অ্যানালিসিস। এইটা আপনার নিজের শাহবাগের সাথে নাও মিলতে পারে। আমার অ্যানালিসিসের সবচেয়ে বড় সমালোচনা যেইটা হতে পারে, সেইটা হলো

‘আপনি যেমনে শাহবাগ দেখছেন, শাহবাগ তো তেমনে চলবে না মিস্টার। শাহবাগ তার নিজস্ব গতিতে আগাইছে। যেইটা হইছে সেইটা সেই সময়ের দাবি ছিল, ভবিতব্য। আপনে ক্যাডা যে বলার এইটা এই রকম না হয়ে সেই রকম হওয়ার কথা ছিল। আপনি চাইছেন শাহবাগ যেন তাহরীর স্কয়ার হয়। কিন্তু শাহবাগ সেইটা চায় নাই। শাহবাগ শাহবাগ হইতে চাইছে। কোত্থেকে আসছেন মিয়া, বেইল ছাড়া পাবলিক। এখন বেশি বুইঝেন না। যান ফুটেন!’

আমি মানবো।

এইটা আমি স্বীকার করি। আমি ব্যক্তিগতভাবে শাহবাগকে অ্যান্টিএস্টাব্লিশমেন্ট বিক্ষোভ হিসেবে দেখি। আমি দেখি কাদের মোল্লার ফাঁসির জন্যে যেই জনতা সেইটা ছিল জাস্ট একটা স্ফুলিঙ্গ। যেইটায় তরুণেরা প্রথম দাবির কারণে নিজেদেও সংগঠিত করেছিল এবং তারা একটা সংগঠিত এনটিটি হিসেবে রাষ্ট্রের মুখোমুখি হয়েছিল। এবং এই তরুণেরা শাহবাগ থেকে সংগঠিত হয়ে একটা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আসতে পারত।

মধ্যবিত্ত আরবান তরুণদের কমন কিছু স্টেক আছে। শাহবাগ কাদের মোল্লার ফাঁসি বা যুদ্ধাপরাধের বিচার সেই স্টেকগুলো দাবি করার সূচনা হতে পারত। শাহবাগ অনেক কিছুই হতে পারত। শাহবাগ থেকে পুরো বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পরিবর্তনের সূচনা হতে পারত। সেইসব সম্ভাবনার মৃত্যু ঘটে শাহবাগকে যেইভাবে চালিত করা হয় তার কারণে।

আওয়ামী লীগের শঠতাপূর্ণ হাস্যকর নির্বাচন শেষ হয়ে যাওয়ার পর আজকে ২০১৪ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে জাগরণ মঞ্চের বেশ কিছু বন্ধুকে দেখলাম অ্যান্টি আওয়ামী লীগ ডাক দিচ্ছে। এবং জাগরণ মঞ্চকে দেখলাম বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মিটিং করতে। অনেকের কথায় মনে হচ্ছে, জাগরণ মঞ্চ এখন একটা পলিটিকাল প্ল্যাটফরম হিসেবে আসতে চাচ্ছে। ডাক্তার ইমরানের একটা সাক্ষাতকারও পড়লাম যেটায় উনি বলার চেষ্টা করেছেন শাহবাগ ছিল রাজনৈতিক। এইটা দেখে আমার অদ্ভুত ফিলিং হইছে। মুখ তিতা তিতা লাগছে। নিজের সন্তানকে গলা টিপে মারার পর সেই লাশ নিয়ে রাজনীতির মতো মনে হইছে। আমরা পুরো আলোচনায় দেখছি জাগরণ মঞ্চ যাতে কোন ভাবেই পলিটিকাল হতে না পারে, বাংলা পরীক্ষার দিন বাংলা পরীক্ষা ছাড়া অন্য কিছু দিতে না পারে এই জন্যে যারা দিনান্ত পরিশ্রম করছে—তারা এখন আওয়ামী

লীগ নির্বাচিত হওয়ার পর আবার নতুন দলের ডাক দিচ্ছে? এইটা কি হয়? এই দেশের মানুষ কি এত নির্বোধ? পুরো এক বছর ধরে সরকারের ধামা ধরে জাগরণ মঞ্চ নিজেকে ডিলিটিজিটিমাইজ করছে। নিজেকে প্রমাণ করছে সরকারের অস্ত্র হিসেবে। হেফাজত যখন ঢাকা আসলো তখন তারা হেফাজত ঠেকানোর ঘোষণা দিছে—যেইটা ক্লিয়ারলি ছিল সরকারের অস্ত্র হিসেবে সাপ মারার মতো একটা রোল। এখন তারা কিভাবে গ্রহণযোগ্য দল হবে।

এই কাজটার টাইমিংটাই সন্দেহজনক। সরকার নির্বাচন করে জিতে আসলো তারপর এই আওয়াজ দিলেন। এমন কি নির্বাচনের পূর্বেও যদি এই আওয়াজ দিতেন তাইলেও একটা সুযোগ ছিল। কিন্তু এখন তো মানুষ সন্দেহ করবেই।

তবুও এই পৃথিবীটা অনেক জটিল। কে, কেন, কি উদ্দেশ্য করে সব কিছু জানা বা বোঝা সম্ভব না। কিন্তু জাগরণ মঞ্চকে রাজনৈতিক দল হওয়ার চেষ্টা করতে দেখলে খুব দুঃখ লাগে বা ভেতর থেকে প্রচণ্ড রাগও হয়। তাইলে কেন আমাদের স্বপ্নকে হত্যা করলি কেন আমাদের জাগরণের সময় বললি বাংলা পরীক্ষা বাদে আর কোন পরীক্ষা দেয়া যাবে না। এইটা নিজের সন্তান হত্যাকারীকে ক্ষমা না করার মতো একটা ব্যাপার। কারণ শাহবাগে যেইভাবে মানুষ জেগেছিল সেইরকম ডেইলি ডেইলি হয় না। আর ২০ বছরেও না হতে পারে। এখন সেই রকম সময়ে কেন তোরা এতগুলো মানুষের স্বপ্নকে আওয়ামীকরণ করে এস্টাবলিশমেন্টের ধামাধরা হইলি?

আরও একটা জিনিস আমার অবাক লাগে। আমি যাদেরকে শাহবাগের শুদ্ধস্বর হিসেবে জানি তারাও কখনো পাবলিকলি শাহবাগকে ডিজওন করেন নাই এবং শাহবাগের ভেতরের অন্তর্দ্বন্দ্বগুলো নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলেন নাই। উনারা প্রাইভেটলি বলেছেন অনেক কিছু। এ বিরানি খাইছে, ও সেইটা করছে, সে লিস্টি সাপ্লাই করছে, ও দালাল, ব্লা ব্লা ব্লা।

কিন্তু উনারা সামনে সবসময় এই স্বার্থ বেচা নকল শাহবাগের পক্ষ থাকছেন। এইটা আমাকে খুব অবাক করছে। ফলে যেইটা হইছে, উনারা বুঝেন নাই উনারাও নিজেরা ডিলিজিটিমাইজড হইছেন। কিন্তু উনারা ধরে নিছেন যারা উনাদেরকে ডিলিজিটিমাইজ করছে তারা সবাই ছাগু, ফলে ওদেরকে পাত্তা না দিলেও হবে। কিন্তু উনারা বুঝেন নাই যেই তরুণেরা উনাদের ডাকে শাহবাগ গেছিল তাদের একটা বড় অংশ ধরতে পারছে তাদেরকে নিয়ে একটা গেম

হইছে। এবং এই তরুণেরাই উনাদেরকে সবার আগে বর্জন করছেন।

আমার কাছে মনে হয় যখন ক্লিয়ার হইছে, শাহবাগ ক্যাপচার হয়ে সরকারের পাপেট হচ্ছে, জাগরণের প্রথম আট দশদিনেই যদি বেশ কিছু কণ্ঠ আওয়াজ দিত—আমরা মানি না। আমাদের শাহবাগ ফিরিয়ে দাও। তাহলে তারা এখন অনেক সামনে থাকতেন। কারণ তখন একটা মিডিয়া ফোকাস ছিল। এই মিডিয়াফোকাস খুব ইম্পরট্যান্ট জিনিস। বামেরা এই মিডিয়াফোকাস পায় না বলেই তাদের মেসেজ নিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে না। সাহসী হয়ে এই সময়টায় এই শব্দগুলো উচ্চারণ করলে তাদের মেসেজটা আরও ছড়িয়ে পড়তো।

তখন কিছু হোক না হোক, জনমানুষ সিগন্যাল পেত, শাহবাগী গালটা যাদের দেয়া হচ্ছে তাদের মধ্যেও দুইটা পক্ষ আছে। একটা শুদ্ধ আর একটা এস্টাবলিশমেন্টের পাপেট।

তখন মানুষের মনে সামান্য হলেও সন্দেহ ঢুকত। কিন্তু উনারা সেইটা করেন নাই। আমি মোটামুটি নিশ্চিত বলতে পারি দেশের বড় একটা অংশ এখন খুব ক্লিয়ারলি বিশ্বাস কওে শাহবাগের সবাই আওয়ামী লীগকে রক্ষা করার মিশনে নামছিল। শাহবাগের যে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্পিরিট ছিল এইটা বেশিরভাগ মানুষ জানে না।

মানুষ জানে না শাহবাগের শুধু ফাঁসি চাওয়ার এবং বিচার প্রসেসকে শুদ্ধ করতে না চাওয়ার যে ডিসিশন সেইটা ডিসপিউটেড ছিল। মানুষ জানে না শাহবাগকে শুধু একটা লিঞ্চিং মব বানানোর চেষ্টাটায় অনেকের আপত্তি ছিল। এবং শাহবাগ থেকে এই রাষ্ট্রকে শুদ্ধ করার একটা চেতনা ছিল।

আমি মনে করি শাহবাগের বেস্ট বেট ছিল একটা প্রেশার গ্রুপ হিসেবে রয়ে যাওয়া। শাহবাগ চাইলে মধ্যবিত্ত শহুরে তরুণদের একটা ইউনাইটেড প্লাটফর্ম হিসেবে থাকতে পারত যারা রাষ্ট্রকে বিভিন্ন ইস্যুতে প্রেশার দিত। শাহবাগ থেকে কখনই তাহরীর স্কয়ার হয়ে সরকার পরিবর্তন করার কথা হয় নাই। সেইটা কাম্য ছিল না। মিশর হতে লিবিয়ায় আমরা দেখেছি তরুণদের বিক্ষোভের ফসল হয় সামরিক বাহিনী নয় কোনো শক্তিশালী গ্রুপ নিয়ে ফেলে। তাই এইটা কাম্যও ছিল না।

কিন্তু নিয়মিত দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক শক্তির হাতে ধর্ষিত সমাজ এবং রাষ্ট্রে

তরুণেরা যখন প্রথম একত্র হোল তখন সমাজ পরিবর্তনের কথা বলতে পারবে না, রাষ্ট্রকে পরিবর্তনের কথা বলতে পারবে না, বললে ছাগু ট্যাগ খাবে? সেইটা কেমন কথা?

শাহবাগের নেতৃত্বে যারা ছিলেন তারা অবশ্যই সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব বুঝতে ভুল করেছেন। এই নিয়ে আমার এক আনাও সন্দেহ নাই। তারা মনে করছেন তারা ব্লগার, তারা BOAN—এইটা ছবির হাটের বিপ্লব। কিন্তু শাহবাগ যে কত বড় স্বপ্ন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল এবং তার পতন কত গভীরে হয়েছে সেইটা তারা কখনই উপলব্ধি করতে পারছেন কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

শাহবাগ নিয়ে আমার আলোচনা মোটামুটি শেষ। আমরা এখন হেফাজতের উত্থান এর দিকে যাব।

আশা করি সাথে থাকবেন।

তৃতীয় পর্ব: হেফাজতের উত্থান

চ্যাপ্টার ২৬. হেফাজতের উত্থান এবং সংঘাত ও প্রপাগান্ডা যুদ্ধ

একটা জিনিস আমি স্বীকার করে নেই, শাহবাগ আমি যত ডিটেলসে কাভার করেছি, হেফাজতের উত্থানকে আমি সেই রকম ডিটেলসে ব্যাখ্যা করিনি। বিশেষত হেফাজতের উত্থানের পেছনে ফরহাদ মজহারের কল্পিত ইসলামভিত্তিক সাম্য, মানবিক মর্যাদা কায়েমের রাষ্ট্রকল্প ও বিপ্লবের ধারণাকে আমি আলোচনা করিনি। দুইটা কারণে। প্রথম কারণ হলো সময়। দ্বিতীয় কারণ এই বইয়ে হেফাজত ইসলামকে তার নিজের নিরিখে দেখা হয় নাই। দেখা হয়েছে শাহবাগকে কাউন্টার করার রিঅ্যাকশনারি শক্তি হিসেবে। ফলে এই রিঅ্যাকশনারি শক্তির অ্যাকশন রিঅ্যাকশন এই বইয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে। ফলে হেফাজতকে হেফাজতের ইতিহাস, হেফাজতে বিশ্বাস এবং অন্যসব এঙ্গেল থেকে আমি যাচাই করিনি। আমি আগেই স্বীকার করেছি, শাহবাগ শুরু হওয়ার আগে, হেফাজত সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল, ওরা হচ্ছে চট্টগ্রামের একটা আঞ্চলিক দল। বাংলাদেশের অনেকগুলো ছোট ছোট ইসলামিক দলদের মধ্যে একটা। এবং দেখবেন আমার সেই সময়ের স্ট্যাটাসে আমি এই কথাটা বার বার বলেছি। এই ধারণাটা আমার কাটে অনেক পরে। ফলে আমার কাছে এই বইয়ে হেফাজতের শুরু আমার ঐ অজ্ঞানতা থেকে এবং শেষ এখন ২০১৪ সালে যখন দেখছি হেফাজত আবার হারিয়ে গিয়েছে—ঐ সীমানায়।

এইটুকু আমি প্রথমেই স্বীকার করে নিলাম, যাতে কেউ গালি না দেয় যে, আমি কেন প্রায় ১৫০ পৃষ্ঠা নিলাম শাহবাগে আর প্রায় ৭৫ পেজ নিলাম হেফাজতকে নিয়ে। এইটা একজন বাংলা পরীক্ষার দিন অঙ্ক পরীক্ষা দেয়া শাহবাগীর চোখে হেফাজত। এইটা হেফাজতের চোখে হেফাজত না।

দিন পঞ্জী অনুসারে শাহবাগ নিয়ে আলোচনা আমরা মাওলানা দেলওয়ার হোসেন সাঈদীর রায়ের প্রেক্ষাপটে যে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস হলো সেই জায়গায় রেখে এসেছিলাম। রায়টি হয়েছিল ২৮ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু এরপর, বাংলাদেশে স্বাধীনতা পরবর্তী ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক অস্থিতিশীলতা শুরু হয়। দেশের

বিভিন্ন অঞ্চলে শুরু হয় রায়ট। অসংখ্য মানুষ নিহত হয় পুলিসের গুলিতে। এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলা হয়। সরকারি অফিসে হামলা হয় এবং পুলিশের গুলিতে প্রতিদিন ২০ থেকে ৩০ জনের মৃত্যুর খবর আসতে থাকে। পুরো বাংলাদেশ একটা মৃত্যুপুরিতে পরিণত হয় দুপক্ষের হানাহানিতে।
আমি একটা নোট লিখি।

এই বিভেদ শেষ হোক, এইসব বিভেদ শেষ হোক

(প্রকাশ: ২ মার্চ ২০১৩)
কম্পিউটারের সামনে বসে আছি। কিছু লিখতে চাই। কিন্তু লেখা বের হচ্ছে না। বিভিন্ন নিউজ পাচ্ছি, চারিদিকে আজ হামলা হচ্ছে। ভাঙচুর হচ্ছে, মারামারি হচ্ছে, মানুষ মারা যাচ্ছে, আহত হচ্ছে।
আমি আইডিয়লাইজড মানুষ না। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সমালোচনা করি কিন্তু একইভাবে চরম উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের উত্থানে আশঙ্কিত হই—বিভাজনের রাজনীতির, সংঘাতের। আশঙ্কা সত্যি হল। কে ঠিক কে ভুল এই প্রশ্ন সবসময় ইম্পর্টেন্ট না। কি হচ্ছে সেটাই বাস্তবতা।
বাস্তবতা হচ্ছে, দেশ একটা আইডিওলজিক্যাল ইস্যুতে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। বাস্তবতা হচ্ছে, এই দ্বন্দ্বের দুই পাশের উভয় পক্ষ পরস্পরকে চরম ঘৃণা করে এবং পরস্পরকে বিলীন করে দেয়াটাকে জাস্টিফায়েড মনে করে।
অথচ এই সমস্যা একটা সভ্য দেশে দেখা যায় না। একটা সভ্য দেশে অপরাধকে অপরাধের মেরিটে দেখা হয়। কে করেছে সেটা দেখা হয় না। সরকার মানুষের জানমালের নিরাপত্তা দেয়। ৩০০ মানুষ হত্যা করার পরও কেউ আঁতাতের রায়ে লঘুদণ্ড পায় না। যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্যে লাখ লাখ মানুষকে রাস্তায় নামতে হয় না, সেই বিচারে কেউ যদি ক্ষুব্ধ হয় সে রাস্তায় নেমে আসে না, দেশজুড়ে ভাংচুর করে না, মৌলবাদীরা মন্দির ভাংচুর করে না, হিন্দু সম্প্রদায়কে টার্গেট করে তাদের ঘরবাড়ি ভাংচুর করে না, পুলিশের উপর হামলা হয় না, পুলিশ পাখির মতো মিছিলে গুলি ছুঁড়ে মানুষ মেরে ফেলে না, টিভিতে পরিষ্কার এভিডেন্স উন্মোচিত হওয়ার পরও তথাকথিত সুশীল সমাজ সেই কিলিং জাস্টিফায়েড মনে করে না, একটা ভিডিওতে একটা ছেলের উপর পাঁচ-ছয়জন মানুষ গুলি করার পরিষ্কার দৃশ্য দেখা গেলে সেটা নিয়ে উচ্চবাচ্য

হয়, মৌলবাদীরা মন্দিরে হামলা করলে তার বিচার হয়, সারা দেশের মানুষ সমস্বরে সেই ঘৃণ্য অপরাধের বিরুদ্ধে উচ্চকিত হয়।

কারণ খুঁজতে সব সময় ভালো লাগে না। কারণ খুঁজতে ইচ্ছে হচ্ছে না। হতাশ লাগছে। জাস্ট মনে হচ্ছে, শেষ হোক। এই সবকিছু শেষ হোক। আমরা সবাই মিলে শ্রীলংকা-বাংলাদেশ খেলা দেখব, সবাই আমরা এক দেশের মানুষ। তামিমের ছক্কায় হই হই করে নাচব। বাংলাদেশ বাংলাদেশ বলে সমস্বরে রব তুলব পাড়ায় পাড়ায়, ব্যান্ড বাজিয়ে মিছিল করব মৌলবাদী, আস্তিক, নাস্তিক, হিন্দু, মুসলমান, আওয়ামী লীগ, বিএনপি সবাই একসাথে। আমরা সবাই এই মাটির মানুষ। এখনো ৪০% মানুষ, মানে ৬ কোটি লোক দিনে ১০০ টাকার নিচে আয় করে এবং ৮০% মানুষ দিনে ১৬০ টাকার নিচে আয় করে। এখনো আমাদের বেসিক নিড পুরা হয় নাই। গিনেস রেকর্ডের হিসেবে পৃথিবীর সব চেয়ে অপুষ্ট জাতি। আমাদের দুইটা পলিটিকাল পার্টি একটা চরম দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থায় আমাদের সকল সম্ভাবনা বিনষ্ট করছে। পৃথিবীর বুকে আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারছি না। পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি।

এই বিভেদ শেষ হোক। এই সব বিভেদ শেষ হোক।

আমি এক নগণ্য ফেসবুকার। কার কথা কে শোনে? শাহবাগ তখন প্রায় স্তিমিত। রাষ্ট্রের প্রধান ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়, চারিদিকে সন্ত্রাস আর গুলি বর্ষণ। সাধারণ মানুষ স্তম্ভিত। এ কি হচ্ছে!

আমি ফেসবুক থেকে নৃবিজ্ঞানী বখতিয়ার ভাইয়ের একটা স্ট্যাটাস এখন শেয়ার করি:

আমি পক্ষ নিয়ে ফেলেছি। আমি রাজনৈতিক খুনাখুনির নির্মম বলি এই পরিবারগুলোর পক্ষে। এই খুন হওয়া মানুষগুলোর রাজনৈতিক বিশ্বাস কি ছিল তাতে আমি বিন্দুমাত্র আর আগ্রহী নই। মরে যাওয়া মানুষ আর আওয়ামী-বিএনপি-জামায়াত থাকে না। এই খুন বা খুন হওয়াদের প্রিয়জনের কান্না মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে গেল না বিপক্ষে গেল, ইসলামের পক্ষে গেল না বিপক্ষে গেল, এই নিয়ে আমি বিচলিত নই। আমার কাছে এই কান্না, আমি খুন হলে আমার মা-স্ত্রী-পুত্র-বন্ধুর কান্নাই। আমার কাছে খুন হচ্ছে খুন, এর বাইরে আর কিছু না। আমার কাছে খুন মানব ইতিহাসের আদি অপরাধ।

কিন্তু খুনাখুনি থামছে না।

প্রোপাগান্ডা

এবং এই সময়ে প্রোপাগান্ডা যুদ্ধ চরমে উঠে। একদিকে, দাড়িটুপিওয়ালা বৃদ্ধদের উপর হামলা এবং পুলিশের গুলিতে বিভিন্ন রক্তাক্ত ছবি এবং অনেক ক্ষেত্রে নেট থেকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদের উপর হামলার ছবি এবং ফটোশপ এডিট করা নাচগানের ছবি শাহবাগের মদের আসর বা এই ধরনের ছবি বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। অন্যদিকে প্রো-যুদ্ধাপরাধের বিচার অ্যাকটিভিস্টরা বিভিন্ন অঞ্চলে রায়টকারীদের পুলিশের ওপর হামলা, বৃক্ষ নিধন, জাতীয় পতাকা পোড়ানোসহ অন্যান্য ছবি নিয়ে প্রোপাগান্ডা করছে।

এবং প্রোপাগান্ডার আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো, একই ছবি বা নিউজ দুই পক্ষের হাতেই ব্যবহৃত হতে থাকে।

দেলোয়ার হোসেন সাঈদীকে চাঁদে দেখা যাওয়ার গুজব ছিল তেমনি একটি প্রোপাগান্ডা। ফটোশপ করা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীকে চাঁদে দেখা যাওয়ার একটা ছবি গ্রামের এবং শহরের মানুষের কাছে ছড়িয়ে পরে প্রিন্ট হয়ে। এবং গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে দেলোয়ার হোসেন সাঈদীকে চাঁদে দেখা গেছে।

আমি এইটা আমাদের বাসার কাজ করার ঠিকা মহিলার পক্ষ থেকে আমার স্ত্রীর মারফত জানি। কি ব্যাপার সেইটা বুঝতে ফেসবুকে গিয়ে দেখি হাস্যরসের রোল উঠছে। অনেকেই দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর সাথে তাদের নিজেদের ছবিকেও ফটোশপ করে শেয়ার করেছে। এইটা অনেক অনেক দিন ধরে হাস্যরসের অনেক খোরাক দিয়ে গেছে।

এই ঘটনাটাকে এত সহজে নেওয়া উচিত হবেনা। দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর এই অতি সহজ ফটোশপ করা ছবিটা বাংলাদেশের বড় একটা অংশের মানুষের বিশ্বাস করা থেকে দুইটা জিনিস বোঝা যায়, তা হলো, দুইটা পক্ষই এমন একটা অডিয়েন্স নিয়ে খেলছে যার চিন্তা করার ক্ষমতা এবং প্রযুক্তি হোক, রাজনীতি হোক, ধর্ম হোক—তাদের মৌলিক জ্ঞান অস্বাভাবিক রকম সীমিত। এবং এই ধরনের একটা অডিয়েন্সকে ম্যানিপুলেট করে অনেক খারাপ কিছু করানো সম্ভব। এবং এই সময় সেই কাণ্ডই ঘটাচ্ছিল আমার দেশ। এবং সেইটাকে প্রতিহত করতে পাখির মতো গুলি করে মানুষ মেরে অবস্থা আরো জটিল করে তুলছিল সরকার। সিচুয়েশনকে নিয়ন্ত্রণে আনার কোনো চেষ্টাই ছিল না

সরকারের মধ্যে।
বাংলাদেশ রাষ্ট্র ক্লিয়ারলি একটা যুদ্ধ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে দাঁড়ায়।
মার্চের ১৪ তারিখে জাগরণ মঞ্চ থেকে চট্টগ্রামে সমাবেশ করার ঘোষণা দেয়া হয়। এবং একই সাথে এইটাকে প্রতিরোধের ঘোষণা দেয় হেফাজত।
এবং জাগরণ মঞ্চের কিছু প্রতিনিধিসহ ইমরান সরকার হেফাজতের প্রতিরোধের ঘোষণায় চট্টগ্রামের পথে যাত্রা শুরু করলেও মাঝপথ থেকেই ফিরে আসেন তারা।

চ্যাপ্টার ২৭. হেফাজতে ইসলাম অ্যান্ড মাহমুদুর রহমান—দ্য রুলার অব দ্য আদার ওয়ার্ল্ড

মাহমুদুর রহমানের কাউন্টার রেভলিউশান শুরু হওয়ার পর থেকে আমি সব সময় মাহমুদুর রহমানকে গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছি। এইটা অনেকের কাছে হাস্যকর মনে হতে পারে। আমি একটা নোট লিখেছিলাম যাতে বলেছিলাম বিএনপির জায়গায় মাহমুদুর রহমান এখন নেতা। নোটটা মজার, যেইটায় আমি এ বিউটিফুল মাইন্ড ছবিতে বর্ণিত বিখ্যাত গণিতবিদ জন ন্যাশ-এর গেম থিওরির বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলাম মাহমুদুর রহমানের ভূমিকা।
যাই হোক এই সময়ে হেফাজতকে আরো সামনে নিয়ে আসতে আরম্ভ করেন মাহমুদুর রহমান।
কেন? কারণ মাহমুদুর রহমান বুঝতে পারেন বিএনপির তেমন কোনো সাংগঠনিক শক্তি নাই। এবং শাহবাগের কল্যাণে যে কড়া বাঙালি জাতীয়তাবাদী উত্থান হয়েছে সেইটাকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ দিয়ে কাউন্টার করা যাবে না। এর জন্যে আরো হার্ডলাইন আইডিওলজিকাল পজিশন লাগবে। যেইটা মাহমুদুর রহমানের হাতে তুলে দেয় শাহবাগ নিজেই, রাজীব হত্যার পর রাজীবকে দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ হিসেবে ব্র্যান্ডিং করে।
রাজীবের কুরুচিপূর্ণ লেখাগুলো পেয়ে তার ভিত্তিতে তিনি তার কাউন্টার রেভলিউশান প্ল্যান করেন একটা ইসলামিক জাগরণের। এর আধ্যাত্মিক গুরু আল্লামা মাওলানা শাহ আহমেদ শফি, চট্টগ্রামের বিখ্যাত আল জমিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম বা হাটহাজারি কওমী মাদ্রাসা বা বড়

মাদ্রাসার প্রধান।

ফরহাদ মজহার গ্রাম থেকে উঠে আসা একটা ইসলামি বিপ্লবের ধারণা দেন যার ফলশ্রুতিতে তিনি ব্যাপক সমালোচিত হয়ে ওঠেন, বিভিন্ন মিডিয়া এবং সোস্যাল মিডিয়ায়, বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের কাছে। এইটা হয়তো ঠিক এই সময়ে দেয়া হয়নি, আরও পরে দেয়া হয়েছে।

শাহবাগ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বক্তা এবং শাহবাগের বিভিন্ন সিনিয়র ব্লগাররা যারা মিডিয়াতে টক শোতে যাওয়ার সুযোগ পান, তারা এই সময়ে ঘাতক-দালালদের ফাঁসির দাবির সাথে সাথে দেশব্যাপী এই সংঘর্ষের আরকিটেক্ট হিসেবে মাহমুদুর রহমানের সমালোচনাটাকে সামনে নিয়ে আসেন। জাগরণ মঞ্চ এই সময়ে একটা অ্যাকশনারি শক্তি থেকে রিঅ্যাকশনারি শক্তিতে পরিণত হয়।

এইটা মাহমুদুর রহমানের জন্যে আরো বেশি সুযোগ করে দেয়। কারণ জাগরণ মঞ্চ সরকারের লজিস্টিক এবং আদর্শিক সহযোগিতা পাওয়ার পর এস্টাব্লিশমেন্ট পক্ষের হয়ে গেছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সরকারের উপর যে অংশ ক্ষুব্ধ তারা সরকারের বিরোধী শক্তিটাকেই সিমপ্যাথাইজ করে। এবং আপনি মানেন কি না মানেন, আওয়ামী লীগের বিগত ৫ বছরের দুঃশাসন, পদ্মা ব্রিজ, হলমার্ক, শেয়ারমার্কেট লুটের কারণে দেশের বড় একটা অংশ আওয়ামী লীগ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এরা আদর্শিক নয়। কিন্তু বিএনপি যেহেতু তার আগে গত চার বছরে নাই হয়ে গেছে তাই তাদের অনেকেই এই পক্ষকে সিমপাথাইজ করা শুরু করেছে।তার ওপরে আছে ইসলাম এবং রাসুলের (সা.) অবমাননার ইস্যু।

বাংলাদেশের মতো দেশ যেখানে ৪০%-এর বেশি মানুষ নিরক্ষর এবং যারা অক্ষর চেনে-জানে তাদের মধ্যে ব্যাপক একটা অংশ বিভিন্নভাবে কুশিক্ষিত, সেখানে ধর্ম মানুষের রাজনৈতিক চেতনার বড় একটা অবস্থান গড়ে নিবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেটা হয় নাই, কারণ পলিটিকাল ইসলামের প্রধান যে শক্তি জামায়াতে ইসলামীর, যুদ্ধাপরাধের সাথে সংশিস্নষ্টতার কারণে।

কিন্তু শাহবাগকে কাউন্টার করতে মাহমুদুর রহমানের ইস্যু ছিল নাস্তিকতা এবং (রাসুল সা.)-এর উপর অপমানের প্রতিশোধ নেয়া। এবং থাবা বাবার যেই ধরনের ভয়ঙ্কর লেখা ছিল সেইগুলো এক একটা ছিল আণবিক বোমার থেকেও বেশি

শক্তিশালী।

ফলে মাহমুদুর রহমানকে এমন একটা শক্তিকে সামনে আনতে হয় যার যুদ্ধাপরাধের স্টিগমা নাই এবং যার সারাদেশে গ্রাস রুট অ্যাকটিভিস্ট আছে।

হেফাজত-এ-ইসলাম সেই রকম একটা দল। হেফাজতের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের কোন অভিযোগ নাই। হেফাজতের আধ্যাত্মিক প্রধান আল্লামা মাওলানা শাহ আহমেদ শফি যুদ্ধের সময়ে পাকিস্তান আর্মির হাত থেকে অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে রক্ষা করেছিলেন বলে এই সময়ে বিভিন্ন প্রোপাগান্ডা ম্যাটেরিয়ালে দেখা যায়। কিন্তু বটমলাইন খুব সিম্পল, হেফাজতের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি হওয়ার কোন অপবাদ নাই। তাত্ত্বিক দিক থেকেও তারা জামায়াতে ইসলামী থেকে অনেক দূরে এবং জামায়াতে ইসলামীর সাথে তাদের অনেক দিনের আদর্শিক বিরোধ আছে। যদিও এইটা ঠিক বাংলাদেশের ইসলামিক দলগুলো কিছু ইস্যুতে একই স্থানে মিলিত হয়।

দেশব্যাপী তাদের মাদ্রাসা এবং তাদের ছাত্ররা দেশব্যাপী বিভিন্ন মসজিদেও ইমাম বা মোয়াজ্জিন হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করছে। ফলে তাদের সংগঠন অনেক বিসত্মৃত যদিও তাদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের কথা কখনই শোনা যায় নাই।

ফলে, হেফাজতে ইসলাম মাহমুদুর রহমানের কাউন্টার রেভলিউশনের গুরুত্বপূর্ণ একটা অস্ত্রে পরিণত হয়।

ফলে এই সময়ে আমার দেশের নিউজগুলো যদি দেখেন, তাহলে দেখবেন আমার দেশ হেফাজতকে প্রতিদিন লিড ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে।

আমার দেশ বাদেও বাঁশের কেল্লা বা বখতিয়ারের ঘোড়ার মতো পেজগুলোতে তখন ব্যাপক হারে সত্য মিথ্যা প্রপাগান্ডা ম্যাটেরিয়াল প্রকাশ হতে থাকে যা ব্যাপক হারে অন লাইনে শেয়ার হয়।

এবং এইখানে আবার বলি, এই সময়ে আমার দেশের সার্কুলেশন অনেক বেড়ে যায়। তাদের লেখাগুলো ব্যাপক হারে ফেসবুকে শেয়ার হয়। লেখাগুলো ফটোকপি হয়ে গ্রামে-গঞ্জে ছড়াতে থাকে।

এইটার একটা কারণও আছে। সেইটা হলো, আমাদের দেশের মিডিয়া সব সময় ক্ষমতাসীন দলের মূল মেসেজ বহন করে। আমি ইতিপূর্বের আলোচনায় দেখিয়েছি আমাদের মিডিয়াতে প্রো-মুক্তিযুদ্ধ সেকুলার ঘরানার প্রভাব বেশি।

ফলে শাহবাগের ঘটনা যখন ঘটল, সেইটা একটা গণজাগরণ এবং লাখো তরুণের বিপ্লব হিসেবে মিডিয়ার সম্পূর্ণ মনোযোগ কেড়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। এবং শাহবাগ ছিল শহুরে তরুণদের বিপ্লব। এইখানে এমন সব মানুষ জড়ো হয়েছিল, তাদের কথা-বার্তা, পোশাক-আশাক, চিন্তা-ভাবনা সবই ছিল মিডিয়ার মধ্যবিত্ত কর্মী এবং অনুষ্ঠান পরিচালকদের মতোই। ফলে তারা সম্পূর্ণরূপে শাহবাগের সাথে আইডেন্টিফাই করে। এবং মিডিয়ার কর্মীরাও শাহবাগে গিয়ে শ্লোগান দেয়। সেইসব ছবি তাদের ফেসবুকে আপলোড করে। সেটাই স্বাভাবিক।

এবং শাহবাগ সেই ভাবে হাইপড হয়েছিল। 'শাহবাগে যাওয়া' বা শাহবাগের হয়ে একটা সাক্ষাতকার নেয়া এবং দেয়াও ছিল 'কুল'।

কিন্তু মাহমুদুর রহমান যেই কাউন্টার বিপ্লব ফেনিয়ে তুলেছিলেন সেইটা ছিল আনকুল।

সেইটা ফেনিয়ে তুলছে কে? মাহমুদুর রহমান। বিএনপি ওয়ালা লোক। তার আধ্যাত্মিক গুরু কে? আল্লামা শফি। শহুরে মধ্যবিত্তের চিন্তায়, কোথাকার কোন হুজুর! এবং দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর ফাঁসির রায় হবার পর যে লোকগুলো সারা দেশে রায়ট করল তারা কারা? তারা মৌলবাদী। আরেকটা আনকুল জিনিস। আর মৌলবাদী মানেই হইল যুদ্ধাপরাধী। মানে আরো চরম আনকুল জিনিস।

এবং আনকুল জিনিসকে মিডিয়া কখনোই প্রমোট করে না। কারণ আমরা আগেই দেখেছি আনকুল জিনিসে কর্পোরেট কোম্পানি ইনভেস্ট করে না। কর্পোরেটদের দরকার একটা গাল ফোলা বাচ্চা মেয়ে, তার গালে বাংলাদেশের পতাকার স্টিকার, হাতে একটা ছোট্ট পতাকা। সুইট, কিউট!

একটা জোববা পরা, লাঠি হাতে, রায়ট করা মৌলবাদী বাংলাদেশের সব চেয়ে আনকুল জিনিস। তাই মাহমুদুর রহমানের কাউন্টার রেভলিউশান মিডিয়া কখনোই পাত্তা দেয় নাই।

এবং ৯০% মিডিয়া বর্তমানে সরকারি ঘরানার মালিকদের হাতে পরিচালিত। ফলে মালিকের সাপোর্ট, অনুষ্ঠান পরিচালকের নিজের কালচারাল এক্সপ্রেসন, শাহবাগের মধ্যবিত্ত উপস্থিতির কারণে কর্পোরেট বাণিজ্যের সুযোগ, সবকিছু মিলে একটা কমপ্লিট ইনফ্রাস্ট্রাকচারে একটা প্রো-মুক্তিযুদ্ধ বয়ানকে প্রোটেক্ট করা হয়েছে, এই সময়ে।

দেশের চারিদিকে যে পুলিশের গুলিতে হাজার হাজার মানুষ আহত হচ্ছে, প্রতি দিন ২০ থেকে ৩০ জন মানুষ মারা পড়ছে, তাকে কেউ আমলেই নেয় নাই।

এইটা মাহমুদুর রহমান গ্রুপকে আরো ক্ষুব্ধ করে তোলে। ফলে যেইটা হইছে, এই সময়ে বাংলাদেশের পুরো মিডিয়া এস্টাব্লিশমেন্ট ছিল এক সাইডে আর মাহমুদুর রহমান এবং আমার দেশ আর তাদের কিছু সাপোর্ট মিডিয়া ছিল আরেক সাইডে। এবং এই সময়ের নিউজ পেপারগুলো যদি আপনি ফলো করেন এবং তার সাথে সেই সময়ের মানুষের ফেসবুক স্ট্যাটাসগুলো মিলিয়ে নেন, দেখবেন, সাধারণ মানুষ চারিদিকে কি হচ্ছে সেইটা নিয়ে উদ্বিগ্ন। মাহমুদুর রহমান প্রতিদিনের পেপারে যুদ্ধের সেনাপতির মতো তার সৈন্যদলকে মুভ করাচ্ছেন। তার পক্ষের সৈনিকদের মধ্যে কয়জন মারা যাচ্ছে, তাদের ছবি, তাদের পরিবারের আহাজারি, এবং কি ভাবে সব কিছু ভেঙে পড়ছে সেইটা নিয়ে নিউজ করছেন এবং সামনে কি হবে সেইটা নিয়ে নিউজ করছেন। কিন্তু বাংলাদেশের প্রথম আলোসহ অন্যান্য সেকুলার মিডিয়া তখনও পিস টাইম রোলে আছে। আসন্ন বিক্ষোভ এবং সংঘাত নিয়ে তাদের তেমন কোনো ফোকাস ছিল না।

শান্তিকালীন সময়ের মতো বিক্ষোভে জাস্ট কয়জন মারা যাচ্ছে এবং কি কি সমস্যা হচ্ছে, যুদ্ধাপরাধ, সরকারি দুর্নীতি, পদ্মা সেতু এবং এই ধরনের ইস্যু নিয়ে প্রতিবেদন করছিলেন তারা। কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্র যে একটা ব্যাপক সংকটের মুখে পড়েছে এবং দেশের ভেতর আস্তিক-নাস্তিক বিতর্ক, রাসুলের অবমাননা ঘিরে যে একটা ব্যাপক আইডিওলজিকাল দ্বন্দ্ব ফেনিয়ে উঠছে এবং এইটার ফলে যে একটা সংঘাত আসন্ন সেইটা তারা উপলব্ধি করেননি, অন্তত এই সময়ের নিউজ পেপারগুলোয় তা টের পাওয়া যায় না।

কিন্তু মাহমুদুর রহমান এই সময়ে প্রতিদিন হেফাজতের মুভমেন্টকে গুরুত্ব দিয়ে প্রতিবেদন করেন। এবং মাহমুদুর রহমান এক পক্ষের অবিসংবাদিত নেতা হয়ে ওঠেন।

এইটা নিয়ে আমার আর একটা নোট ছিল যাতে সব সামারি পাবেন।

মাহমুদুর রহমানের উত্থান ও বাংলাদেশের রাজনীতিতে গেমথিওরির প্রেক্ষাপটে কিছু ফাও আলাপ

২৩ এপ্রিল ২০১৩ সন্ধ্যা ৭:১৩ টা

মাহমুদুর রহমান। দেশের সব চেয়ে ডিভাইসিভ ফিগার।

দেশটাও এখন পরিষ্কার ভাবে ডিভাইডেড। মাহমুদুর রহমান সেই ডিভিশনের একটা পক্ষের অবিসংবাদিত নেতা হয়ে দাঁড়াইছেন। বিএনপি এখন এইখানে সাইড শো। এবং বিএনপি এইটা বুঝতে পারছে বলে মনে হয় না। বিএনপির হরতালে এখন ৫০ জন ছেলেপেলে দাঁড়ায়, হাসাহাসি করতে করতে শ্লোগান দেয়। কিন্তু মাহমুদুর রহমান যে ক্রাউড অরগানাইজ করছেন তাতে হাজির ছিল প্রায় ৫ লাখ লোক। মাহমুদুর রহমান কিন্তু সেই ক্রাউডের উছিলা ছিল না, ছিল আহবায়ক।

খেয়াল করে দেখবেন মাহমুদুর রহমান গতকাল অনশন ভাঙছে। কে উনারে রিকুয়েস্ট করছে? আল্লামা শফি।

বিএনপি ভাবতাছে মাহমুদুর রহমান তাদের সাপোর্ট দিয়ে দাঁড়াইছে? সরি, ডিয়ার।

দা ফোর্স ইজ উইথ মাহমুদুর রহমান নাউ। (স্টার ওয়ার্স কোট করলাম)

বিএনপির নেতা তারেক জিয়া কোমর ভেঙে নির্বাসনে। গত তিনমাসে ব্রহ্মপুত্র দিয়া এত জল গড়াইল তারেক জিয়ার উপস্থিতি টের পাওয়া যায় নাই। জুবাইদা রহমানকে খালেদা জিয়া নামাইতে চান। কিন্তু সৎ ইমেজের জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট জিয়ার বউ হিসেবে বাংলাদেশের পাবলিক খালেদা জিয়ারে মানছে। কিন্তু তারেক জিয়ার বউরে পাবলিক বাই ডিফল্ট মাইনা নিবে কিনা সেইটা এখনো শিওর না।

আওয়ামী শোষণে বাংলাদেশের পাবলিক এখন একদম ফেডআপ। :)

তাইলে থাকে কে? কে এখন সরকারের সব চেয়ে বড় প্রতিপক্ষ?

তিনার নাম মাহমুদুর রহমান। এবং মাহমুদুর রহমানের সেই অ্যাম্বিশান নাই সেইটা যদি মনে করেন তো ভুল করবেন। কারণ, বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষ ভাবে অযোগ্য দুই মহিলা থেকে সে নিজে ভালো দেশ চালাইতে পারবে। মাহমুদুর রহমানের মনে সেইটা নাই তা কেউ বলতে পারবে না।

এবং মাহমুদুর রহমানের হিস্টরি বলে তিনি খালেদা জিয়া বা বিএনপির প্রতি অ্যাবসলিউট আনুগত্য কখনও দেখান নাই।

নেট এ মাহমুদুর রহমানের একটা লেখা প্রায় ঘোরাঘুরি করে, যেইটার টাইটলটা এই রকম (আমি পুরা শিওর না) 'খালেদা জিয়ার এখন আর কিছুই নাই, বা

বিএনপির এখন সব শেষ' বা এই টাইপের কিছু একটা।

তাইলে এখন মাহমুদুর রহমান যদি একটা পলিটিকাল পার্টি হিসেবে আসতে চায় তো উনি সাথে পাবেন হেফাজত টাইপ এবং জাতীয়তাবাদী টাইপ যারা তারেক জিয়ার দুর্নীতির ইতিহাসের কারণে তাকে কোনো ভায়াবল অল্টারনেটিভ মনে করে না। এই পক্ষগুলো মিলে বাংলাদেশের বড় একটা গ্রুপ হয়ে দাঁড়ায়।

'গেম থিওরি'

অনেকেই বুঝতে চান না যে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি মূলত একে অপরের পরিপূরক শক্তি।

আওয়ামী লীগ না থাকলে বিএনপি টিকে না এবং বিএনপি না থাকলে আওয়ামী লীগ টিকে না। এইটারে আবার একটা তত্ত্বে নিয়ে যাওয়া যায়। যেইটা খুব পপুলার একটা তত্ত্ব। এর নাম গেম থিওরি। এইটার জনক হইল জন ন্যাশ। যারে নিয়া A Beautiful Mind নামের একটা অসাধারণ মুভি হইছিল যেই ছবিতে অভিনয় করে রাসেল ক্রো অস্কার পাইছিল।

ন্যাশ এমন একটা ম্যাথমেটিকাল মডেল সৃষ্টি করেন যার মাধ্যমে সমাজ, রাষ্ট্র, কর্পোরেট বা যুদ্ধ হইতে শুরু করে অনেক অবস্থায় ইকুইলিব্রিয়াম বা স্ট্যাটাস কো বা সাম্যঅবস্থা কেমনে জারি থাকে তার একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়। এবং ন্যাশ-এর ক্রেডিট হইল এইটা উনি অঙ্ক দিয়া মিলাই দিছেন।

ন্যাশ দেখান যে সমাজে বা রাষ্ট্রে বা কোনো প্রতিষ্ঠানে আমরা সব সময় নিজের জন্যে সর্বোচ্চ সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করি। নিজের এই সুবিধা আদায়ের জন্যে আমরা আমাদের সামর্থ্য এবং পরিস্থিতির মধ্যে এমন সব ডিসিশান নেই যাতে আমাদের সর্বোচ্চ সুবিধা হয় এবং তাতে অন্যদের(প্রতিপক্ষের) সর্বোচ্চ অসুবিধা হয়ে থাকে। এবং আমাদের প্রতিপক্ষের কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে কি করব কি করব না সেই সিদ্ধান্তগুলো আমরা নেই।

এবং একই দিকে, আমাদের প্রতিপক্ষেরাও একই কাজ করে। তারা তাদের নিজের সুবিধার জন্যে তাদের সামর্থ্য এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে এমন সব কাজ করে, বা সিদ্ধান্ত নেয় যাতে আপনার সর্বোচ্চ ক্ষতি হতে পারে। এবং আপনি কি করতেছেন বা করবেন তার উপর ভিত্তি করে সে তার নিজের সিদ্ধান্তগুলো নেয়।

এখন সবাই মিলে সবার ক্ষতি করতাছে, তাইলে তো সভ্যতা ধ্বংস হয়ে

যাওয়ার কথা। কিন্তু তা হয়না। কেন হয়না? এইখানে ন্যাশ-এর কারিগরি। ছোটকালে বীজগণিতে কি শিখছিলেন খেয়াল আছে? মাইনাস এ মাইনাসে প্লাস। আপনার পাশের লোক তার নিজের সুবিধার জন্যে আপনার অসুবিধা করতেছে, আপনি আপনার সুবিধার জন্যে তার অসুবিধা করতেছেন। এখন এইগুলো সব মিলে কাটাকুটি হয়। এবং সোসাইটি বা রাষ্ট্রে ইকুইলিব্রিয়াম বা সাম্যাবস্থা বজায় থাকে। এইটারে অঙ্ক কইরা ন্যাশ প্রমাণ করে দিছে। এই অঙ্কের নাম হইল ন্যাশ ইকুইলিব্রিয়াম যারে সহজ বাংলায় বলা যায় গেম থিওরি। এই সূত্রটা বানায়া ন্যাশ ১৯৯৪ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পাইছিলেন।

এই লোকটা মহা জিনিয়াস আছিল। যারা যারা রাসেল ক্রোয়ের A Beautiful Mind দেখেন নাই তাদের দেখার রিকুয়েস্ট করতাছি। গেম থিওরি বা ন্যাশ ইকুইলিব্রিয়াম বর্তমানে কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজি, যুদ্ধবিদ্যা, রাষ্ট্রবিদ্যা, সমাজবিদ্যা হতে শুরু করে অসংখ্য দিকে এক্সপান্ড করা হইছে। যারা যারা আরও জানতে চান তারা পড়তে পারেন,

http://en.wikipedia.org/wiki/Nash_equilibrium

http://www.economics.utoronto.ca/osborne/igt/nash|pdf

গেম থিওরি থেকে বের হওয়া আরেকটা স্বতঃসিদ্ধ হইল—ইকুইলিব্রিয়াম ডিস্টার্ব হইলে গেম থিওরিতে পক্ষগুলো একটা ইকুইলিব্রিয়াম বা স্থিতাবস্থার দিকে ফিরে যেতে চায় যেই অবস্থায় তারা একজন আরেকজনের সাথে সমদক্ষতায় ক্ষতি কইরা—ন্যাশ ইকুইলিব্রিয়াম বজায় রাখতে পারে।

ইকুইলিব্রিয়ামে ইমব্যালান্স পক্ষগুলো বেশিদিন সাসটেইন করতে পারে না।

এখন এইটারে আওয়ামী লীগ আর বিএনপিতে ফালান।

তারা একজন আরেকজনের সাথে মারামারি কাটাকুটি, জেল, গুম সব করে। এমনভাবে করতাছে তাতে তাদের সাম্রাজ্য ধসে পড়ার কথা। কিন্তু ধসে পড়ে নাই। বরং দুই পার্টি মিলে একটা ইকুইলিব্রিয়াম বা স্থিতাবস্থা হইয়া আছে। ২০ বছরে একটা চমৎকার স্থিতাবস্থা দুই পার্টি মিলে এস্টাব্লিশ করে রাখছে।

এখন এই গেম থিওরি অনুযায়ী যদি বর্তমান অবস্থা যাচাই করেন তাইলে দেখবেন আওয়ামী লীগ ক্রমাগত শক্তি অর্জন করতেছে, পুলিশে লোক ঢুকিয়ে, স্পেশাল বিসিএস দিয়ে ক্যাডারে নিজেদের লোক ঢুকিয়ে, নিজের দলের সন্ত্রাসী

ক্যাডারদের হাতে লাইসেন্সড অস্ত্র তুলে দিয়ে, নেতা কর্মীদের হাতে দেশের সব সম্পদ-সম্পত্তি দখল করানোর মাধ্যমে।

আর অন্যদিকে নেতৃত্বহীনতার কারণে বিএনপি ক্রমাগতই দুর্বল হচ্ছে। তাইতে কিন্তু গেম থিওরি মতে ন্যাশ ইকুইলিব্রিয়াম ব্যাহত হইতেছে। ফলে ইকুইলিব্রিয়াম ব্যাহত হওয়ার কারণে স্থিতাবস্থা অর্জনের জন্যে নতুন নতুন ফোর্স উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে এবং এর মধ্যে যে কোনো একটা টিকে যাবে। এই জন্যেই নাগরিক শক্তির মাহমুদুর রহমান মান্না প্রায় আওয়াজ দেন।

প্রথম আলোতে ডক্টর ইউনুসের ভাই মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর প্রায়ই তরুণদের সংগঠিত হইতে বলে। হেফাজত দাঁড়াইছে। আহলে সুন্নিয়াত ডাক দিচ্ছে। ব্লু ব্যান্ড কল করছিল-মাহি বি। শাহবাগ যখন দাঁড়াইল, এই অভাজনের মতো অনেকেই তখন আওয়াজ দিছিলাম, মেসেজ এক্সপান্ড করেন। গাড়ি চুরি করার সুযোগ পেয়ে শুধু যেন চাক্কা নিয়া সন্তুষ্ট না হইতে হয়। কিন্তু সেইটা হয় নাই এবং সেইটা কেন হয় নাই তার জন্যে ফেসবুকে হাজার নোট লেখা হইতাছে।

কিন্তু সত্যি বলতে কি, এই অবস্থায় যতগুলো ফোর্স দাঁড়াইছে তাদের মধ্যে অ্যাম্বিশান না দেখাইলেও সবচেয়ে শক্তিশালী ফোর্স এখন মাহমুদুর রহমান নিজে।

কারণ বিএনপির লিডারশীপের ব্যর্থতার কারণে বিএনপি দোদুল্যমান। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদীরা নিজেদের ভয়েস শোনানোর মতো নেতা খুঁজতাছে। বিএনপি আওয়ামী লীগের শক্ত প্রতিপক্ষ হইতে পারতাছে না বলে বলে তারা যারপরনাই হতাশ। মাহমুদুর রহমানের সাথে আছে হেফাজত—যাদের ৫ এপ্রিল শো ডাউনের পর বেশ বড় শক্তি মনে হইতাছে, আছে শাহবাগের চাপে কোণঠাসা জামায়াত যারা যে কোন মুহূর্তে মাহমুদুর রহমানের দিকে কেবলা ফিরাতে প্রস্তুত।

এবং মাহমুদুর রহমান যদি কোন কারণে বিএনপি রে বাতিল করে নিজে আগান, তো এইটা আওয়ামী লীগের জন্যে একটা চরম বিপদজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে। কারণ মাহমুদুর রহমানের জাতীয়তাবাদ এবং বিএনপির জাতীয়তাবাদের মধ্যে অনেক ফারাক আছে। যারা বিএনপিরে অতি ডানপন্থী বলেন তারা অতি ডানপন্থী কি এখনও দেখেন নাই।

আর ব্যক্তি হিসেবে মাহমুদুর রহমানের একটা স্ট্রং প্রিন্সিপল আছে।

একজাম্পল হিসেবে দেখেন। মাহমুদ রহমান তিনটা দাবি নিয়ে অনশন করছেন। এর মধ্যে একটা হইল, উনার মা এবং দৈনিক সংগ্রামের (যে আমার দেশ ছাপা বন্ধ হওয়ার পর আমার দেশ ছাপাইছিল) সম্পাদকের মামলা প্রত্যাহার। খুবই প্রিন্সিপল্ড একটা পজিশন—উনি কিন্তু নিজের মুক্তি চেয়ে অনশন করেন নাই। উনার সমর্থকদের কাছে এই পজিশনগুলো উনারে আলাদা মর্যাদা দিছে।

আমি যতদূর জানি মাহমুদুর রহমান ইতিপূর্বে একবার জেল খাটছিল আদালত অবমাননার অপরাধে। এই সেম অপরাধে বাংলাদেশে অনেক সম্পাদক আদালতের কাছে ক্ষমা চেয়ে জেল থেকে অব্যাহতি নিছে। মাহমুদুর রহমান নেয় নাই।

আপনের পছন্দ না বলে, আপনি মাহমুদুর রহমান রে ইগনোর করতে পারবেন কিন্তু উনারে আপনি বাতিল করতে পারবেন না। অলরেডি মাহমুদুর রহমান একটা ক্রেডিবল ফোর্স হিসেবে দাঁড়ায় গেছে। সবাইকে অবাক করে হেফাজতের পাঁচ লাখ জনসমাবেশ প্রমাণ করছে মিডিয়ায় আমাদের সকাল বিকাল যে গান যে গল্প শোনায় তার বয়ানের বাহিরে বিশাল একটা জনগোষ্ঠী আছে এবং মাহমুদুর রহমান তাদের পালসটা ধরতে পারছেন।

আওয়ামী লীগ গেম থিওরি না মানতে পারে কিন্তু মাহমুদুর রহমানের শক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভাবে ওয়াকিবহাল।

কিন্তু আওয়ামী লীগ যেইটা নিয়া ওয়াকিবহাল না সেইটা হইল আনলিমিটেড ক্ষমতা অর্জন করার পর তাদের এস্টাব্লিশমেন্টের আরেকটা শক্তি এবং ঠিক তাদের মতোই দুর্নীতিপরায়ণ এবং নীতিহীন বিরোধী দলের সব নেতাকর্মী গ্রেফতার করে মাজা ভেঙে দেয়াটা ফাইনালি তাদের পলিটিকাল ইকুইলিব্রিয়ামকেই ভেঙে দিবে। এবং সেইটাতে তাদের পতন ত্বরান্বিত হবে মাত্র। সে মাহমুদুর রহমান হোক বা মাহমুদুর রহমান মান্না হোক, মাহি বি চৌধুরীর ব্লু ব্যান্ড কল হোক বা হেফাজত হোক বা আহলে সুন্নিয়াত হোক।

তাই নিজেকে বাঁচানোর জন্যে বিএনপিকে টিকিয়ে রাখা আওয়ামী লীগের জন্য খুবই জরুরি। ক্ষমতার দর্পে অন্ধ আওয়ামী লীগ সেইটা করবে কিনা সেইটা দেখার বিষয়।

চ্যাপ্টার ২৮. ডিউ ডিলিজেন্স ছাড়া পুলিশের গুলি, নাগরিক অধিকার

এবং ইনস্টিটিউশনাল ইন্টেগ্রিটি

১৫ তারিখ: আমার দেশ

সাভারেও শাহবাগীদের প্রতিরোধ করবে হেফাজতে ইসলাম: কটূক্তিকারীদের চিহ্নিত করতে গঠিত কমিটি প্রত্যাখ্যান

১৬ তারিখ: আমার দেশ

চট্টগ্রামসহ দেশব্যাপী মুসল্লিদের বিক্ষোভ: ঢাকামুখী লংমার্চে বাধা দিলে লাগাতার হরতালের ঘোষণা

আগামী ৬ এপ্রিল ঢাকামুখী লংমার্চে বাধা দিলে পরদিন থেকে লাগাতার হরতালের ঘোষণা দিয়েছেন হেফাজত।

সরাইলে হেফাজতের বিশাল সমাবেশ: শাহবাগী ছেলেকে প্রতিরোধের ঘোষণা বাবার

আর আমরা এই দিন প্রথম আলোর সম্পাদকীয়গুলো দেখি

সম্পাদকীয়

জননিরাপত্তাই অগ্রাধিকার পাক

সংবাদপত্র পোড়ানো

আওয়ামী দুর্গের পতন

অনলাইন নীতিমালা চাই-ই চাই

পরিষ্কার ভাবে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যেই সংকট ঘনিয়ে আসছে তা নিয়ে, প্রথম আলো সচেতন ভাবে চিন্তিত নয়। বাকি মিডিয়ার একই অবস্থা। বাংলাদেশের আগামী দিনে যেই ঘটনাগুলো ঘটবে এবং যার ফলে ইতিহাসের মোড় আরো একটা বাঁকে ঘুরবে সেইটা তারা টের পান নাই। এর থেকে বোঝা যায় প্রথম আলো এবং বাকি সেকুলার মিডিয়া এই সময়ে বেশ বড় একটা জিনিস মিস করেছেন, যার দায় তাদেরকে এখন দিতে হচ্ছে। দেশের বেশ বড় একটা জনগোষ্ঠীর কাছে তারা বিশ্বাস যোগ্যতা হারিয়েছেন। যদিও এই নিয়ে তাদের টেনশন কম, কারণ এই গোষ্ঠী টার পারচেজ পাওয়ার কম হওয়াতে তাদের এডভারটাইজারদের কাছে এই গোষ্ঠীটার গুরুত্ব খুব কম।

আমি এইখানে আর দৈনিক ধারাবিবরণী দিব না। শুধু জেনে রাখুন পুরো মার্চ মাস ধরে এই বয়ানটা উভয়পক্ষই বহাল রাখে। আমার দেশ প্রতিদিন

হেফাজতের মুভমেন্ট এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের হাতে বিক্ষোভ এবং পুলিশের গুলির খবর দিতে থাকে।

এই সময়ে যেই খবরটা আমরা পাচ্ছিলাম সেইটা হইল বেশির ভাগ মৃত্যু হচ্ছে পুলিশের গুলিতে।

মেইনস্ট্রিম মিডিয়া সেইটা ঠিকমতো প্রচার না করলেও সোসাল মিডিয়াই তখন খবর, গুজব এবং গুজব ভেরিফাই করার প্রধান জায়গা হয়ে ওঠে।

টিভিতে আমরা ছবি দেখি অসংখ্য মানুষ দৌড়াচ্ছে। তার পেছনে পুলিশ গুলি করছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রে এই প্রথম এই ধরনের দৃশ্য এত গণহারে দেখা যায়। একই সাথে থানার ওপরে হামলার খবরও আসে। এবং একটা থানায় হামলা করে বেশ কয়েকজন পুলিশকেও হত্যা করে রায়টকারীরা। এইটা একটা ভয়ঙ্কর সিনারিও।

আমি অনেকের সাথেই এই আরগুমেন্টটা করি যে ডিউ ডিলিজেন্স ছাড়া পুলিশ এই ভাবে গুলি করতে পারে না। এবং এই সময় যেভাবে দেখা গেছে এই রকম ব্যাপক হারে জনতার ওপর গুলিবর্ষণ বাংলাদেশ রাষ্ট্রে আগে কখনও দেখা যায় নাই। আমার বন্ধুরা বিতর্ক করতেন যে এর আগেও পুলিশ মানুষ মারছে। কানসাটে মারছে, এরশাদ বিরোধী বিক্ষোভে মারছে, বিভিন্ন ইস্যুতে মারছে। কিন্তু আমার কাছে মনে হইছে আগের ঘটনাগুলো ছিল এক একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। একবার ঘটেছে এবং সেইটা নিয়ে অনেক সমালোচনা হইছে। এরপরে আর ঘটে নাই। এবং গুলিবর্ষণের ঘটনা একটা রেফারেন্স হিসেবে রয়ে গেছে। কিন্তু এখন প্রতিদিন গণহারে এইভাবে গুলি করার ঘটনা আমি বাংলাদেশ রাষ্ট্রে প্রথম দেখলাম। এবং সেইটার সমালোচনা হচ্ছে দলভিত্তিক। এইটা একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার বলে মনে হচ্ছিল আমার। কারণ এইটা একটা নাগরিক ইস্যু। পুলিশ নিজস্ব নিয়ম না মেনে বিক্ষোভ দেখলেই গুলি করবে, এর ফলে একদিন পুলিশের হাত লম্বা হয়ে যাবে। ফলে এইটার প্রতিবাদ সমস্বরে সর্বদলীয় হওয়া উচিত। কিন্তু তা হয়নি। ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফি কমানোর দাবিতে বিক্ষোভ করা নিরপরাধ মিছিলে পুলিশ গুলি করে যা আমি মনে করি আমাদের এই সময়ের আশঙ্কার একটা প্রতিফলন।

আমার অবজারভেশনের উত্তরে তখন অনেকেই বলেন যে বিক্ষোভকারীরা যদি মানুষ মারে, পুলিশের গাড়িতে হামলা করে, হিন্দু সম্প্রদায়ের বাসায় হামলা

করে, তখন পুলিশ কি বসে থাকবে নাকি?

এইটা একটা গুরুত্বপূর্ণ আরগুমেন্ট।

আমি এই আরগুমেন্টটা নিয়ে একটা নোট লিখি। আমার আরগুমেন্টটা হলো প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা এবং নাগরিক অধিকার। এই নোটটা ১ মার্চে লেখা। কিন্তু এই নোটের যে বক্তব্য তার ধারাবাহিকতা পুরো সময়টাকে প্রতিনিধিত্ব করে।

একটু পড়েন।

নোট: ইনস্টিটিউশনাল ফেইলর

(প্রকাশ: ১ মার্চ ২০১৩)

গতকাল দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর রায়ের পর দেশব্যাপী সংঘর্ষে ৩ জন পুলিশসহ প্রায় ৪১ জনের মৃত্যুকে আমি ইনস্টিটিউশনাল ফেইলর হিসেবে দেখি। আমি ডিটেইলস জানি না, কেউ জানে বলে মনে হয় না। কয়জন জামায়াত-শিবিরের কোপাকুপিতে মরছে, কয়জন পুলিশের গুলিতে মরছে, কিন্তু পত্রিকামতে অধিকাংশ নিহত হয়েছে পুলিশের গুলিতে এবং ৩ জন পুলিশও নিহত হয়েছে সন্ত্রাসীদের আক্রমণে। যারা পুলিশের উপর হামলা করেছে, তারা প্রচণ্ড ঘৃণ্য একটা কাজ করেছে, যেটার জন্যে অবশ্যই অপরাধীদের খুঁজে বের করে চরম শাস্তি দেয়া উচিত।

অন্যদিকে, পুলিশের হাতে অধিকাংশ বিক্ষোভকারীর মৃত্যুর ঘটনাটা আমাকে শঙ্কিত করেছে, এর চেয়ে বেশি। পুলিশ রাষ্ট্রের একটা ইনস্টিটিউশন। পুলিশ কিন্তু কোনো ডিবেট এবং কোনো ঘটনায় পক্ষ-প্রতিপক্ষ না। তার কাজ আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা। তাই পুলিশকে যদি গুলি ছুঁড়তে হয়, তাকে ১০০% নিশ্চিত হতে হবে যে, এটাই লাস্ট লাস্ট লাস্ট লাস্ট রিসর্ট। এইটা না করলে অন্য প্রাণহানি হবে বা তার নিজের জীবন বিপন্ন হবে। ওই জন্যে তাকে আমার জানামতে গুলি করার আগে সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন করতে হয়। কারণ আই রিপিট, পুলিশ রাষ্ট্রের একটা ইনস্টিটিউশন। ৩ জন পুলিশের নিহত হওয়ার ঘটনাতে বোঝা যায় বেশ কিছু জায়গায় এতো কঠিন সন্ত্রাস হয়েছে যে পুলিশের জীবন বিপন্ন হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন হয়েছে। ফলে, ওই ধরনের কোনো ঘটনায় যদি ৪১ জন না হয়ে ৪১,০০০ মারাও যায় আমার তাতে কোনো প্রশ্ন নাই।

কিছু জায়গায় মন্দির ভাংচুর হয়েছে। এই ধরনের ঘটনায় যদি আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে পুলিশকে বাধ্য হয়ে গুলি ছুঁড়তে হয় এবং তাতে যদি প্রাণহানি হয় সেটা নিয়েও তেমন কিছু বলার নাই। একটা নিরপেক্ষ ইনকোয়ারি করে সেটা জাস্টিফাই করে নিলেই চলবে।

কিন্তু টিভিতে বেশ কিছু ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ওপেন মিছিলের উপর পুলিশ গুলি ছুঁড়ছে। আর্মার্ড ট্যাঙ্কের ভেতর থেকে পুলিশ গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে যাচ্ছে। খোলা মাঠে পুলিশ পিছু হটা জনতার উপর পিস্তল দিয়ে গুলি করছে। এই সিনগুলো কিন্তু ভয়ঙ্কর এবং দেখা যাচ্ছে, পুলিশ প্রোভোকড হলেই গুলি ছোঁড়াটা জাস্টিফাইড মনে করেছে। আমার একটা ধারণা ছিল গুলি ছুঁড়তে পুলিশকে ম্যাজিস্ট্রেটের পারমিশন নিতে হয়। আমি নিশ্চিত পুলিশের স্ট্যান্ডিং অর্ডার প্রসিডিউর আছে, কখন কোন অবস্থায়, কিসের পরিপ্রেক্ষিতে গুলি ছুঁড়তে পারবে।

আমি যখন দেখি সাদা পোশাকের পুলিশ গুলি ছুঁড়ছে, আমার ভয় লাগে। এ কী পুলিশ নাকি ছাত্রলীগ? বেশকিছু ছবিতে দেখলাম সাদা পোশাকের কিছু লোক গুলি করছে পুলিশের মধ্য থেকে। ওরা কারা? দাঙ্গা-হাঙ্গামার দিন কোন সাদা পোশাক পরে পুলিশ গুলি ছুড়বে? এটা কি অ্যালাউড?

কেউ প্রশ্ন করছে না ওই প্রসেসগুলো, ইন ইচ অ্যান্ড এভরি কেইস, ফলো করে হইছে কিনা। কারণ, আই রিপিট, পুলিশ একটা ইনস্টিটিউশন। ওই ইনস্টিটিউশনের নির্ধারিত নিয়ম ১০০% মেনে চলার দায় রয়েছে। এইটা একটা কার্যকর রাষ্ট্রের কাঠামো ধরে রাখার জন্যে খুব ইম্পর্টেন্ট। অথচ দুই দিন আগে দেখলাম চার-পাঁচ জন পুলিশ একটা ছেলেকে একটা রুমে নিয়ে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করল। (যেইটা অনেক সুশীলবন্ধু রাবার বুলেট বলে জাস্টিফাই করেছেন)।

একটা ডাকাত ডাকাতি করতে পারে, একটা খুনি খুন করতে পারে, একজন শিবির রগ কাটতে পারে—তার জন্যে ডিউ কোর্স অফ লিগাল অ্যাকশন আছে। কিন্তু এক জন পুলিশ বিক্ষুব্ধ জনতার উপর নিজের এসওপি মোতাবেক ডিউ ডিলিজেন্স না করার আগে গুলি শুরু করতে পারে না। এবং যদি পুলিশ এই ধরনের ঘটনায় অভ্যস্ত হয়ে যায়, আগামীকাল পুলিশ যে কোনো লোক মেরে র‍্যাবের মতো বলবে ক্রসফায়ারে মারা গেছে। যারা র‍্যাবের ক্রসফায়ারে শঙ্কিত

তাদের উচিত গতকালের ঘটনায় উচ্চকিত হওয়া, নইলে তাদের মরাল আরগুমেন্টটা থাকে না। কারণ, পুলিশ যদি ইনস্টিটিউশনালি ফেইল করে, পুলিশ যদি কোনো সিস্টেম ফলো না করে, পাখির মতো গুলি করার অধিকার পেয়ে যায়, তো একটা ইনস্টিটিউশন ভেঙে পড়ে। রাষ্ট্রের নৈতিকতার ভিত্তি ভেঙে পড়ে।

আমার মনে হয়েছে, এইটা আওয়ামী লীগের হাতে ব্যাপক দলীয়করণের মাধ্যমে পুলিশের মতো একটা স্যাকরেড ইনস্টিটিউশনের সম্পূর্ণভাবে অকার্যকর এবং নিরপেক্ষ চরিত্র হারিয়ে ফেলার উদাহরণ। কোথায় যেন পড়েছিলাম, গত চার বছরে পুলিশে প্রায় ১০,০০০ নাকি ১৩,০০০ রিক্রুট হইছে। এর মধ্যে ৮০% ছিল গোপালগঞ্জ আর কিশোরগঞ্জ। এবং ছাত্রলীগের বিভিন্ন কলেজ, ইউনিভার্সিটির নেতাদেরকে গণহারে পুলিশে ঢোকানো হইছে। আজকের ওই গোপালগঞ্জের ছাত্রলীগের নেতারা তাদের প্রতি সরকারের বদান্যতার প্রতিদান দিচ্ছে না তো?

আই রিপিট গতকাল যেইটা হইছে, সেইটা ইনস্টিটিউশনাল ফেইলর। একটা ইনস্টিটিউশন যদি ভেঙে পড়ে, রাষ্ট্রের কাঠামো ভেঙে পড়ে। একটা ইনস্টিটিউশনকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকতে হয়। একটা মানুষ, সে জামায়াত হোক, শিবির হোক, ছাত্রলীগ হোক, ধনী হোক, দরিদ্র হোক, নাস্তিক হোক, হিন্দু হোক, মুসলমান হোক—তার সাথে ইকুয়াল ট্রিটমেন্ট করার দায় রয়েছে রাষ্ট্রের প্রতিটি ইনস্টিটিউশনের। কিন্তু দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর রায়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে যারাই বিক্ষোভ করবে, ভাঙচুর করবে, তাদেরই গুলি করে প্রতিহত করাটা ইকুয়াল ট্রিটমেন্ট নয়।

এখন গুলিগুলো লাগছে যারা সুশীলদের হিসেবে গ্রাম বা মফস্বলের থার্ড ক্লাস, নিম্ন প্রজাতির, ধর্মান্ধ কিছু সাঈদীর ভক্ত, যাদের জীবনের মূল্য নাই। কিন্তু কয় দিন পর হাই ক্লাস, হাই সুশীল, ধর্মনিরপেক্ষ, উচ্চ মূল্যের জীবনেও পুলিশ এসে আঘাত করবে। যদিও প্রবাবিলিটি হিসেব করলে আমাদের মতো মানুষেরা যাদের বাসায় নেট অ্যাকসেস আছে কমফোর্টেবল মিডল ক্লাস জীবন আছে তাদের এই ধরনের ঘটনার মুখে পড়ার সম্ভাবনা কম—কিন্তু আসবে। লিখে রাখুন, ওরা একদিন আপনার, না হলে আপনার সন্তানের দিকে আসবে। তাই আপনি যদি এখন পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত নাও হন, ওই কমফোর্ট লেভেলের ভেতরে

থেকেও আপনাকে আজ ইনস্টিটিউশনের পক্ষে দাঁড়াতে হবে।
কারণ, ইনস্টিটিউশন ভেঙে পড়লে রাষ্ট্র অকার্যকর হয়ে পড়ে। এই ধরণের ঘটনায় রাষ্ট্রের নিজের নৈতিকতার ভিত্তি ভেঙে পড়ে।

চ্যাপ্টার ২৯. ঢাকায় যাচ্ছে হেফাজত, হেফাজতের লং মার্চ

বাংলাদেশ রাষ্ট্র এইভাবে অনিশ্চয়তার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে দুলতে থাকে পুরো মার্চ মাস।
কিন্তু আওয়ামী লীগ তখন বলে যাচ্ছে, তাদের বয়ান ১৮ তারিখে, শেখ হাসিনা বলেন, 'সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শেখ হাসিনা: খালেদা জিয়া সিঙ্গাপুর থেকে মানসিক অসুস্থ হয়ে এসেছেন।'
এই নিয়ে কিছু দিন ক্যাচাল চলে পেপার পত্রিকায়। রাষ্ট্রপতির মৃত্যু তত্ত্বাবধায়ক, এই সব ইস্যু কিছুদিন ধামাচাপা দেয়, কিন্তু আমার দেশ অদম্য উৎসাহে ধর্মপ্রাণ মানুষগুলোকে খুঁচিয়ে চলেছে।
আমি এই দিনগুলো থেকে অল্প কিছু নিউজ কোট করছি। প্রতিদিন কাভার করার দরকার নাই।
২১ মার্চ
আমার দেশ
ত্বকী হত্যাকাণ্ড নিয়ে একটি ইংরেজি দৈনিকের অপসাংবাদিকতা: হজরত আয়েশা (রাঃ)-কে মহানবী (সা.)-এর কন্যা লিখে নিবন্ধ প্রকাশ (নাউজুবিল্লাহ)
মাগুরায় ইসলাম নিয়ে শিক্ষকের কটূক্তির প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ, আগুন
হেফাজতের লং মার্চের ঘোষণা ঢাকা অভিমুখে।
২২ মার্চ
লংমার্চ বাস্তবায়নে সমন্বয় কমিটি গঠন: মুসলমান হিসেবে এদেশে বসবাস করাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতে পারে—আল্লামা শাহ আহমদ শফি
আল্লাহ ডিম পাড়ে, নামাজের দরকার নেই (নাউজুবিল্লাহ): কোটালিপাড়ায় হিন্দু শিক্ষকের আল্লাহ ও নামাজ নিয়ে কটূক্তি
২৬ মার্চ আমার দেশ

সারাদেশ থেকে হেফাজতে ইসলামের প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি: নাস্তিকদের শাস্তি না দিলে ৬ এপ্রিল ঢাকায় কোটি মানুষের সমাবেশের হুঁশিয়ারি

৩০ মার্চ আমার দেশ

ইসলামী আন্দোলনের মহাসমাবেশে বক্তারা: সংবিধান থেকে আল্লাহর প্রতি আস্থা তুলে দিয়ে নাস্তিকতাকে উসকে দিয়েছে সরকার: ৬ এপ্রিল ঢাকামুখী লংমার্চে সমর্থন ঘোষণা

মার্চের শেষদিকে সরকার বুঝতে পারে তাদের কিছু একটা করা দরকার। রাসুলের ইজ্জত ফোকাস করে যেই বিস্ফোরণ জেগে উঠছে তাকে কনটেন করতে হবে। এই সময় সরকার আমার ব্লগসহ বেশ কিছু ব্লগ বন্ধ করে এবং তিনজন ব্লগার গ্রেফতার করে।

সে সময়ে আল্লামা শফি সাহেবের সাথে হাসান মাহমুদ সহ লীগের কয়েকজন মন্ত্রী দেখা করে। তারা শফি সাহেবকে শান্ত করতেই এই পদক্ষেপগুলো নেয়। মহানবীকে কটূক্তি করার দায়ে ৮৪ ব্লগারের তালিকা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে দেয়া হয় ৩১ মার্চ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কটূক্তিকারীদের শনাক্তে গঠিত নয় সদস্যের কমিটির সঙ্গে দেশের আলেম সমাজের বৈঠকে এ তালিকা হস্তান্তর করা হয়। এই তালিকাটি কে করেছে জানা যায় নি। এই নিয়ে ব্লগারদের মধ্যেও সমালোচনা হয়। কিন্তু অনেক পুরাতন ব্লগারের নাম থেকে বোঝা যায় এটি কোন এক/একাধিক পুরাতন ব্লগারের সার্ভিস টু গভর্মেন্ট।

এই ছাড়াও এই দিনগুলোতে, গণজাগরণ মঞ্চ চিটাগাং যেতে চাইলে হেফাজত সেদিন বাধা দেয়ার ঘোষণা দেয়। সরকার সংঘর্ষের আশংকা দেখে আগাম ১৪৪ ধারা জারি করে। ইমরান সরকার আল্লামা শফির সাক্ষাৎকার চান কিন্তু আল্লামা শফি কোন সাক্ষাৎ দেন নাই। হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আজিজুল হকের কথায়, ‘যুদ্ধাপরাধীর বিচার নিয়ে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। আমরা কখনো জামায়াতের পক্ষে ছিলাম না এবং নেই। গণজাগরণ মঞ্চের বিরুদ্ধেও আমাদের কোন বক্তব্য নেই। তবে ইমরান এইচ সরকারসহ কয়েকজন নাস্তিক ব্লগারকে চট্টগ্রামে সমাবেশ করতে দেওয়া হবে না’।

এই সময়ে কয় একজন ব্লগার কে রিমান্ডে নেয়া হয়।

প্রথম আলো: সাত দিনের রিমান্ডে তিন ব্লগার

এইটা ছিল, আওয়ামী লীগের আর একটা রিমার্কেবল টার্নঅ্যারাউন্ড এবং ড্যামেজ মিটিগেশানের প্রচেষ্টা। যেই শাহবাগ যেই ব্লগার নামক গোত্র আওয়ামী লীগের চোখের মণি ছিল, সেইটা এখন আওয়ামী লীগের জন্যে ঝামেলা বয়ে নিয়ে এসেছে। তাই ব্লগার গ্রেফতার।

নাস্তিক ইস্যুতে তখন আমার দেশ এবং হেফাজত বাংলাদেশ গরম করে ফেলেছে। চরম ভাবে চলছে প্রোপাগান্ডা যুদ্ধ সোস্যাল মিডিয়াতে।

কিন্তু এখন অনেক দেরী হয়ে গেছে।

হেফাজত তখন ৬ এপ্রিল ঢাকায় মহাসমাবেশের ডাক দিয়েছে। এবং সেই উপলক্ষে তারা ১৩ দফা দাবি জানায়। এই ১৩ দফার বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশ আফগানিস্তান হয়ে যাবে, এমন রব তুলে সেক্যুলাররা।

হেফাজতের ১৩ দফা অনেক বড় একটা নোটে কাভার করব।

চট্টগ্রামের ওয়াসার মোড়ে হেফাজত তখন পারমানেন্ট অবস্থান নিয়েছে। এবং তারা একটা বড় শক্তি হয়ে উঠেছে। হেফাজতের ঢাকায় আসা ঠেকানোর জন্যে টিপিকাল স্টাইলে পুরো ঢাকা ব্লক করে দেয় সরকার। এবং তাদের মুল দাবি, রাসুলের অপমানের প্রতিশোধ। এমন একটা দাবি, যা অনেক ধর্মপ্রাণ এবং নন প্রাকটিসিং মুসলমানের সাথে কানেক্ট করে।

ফলে হেফাজত দৃশ্যতই শক্তি অর্জন করতে থাকে। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছিল। সরকারের প্রতিক্রিয়া হেফাজতকে আরও শক্তিশালী করে দিচ্ছে। এই দিন আওয়ামী লীগ পন্থী ২৭ টি সংগঠন হরতালের ডাক দেয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম ছুটির দিনে হরতাল এবং সরকারি লোকের হরতাল। এবং শাহবাগ থেকে ৬ এপ্রিল নগরীর বিভিন্ন অঞ্চলে অবরোধের ঘোষণা দেয়া হয়।

প্রথম আলোর রিপোর্ট

আবার জেগেছে শাহবাগ

‘জামায়াতের আরেক নাম হেফাজতে ইসলাম’, ‘মুক্তিযুদ্ধের বাংলায়, হেফাজতের ঠাঁই নাই’ এ ধরনের বিভিন্ন শ্লোগান উচ্চারিত হচ্ছে শাহবাগে।

গণজাগরণ মঞ্চ থেকে জানানো হয়, শাহবাগের পাশাপাশি রাজধানীর প্রবেশপথ সদরঘাট, যাত্রাবাড়ী, কমলাপুর, আবদুল্লাহপুর, আশুলিয়া এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।

শাহবাগের এই হেফাজত বিরোধী আন্দোলন খুব অবাক হওয়ার মতো। কারণ,

শাহবাগের কোনমতেই হেফাজতের প্রতিপক্ষ হওয়ার দরকার ছিল না। এবং যেই শাহবাগ বাংলা পরীক্ষা দেয়ার কথা বলে জামায়াত-শিবির বিরোধী মুভমেন্ট ছাড়া সব ধরনের কার্যক্রম অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছিল, সেই শাহবাগ সরকারের হেফাজত ঠেকাওয়ের লাঠি হচ্ছে দেখে অনেকেই অবাক হয়।

৬ এপ্রিল ছিল ঢাকায় হেফাজতের লং মার্চ। এখন আমি অনেক বেশি করে আমার সেই সময়ের নোটগুলোর হেল্প নিব। কারণ এই সময়ে আমি খুব ডিপলি হেফাজতের মুভমেন্টকে অনুসরণ করা শুরু করি। এবং অ্যানালিসিসের অবজারভেশানগুলো এখনও জারি আছে।

লং মার্চের আগের দিন ৫ এপ্রিল। প্রকাশিত।

হেফাজতে ইসলাম আর ঢাকামুখী লংমার্চ প্রসঙ্গে আমার দশটা কথা

১। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই লংমার্চ প্রথম কোন লংমার্চ কর্মসূচি নয়। লংমার্চ করলেই যে হাতি, ঘোড়া মেরে ফেলবে, ঢাকা অবরুদ্ধ হয়ে যাবে, সরকার পতন হয়ে যাবে তাতো না। কিন্তু হেফাজতের মতো পূর্বপরিচয়হীন একটা দল ঠেকানর জন্যে এতো গুরুত্ব দিয়ে আনপ্রেসিডেন্টেড ভাবে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম শুক্রবারে হরতাল, পরিবহন ধর্মঘট-কর্মসূচি এবং পালটা কর্মসূচির মাধমে একটা জাতীয় ক্রাইসিস সৃষ্টি করার কারণ কি? এর ফলে তাদের শক্তি এবং গ্রহণযোগ্যতা কি আরো সংহত হল না?

২। হেফাজতের দাবিগুলোর দিকে তাকালে দেখবেন, এর মধ্যে নতুন কিছু নাই। এইগুলো গড়পড়তা বাংলাদেশের সব ইসলামিক দলগুলোর স্ট্যান্ডার্ড দাবি। এই দাবিগুলোর মধ্যে কিছু রাজনৈতিক, কিছু সামাজিক। বাংলাদেশের গোঁড়া ইসলামপন্থী জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক দাবিগুলো নিয়ে কিছুটা সমর্থন থাকতে পারে। কিন্তু সামাজিক নিয়ন্ত্রণের দাবিগুলো নিয়ে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ তো বাদ দিলাম এমন কি গোঁড়া মুসলমানদের মধ্যেও সমর্থন নাই। ফলে একটা দল যদি হঠাৎ করে ইসলামিক দলের উইশ লিস্ট কম্পাইল করে একটা তালিকা বানিয়ে দাবি জানায়—তো বাংলাদেশ আফগানিস্তান হয়ে যাবে কেন?

৩। এবং এই লিস্ট দেখেই একটা গ্রুপ যে অসম্ভব প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে—বাংলাদেশ আফগানিস্তান হয়ে গেল বলে, সরকারের মুখপাত্ররা যে ফিয়ার মঙ্গারিং করতেছে—তা তাদের ধর্মীয় উন্মাদনার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া জিইয়ে রেখে, ইলেকশন ইয়ারে দেশে একটা ডিভাইড অ্যান্ড রুল গেম খেলার একটা চাল

মাত্র। একে এত গুরুত্ব দেয়ার মতো কিছু এখন হয় নাই—এদের গুরুত্ব দিলেই বরং এদের শক্তি সঞ্চয় হবে। এতদিন পাখির মতো মানুষ মেরে, অস্থিরতা সৃষ্টি করে, এখন সরকার এদের অপ্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিয়ে মেইনস্ট্রিম করে দিচ্ছে।

৪। কিসের ভিত্তিতে সরকার হেফাজতের সাথে সমঝোতা করে ব্লগারদের গ্রেফতার করতেছে, মৌলবাদীদের দেয়া লিস্টি ধরে ধরে তাদের ক্রিমিনালের মতো পাবলিকের সামনে এনে ছবি তুলে অপদস্থ করতেছে? এই ধরনের দাবি.. লংমার্চ তো আরও আসবে.. পরে যদি এরা দাবি তুলে সকল ব্লগারদের জনসমক্ষে কতল করা হোক—তো সরকার কি তখন সবাইকে দেখিয়ে ব্লগারদের কতল করবে?

নেটের নেট-অ্যানোনিমিটির সুযোগে কিছু কিছু ব্লাসফেমাস কথাবার্তা হয়। কিন্তু এইটার স্পেস এতো লিমিটেড যে এইটাকে এতো গুরুত্ব দিয়ে একটা রাষ্ট্রীয় লেভেলের ক্রাইসিস সৃষ্টি করার কোন মানে হয় না। এইটা আমার দেশ গংয়ের গোল—কিন্তু সরকার কেন সেই তালে ডুগডুগি বাজাচ্ছে।

৫। এইটা কি একটা সিভিলাইজড দেশের মতো হ্যান্ডল করা যেত না? উদাহরণ হিসেবে, তথ্য মন্ত্রণালয় চাইলে ব্লগের অ্যাডমিন, সিনিয়র ব্লগার, নেট অ্যাকটিভিস্ট, উলেমা, লইয়ার, আইনপ্রণেতাসহ একসাথে বসে এই ইস্যু নিয়ে একটা ব্রড ডিসকাশন করতে পারত না?

সাইবার স্পেস এ ব্লাসফেমি ছাড়াও আর কিছু ইস্যু আছে, যা একটা ইনফরমড ডিবেটের দাবি রাখে। যেমন পর্নগ্রাফি, বুলিইং, শিশুদের উপর অ্যাবিউজ, ফ্রড, সোশ্যাল ডিজরাপশান এবং ফ্রিডম অব স্পিচের সীমা পরিসীমা নিয়ে একটা সিরিয়াস ইনফরমড ডিবেটের প্রয়োজন হয়ে আছে দশ বছর ধরে। কিন্তু ধাক্কা না খাইলে আমরা প্রয়োজন উপলব্ধি করি না।

এমন একটা সিরিয়াস এবং সিনসিয়ার ডিসকাশন করেন দেখবেন যাদের ধরে নিচ্ছেন অনেক প্রিমিটিভ মৌলবাদী হিসেবে—তারাও কি সুন্দরভাবে বিষয়টা বুঝে নিয়ে একটা কনস্ট্রাকটিভ প্রসেস-এ পার্টিসিপেট করে।

নেটের ডায়নামিকস না বুঝে, দমন এবং নিপীড়নের কায়দায় মুর্খের মতো সরকার যেভাবে লিস্টি ধরে ধরে উইচ হান্টিং করছে তা মধ্যযুগের ইউরোপের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে, এবং তা আওয়ামী সরকারের বিশ শতকের নতুন চালেঞ্জগুলোক বুঝে নেয়ার অযোগ্যতা প্রকাশ করে।

৬। আমার দেশ পত্রিকা, ব্লগোস্ফিয়ারের খুব মার্জিনালাইজড কিছু ইস্যু খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সামনে এনে ব্লগোস্ফিয়ারের বিরুদ্ধে, সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে যেভাবে খুঁচিয়ে তুলছে তা নিঃসন্দেহে ভায়োলেন্স ইনসাইট করার অপরাধের মধ্যে পড়বে।

ফ্রিডম অব স্পিচ আর অন্যতম খুঁটি হইল সেখানে, ইনসাইটেশন অব ভায়োলেন্স এবং ইন্সাইটেশন অব রিলিজিয়াস হেট একটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আমার দেশকে অবশ্যই সেন্সর করা উচিৎ। কারণ আমার দেশকে সুনির্দিষ্ট অপরাধের এগেইনস্টে সেন্সর করে শাস্তির আওতায় না আনলে দেশে সুদূরপ্রসারী সাম্প্রদায়িক সহিংসতার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে।

৭। গণজাগরণ মঞ্চ সব সময় বলে এসেছে এই প্ল্যাটফর্ম থেকে যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবি এবং জামায়াত শিবির নিষিদ্ধের দাবি বাদে অন্য কোনো দাবি তোলা যাবে না। বাংলা পরীক্ষার দিন শুধু মাত্র বাংলা পরীক্ষা দেয়া হবে।

ভালো। তাইলে মঞ্চ এখন কিসের ভিত্তিতে হেফাজত ঠেকানোর কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছে?

হেফাজত তো কওমী মাদ্রাসাভিত্তিক গ্রুপ। জামায়াত-শিবির না। জামায়াত-শিবির আর মওদুদীবাদের সাথে হেফাজত এর চরম একটা আইডলজিক্যাল দ্বন্দ্ব রয়েছে। যদিও দাবি দাওয়ার ক্ষেত্রে তারা অনেক ক্ষেত্রে একসূত্রে মিলিত হয়, সেইটা সকল মৌলিক ইসলামিক দলই হয়। কিন্তু মোদ্দা কথা হইল, হেফাজতের দাবিগুলোর মধ্যে জামায়াত-শিবির রক্ষা করার দাবি নাই। এইটা তাদের গোলও না।

ব্যক্তিগতভাবে মৌলবাদ ঠেকানোর ব্যাপারে সবার নিজস্ব মতামত থাকতে পারে, পার্টিসিপেশন থাকতে পারে—কিন্তু মঞ্চের পক্ষ থেকে হেফাজত ঠেকানোর কর্মসূচিতে যোগদান শেষ পর্যন্ত কি সিগনাল পাঠালো সারা দেশে?

৮। একটা যুক্তি আমি দেখেছি, তা হল, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার। ফলে এখন মৌলবাদের উত্থানে রুখে দাঁড়াতে হবে। আমার তাতে কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু আমার কাছে মুক্তিযুদ্ধের সব চেয়ে বড় চেতনা, বিশ্বের বুকে বাঙ্গালি জাতির আত্মসম্মান নিয়ে, ভাত ও ছাদ-এর অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার। তাইলে এত মানুষ যখন জড়ো হইছিল, তখন ঐটার জন্যেও সিস্টেম পরিবর্তনের ডাক দেয়াটাও তো জায়েজ ছিল।

ওই ডাক দিতে তাইলে এতদিন ভয় পাইছেন কেন? শুধু বাংলা পরীক্ষা দেয়ার জুজু দেখাইসেন কেন? আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনারে যারা শুধু মৌলবাদ আর সাম্প্রদায়িকতার পক্ষ-বিপক্ষের লড়াই-এ আটকে রাখে তাদেরকে সামগ্রিকভাবে পরিত্যাগ করার টাইম আসছে।

৯। গত দুই দিন কিছু লেখা পড়েছি যাতে হেফাজত আর জামায়াত এক হিসেবে দেখানো হইছে। হেফাজতের নেতারা যেমন ব্লগারদের মধ্যে আস্তিক, সংশয়বাদী, নাস্তিক, ধর্মবিরোধীর পার্থক্য দেখতে পারেন না, ঠিক তেমনি দাড়িওয়ালা ইসলামিক অ্যাকটিভিস্ট দেখলেই জামায়াত মনে করাটা আমাদের আরবান সেকুলার মিডিয়া এবং ফেসবুকার মহলের একটা বৈশিষ্ট্য।

এইটা হইল চাইনিজ সিনড্রোম। চীন গেলে সবাইকে একই লাগে—কে হান, কে উইজার, কে মঙ্গল তা একজন ইল-ইনফর্মড মানুষের চোখে ধরা পড়ার কথা না।

১০। সরকার যে যুদ্ধাপরাধের দাবিতে জামায়াত নিষিদ্ধ করবে না সেইটা নিয়ে আমার স্টুডিওয়ের ইকুইপমেন্ট বাজি ধরছিলাম। বাজিটা এখনো বহাল। বরং হেফাজতের এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বাজির স্টেকটা আরো বাড়ায় দিলাম। জামায়াত নিষিদ্ধ করলে এখন আমার স্টুডিও ইকুইপমেন্ট বাদে আমার এক বছরের বেতনও বাজির স্টেক হিসাবে তোলা হইল। কারণ সরকার এখন দেখবে জামায়াত নিষিদ্ধ না করে কন্টেন করে রাখা যায় এবং পলিটিকাল এবং সোশ্যাল সব স্পেসে যুদ্ধাপরাধ-মৌলবাদ গেম খেলা যায় যাতে সুশীলরা পার্টি হয়ে হা-ডু-ডু করে এবং তা দিয়া সব দুর্নীতি ঢেকে রাখা যায়। কিন্তু জামায়াত নিষিদ্ধ করলে যুদ্ধাপরাধের স্টিগমাহীন যে ইসলামিক রাজনৈতিক দলের উত্থান ঘটবে তাকে কন্টেন করা এত সহজ হবে না। এবং দুই মনসার অল্টারনেটিভ হিসেবে তাদের মেইনস্ট্রিম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও কম নয়।

৬ এপ্রিল

হেফাজত ঢাকায় চরম একটা শো ডাউন করে ৬ এপ্রিল। কত লক্ষ লোক জমা হয়েছিল বলা মুশকিল। কিন্তু ঢাকার রাস্তার বড় একটা অংশ হেফাজতের কর্মীদের দখলে ছিল। এইটা ৯০-এর এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের পরে ঢাকায় সব চেয়ে বড় সমাবেশ। এবং এই সমাবেশ বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা বড় শক্তি হিসেবে হেফাজতের আবির্ভাবের ঘোষণা দেয়।

এই লং মার্চের দিন ছিল ছুটির দিন। আমি সারা দিন বসে এই দিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ঘুরে দেখেছি এবং সকাল থেকেই ফেসবুকে আপডেট দিয়েছি, সাংবাদিকের মতো।

৬ তারিখ

হেফাজত ঢাকায় শো ডাউনের দিন

সকাল ১১:২৫-এর স্ট্যাটাস

আজকের এই বিক্ষোভ জনসমাবেশ সরকারের ডাইরেক্ট অবদান। এইটা যদি সরকার হরতাল, অবরোধ, তাদের পোষা বুদ্ধিজীবীদের দিয়া প্রতিরোধ ঘোষণাসহ ইত্যাদি না কইরা বাধা না দিত তো আজ এই অবস্থা হইত না। লাভের লাভ যা হইছে, তা হইল হেফাজত এর মতো একটা লোকাল দলকে সরকার মেইনস্ট্রিম করে দিল।

গ্রামে-গঞ্জে গুলি করে পাখির মতো মানুষ মেরে সরকার আজ এদের খেপিয়ে তুলছে। এখন গ্রাম চলে আসছে ঢাকায়।

দুপুর ১২ঃ২৬-এর স্ট্যাটাস

টিভি খুললাম। আজ ভালো ভালো রান্নার প্রোগ্রাম, পুরাতন বাংলা সিনেমা এবং ডাক্তারদের পরামর্শের অনুষ্ঠান হচ্ছে। কিন্তু দিগন্ত পার হইতে গিয়া দেখি ঢাকা শহর সয়লাব হয়া গেছে।

বাংলানিউজ, বিডিনিউজ দেখলাম সফল হরতালের খবর দিল।

আমাদের আরবান সেকুলার মেডিয়া টোটালি অপ্রস্তুত, এই হাজার হাজার মানুষের সমাবেশকে কিভাবে ট্রিট করবে?

এইটা ভুল হচ্ছে।

এইটা কনফ্রন্ট করতে হবে। আলোচনা করতে হবে। নইলে এরা ঢাকা শহর যদি কাল থেকে দখল করে রাখে তো সেইটা আরো ডেঞ্জারাস হবে।

এরা মার্জিনালাইজড এবং ডিলেজিটিমাইজড জনগোষ্ঠী, অবহেলা, উপেক্ষা আর মিথ্যা এদের আরো খেপিয়ে তুলবে। Its a very delicate situation! Government needs to act very carefully!

দুপুর ১:৫৩ মিনিটে আমার স্ট্যাটাস ছিল

একটু বোরিং হইলেও কয় একটা আলাপ।

খ। সিস্লপিং ড্রাগনকে তাতিয়ে তুলে বাংলাদেশকে ভয়ঙ্কর একটা পরিস্থিতির

মুখে তুলে আনার দায় নিতে হবে চেতনা ব্যবসায়ীদের, যারা আওয়ামী দুর্নীতি এবং দুরাচার লুকিয়ে রাখার জন্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সেকুলার বাংলাদেশ এবং মৌলবাদী বাংলাদেশের লড়াই এ কনভার্ট করছেন।

খ। বাংলাদেশ এখন ক্লিয়ারলি ডিভাইডেড। এক সাইডে আরবান সেকুলার মিডল ক্লাস আর আপার মিডল ক্লাস এবং আরেক সাইডে গ্রাম ও শহরের পেশাজীবী নিম্ন আয়ের লোকজন। প্রথম গোষ্ঠীর মধ্যে সেকুলার আইডিয়া এবং বাঙালিত্বের আইডেন্টিটি চেতনা প্রকট এবং দ্বিতীয় গ্রুপটির ধর্মীয় চেতনা প্রকট।

গ। আমাদের মিডিয়ায় সততা বলে কিছু নাই। সব ভণ্ড। কে কোন সাইড সেইটা বিষয় না। কিন্তু আমাদের দেশে নিরপেক্ষ মিডিয়া বলে কিছু নাই। সবাই বায়াসড টু সামওয়ান।

ঘ। এত লক্ষ মানুষ আজ জড়ো হলো, এইটা একটা বিশাল ঘটনা। পার্সপেক্টিভ যার যাই থাক। কিন্তু এই ঘটনা ক্ষুদ্র করে দেখানোর যে প্রবণতা তা ইসলামিক আন্দোলনকে ক্লিয়ার ইন্ডিকেশন দিবে এই মিডিয়া ইগনোর করতে হবে। ফলে তাদের ডিসিশন মেকিং মিডিয়া দ্বারা পরিচালিত হবে না। মিডিয়া এই স্টান্স নিয়ে নিজের পায়ে গুলি মারতাসে।

ঙ। এখন দুই চানেলে দেখাচ্ছে সালমান খানের সিনেমা। এনটিভি'তে ক্লোজ আপ, ইনডিপেনডেন্ট এ দেখাচ্ছে ক্রাইম টিভি, দেশ টিভি তে রান্নার প্রোগ্রাম, মাছরাঙ্গা, মোহনাতে বিশেষ অনুষ্ঠান, বাংলাভিশন এ নাটক, এটিএন বাংলা তে ডকুমেন্টারি হচ্ছে আর অন্য দিকে ঢাকার রাস্তায় বাংলাদেশের ইতিহাসে ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন বা সভ্যতার সংঘর্ষ হচ্ছে।

চ। আমার ধারণা সরকার জাস্ট বাধা দিয়ে খুঁচিয়ে এদের মেইনস্ট্রিম করে দিল। এইটা জাস্ট চিটাগাংয়ের একটা আঞ্চলিক দল।

ছ। আওয়ামী লীগের পলিটিকাল, অর্গানাইজেশনাল এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার সম্পর্কে আমার কনফিডেন্স আছে। সরকার শাহবাগের মতো আন্দোলনকে সাইজ করছে, এই আন্দোলনকেও করবে।

এই শেষ অবজারভেশানটা আমার বিগত এক বছরের সব চেয়ে যুগান্তকারী অবজারভেশান।

বিকেল ৩:৩১ মিনিটে আমার আর একটা স্ট্যাটাস

একটা কথা পরিষ্কার করে বলি। একদম ক্লিয়ার কথা, স্ফটিকার মতো পিওর কথা। আইডোলজিক্যাল দ্বন্দ্বের কোনো সমাধান হয় না।

রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের সম্পর্ক নিয়ে যে বাহাস এইটা সারা দুনিয়াতে আছে। ডেভেলপমেন্ট হইলেই বরং ধর্মীয় চাহিদাগুলো বেশি অর্জন হয়। আমি ইউকে'তে অ্যাভারেজ মুসলমানদের যে পরিমাণ ধর্ম পালন করতে দেখসি এবং ইসলাম নিয়ে এত পড়াশোনা করতে এবং জ্ঞান রাখতে দেখছি যে একজন জ্ঞানী এবং গোঁড়া বাঙালি মুসলমান তার চাইর আনাও করে না।

বাঙালি জাতীয়তাবাদীতার এবং প্রগতিশীল রাজনীতির (আমি দুইটারে সমার্থক বলে মনে করি না) যে স্বপ্নগুলো সেইগুলো পাইপ ড্রিম। অটোমেটিক সেইগুলোর অর্জন হয় না। ডেভেলপমেন্ট হইলেই সেইগুলো অটোমেটিক হয়ে যায়।

তাই আজকে যারা প্রগতিশীল রাজিনীতি করেন, যারা ধর্মীয় জাতীয়তার উত্থান চান—তাদের উভয়কে বলছি—বাংলাদেশের ৯ কোটি দরিদ্রসীমার নীচে বাস করা মানুষের কথা খেয়াল রাখেন।

দেশের অর্থনীতির চৌদ্দটা বাইজা গেছে। দেশ পিছায়া যাচ্ছে এই আইডোলজিক্যাল দ্বন্দ্বে। আওয়ামী দুঃশাসনে অর্থনীতি অলরেডি ভেঙে পড়ছে এবং এইভাবে চলতে থাকলে নীরব দুর্ভিক্ষ এবং ভয়াবহ দুর্ভোগ নেমে আসবে। আসেন, কে কে আছেন। আসেন আমরা দেশের উন্নতি চাইয়া, দেশের ইনফ্রাস্ট্রাকচারগুলোর ডেভেলপমেন্ট চাইয়া ২ কোটি বেকার যুবকের চাকরির দাবি নিয়া, জেনুইন ডেভেলপমেন্টের দাবি নিয়া একটা লংমার্চ করি ঢাকামুখী। পচা-নষ্ট-দুর্নীতি মগ্ন, পশ্চাদমুখী এই এস্টাব্লিশমেন্টটা ভেঙে উন্নয়নমুখী একটা দেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়া।

এই আইডোলজিক্যাল দ্বন্দ্ব বাঁচার এই একটা মাত্র উপায়।

রাত ৮:৩১ মিনিটে আমার শেষ স্ট্যাটাস

আজ ছুটির সারা দিন, সব কাজ কাম বাদ দিয়া টিভির সামনে আঠার মতো বসে ছিলাম আর ফেসবুকে স্ট্যাটাস মারছি। পেইন লাগলেও কিছু অবজার্ভেশান।

ক। মঞ্চে বক্তব্যের টোন হেফাজত হোক, আওয়ামী লীগ হোক—বঙ্গবন্ধুর সেট

করে দেয়া স্টাইল টাই এখনও স্ট্যান্ডার্ড।

খ। হেফাজতের নেতাদের বক্তব্য শুনে আমার ফিলিংস হইল, তাদের অজ্ঞানতা অবিশ্বাস্য রকম ভাবে স্থূল। শুধু মাত্র আমার দেশ পড়েই তাদের পুরো ধারণা ফর্ম হইছে। তারা কখনও ব্লগ এ ঢুকে যাচাই করেন নাই ব্লগার, আস্তিক, নাস্তিক, ধর্ম বিদ্বেষী এবং ব্লাসফেমারদের পার্থক্য। এতো অল্প জ্ঞান নিয়া এতো গভীর অজ্ঞানতাকে ধারণ করে এতো বড় একটা সমাবেশ ডাক দিয়ে এই ভাবে বিদ্বেষ উস্কে দেয়া একটা বিশাল বড় ইরেস্পন্সিবিলিটি।

গ। যদিও ১৩ টা দাবি আছে কিন্তু ব্লাসফেমিটাই আজকের সব বক্তাদের মূল ক্ষোভ। এইটা নিয়া সরকারের কিছু একটা করে, এই ক্ষোভটাকে প্রশমিত করা উচিৎ। মুসলমানদের জন্যে, রাসূলকে নিয়া নোংরামি অফ লিমিটস। বাংলাদেশের মতো ৯০% মুসলমানের দেশে, এই ব্যাপারে আইন থাকা উচিৎ। শেখ হাসিনা কে নিয়া কটূক্তি করলে যদি তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হয় থাকে, তো রাসূলকে নিয়া কটূক্তি করলে শাস্তি হতে অসুবিধা কি। ফ্রী স্পিচের সীমায়, আমি এই ধরনের আইনের সাথে কোন কনট্রাডিকশন দেখি না। ওয়েস্টে, হলোকাস্ট ডিনায়াল এখনও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

ঘ। এরশাদ তুমি কার? কে তোমারে চালায়? এরশাদ কি হেফাজতের জন্যে সরকারের ইমরান ট্রোজান? ভাইরে ভাই। নিউট্রন বোমা বুঝি, এরশাদ বুঝি না।

ঙ। ব্লগার দের একটা সেপারেট এনটিটি হিসবে ট্রিট করা হচ্ছে। দিস ইজ ইনট্রেসটিং। কারণ আমার দেখা মোস্ট ব্লগাররা মূলত, একজিস্টিং পলিটিকাল পার্টিদের এলাইনমন্ট অনুসারে চলে। রাষ্ট্র, মিডিয়া, পলিটিকাল পার্টিরা এখন ব্লগারদের আলাদা একটা এনটিটি হিসেবে ট্রিট করাটা একটা বিশাল বড় মিসড অপারচুনিটিকে নির্দেশ করে। রাজিব হত্যার পর, তারে ব্রান্ডিং করে ব্লগাররা যে ভুল করছে, তা না করলে আজ তারা একটা অল্টার্নেটিভ ফোর্স হিসেবে দাঁড়াতে পারত।

চ। প্রতিটা মিডিয়া এখন কোন না কোন পক্ষের অ্যাক্টিভিস্টের ভূমিকা নিছে। এইটা খুব ভয়ঙ্কর একটা ট্রেন্ড। আজ বাংলাদেশে যা হইছে তা হইল ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশান। এতো বড় একটা ঘটনা আড়াল করে অধিকাংশ মিডিয়ায় রান্না, বান্না, সিনেমা, আর উচ্চাঙ্গ সংগীত দেখাইছে। যদি মিডিয়া এই ভাবে ক্রেডিবিলিটি হারায় ফেলে অনেক বড় একটা জনগোষ্ঠীর কাছে তারা

ইরেলেভেনট হয়ে যাবে। অলরেডি হয়ে গেছে। ফলে প্রেসার গ্রুপ হিসেবে মিডিয়ার ক্ষমতা খর্ব হবে।

ছ। ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আওয়ামী লীগ, সামনে একটা বলছে, পেছনে আরেকটা কাজ করছে এবং মিটিং শেষে আরেকটা আলাপ দিচ্ছে। সমাবেশ শেষে আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি মাহবুবুল আলম হানিফ যা বলছেন, তার সারমর্ম হল, হেফাজত ভাল, কিন্তু বিএনপি জামায়াত জোর করে ওদের এইগুলো করাইছে। শেম।

জ। হেফাজত, জামায়াত শিবির কে প্রশ্রয় দিয়ে কোন বক্তব্য দিছে এমন শুনি নাই। ভেতরে অন্য কিছু থাকতে পারে কিন্তু সামনা সামনি তারা জামায়াতের পক্ষ নেয় নেই। এই অবস্থায় গণজাগরণ মঞ্চ, হেফাজত ঠেকাও কর্মসূচিতে পার্টিসিপেট করে নিজেদেরকে অফিশিয়ালি হেফাজতের প্রধান এন্টি পার্টি হিসেবে এস্টাব্লিশ করল। আজ চুপচাপ গ্যালারিতে বসে কি হয় তা অবজারভ করাটাই হইত ইন্টেলিজেন্ট ডিসিশান। কিন্তু জাগরণ মঞ্চ এবং অনান্য তথাকথিত অরাজনৈতিকদের নামিয়ে দিয়ে আওয়ামী লীগ চুপে ছিল গ্যালারিতে। এইটা ক্লিয়ার—আগামীতে হেফাজতের প্রতিপক্ষ হিসেবে আওয়ামী লীগ জাগরণ মঞ্চকে ইউজ করবে। জামায়াত নিষিদ্ধ এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের গোল অর্জনে মঞ্চের কি লাভ হইল তা যারা এই ডিসিশান নিছে তারাই বলতে পারবেন।

ঝ। গত দুই মাসের আমার দেশের টানা প্রপাগান্ডা, ব্লাসফেমাস ব্লগগুলো কে, হাই লাইট করে প্রতিবেদন এবং পুলিশের গুলিতে পাখির মতো মানুষ মারা যাওয়াতে একটা ব্যাপক ক্ষোভ জন্ম হইছিল। ফলে, যে কোন একটা নন জামাতি, ক্রেডিবল ইসলামিক প্লাটফর্ম ফ্রাসট্রেশান কে ভেন্টিলেট করে নিজের দিকে আনতে পারত। হেফাজত এই খানে নিমিত্ত মাত্র। আমি সিওর চরমোনাইয়ের পীর, আজকে চরম আফসোস করতাছে, কয় দিন আগে ডাক দেয়া মহাসমাবেশ কলড অফ করার কারণে।

ঞ. হেফাজতের মতো একটা আঞ্চলিক দলকে এই ভাবে মেইনস্ট্রিম করার ফুল ক্রেডিট আমি সরকার কে দিলাম।

ট। হেফাজত একটি চরম প্রতিক্রিয়াশীল দল। তারা আজ এক দিনেই আন প্রেসিডেন্টেড শক্তি অর্জন করছে।

Be afraid. Be very very afraid.

হেফাজতের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে শাহবাগকে আবার জাগানো হয়।

প্রথম আলো

আবার জেগেছে শাহবাগ

হেফাজতে ইসলামের লংমার্চকে কেন্দ্র করে আজ যেন নতুন করে জেগে উঠেছে শাহবাগ। এই জাগরণে যুক্ত হয়েছে ভিন্ন মাত্রা। আয়োজকেরা বলছেন, তারা আজ সারারাত সেখানে অবস্থান করবেন। কাল বিকেল চারটা পর্যন্ত তাদের এই অবস্থান চলবে।

হেফাজতে ইসলামের লংমার্চের প্রতিবাদ এবং জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে আজ সন্ধ্যা ছয়টা থেকে আগামীকাল সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত হরতালের ডাক দেয় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ২৩ টি সংগঠন। তাদের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টা থেকে ২২ ঘন্টার অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করে গণজাগরণ মঞ্চ।

চ্যাপ্টার ৩০. ব্লাসফেমি নিয়ে ডিটেইল ক্যাচাল

বিগত দুই মাসে বাংলাদেশ রাষ্ট্র অস্থিতিশিল হয়ে উঠেছে বা তাকে অস্থিতিশীল করা হয়েছে রাজীব ওরফে থাবা বাবার লেখাগুলো নিয়ে। সেইটা দিয়ে, পুরো শাহবাগকে নাস্তিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এবং হেফাজতের যে ১৩ দফা দাবি ছিল, তার মধ্যে প্রধান দাবি ছিল 'আল্লাহ্, রাসুল (সা.) ও ইসলাম ধর্মের অবমাননা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা রোধে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে জাতীয় সংসদে আইন পাস।'

যেইটা নিয়ে সেক্যুলার হতে শুরু করে অনেকেই রব তোলে যে এই দাবিগুলো পূরণ করা হলে বাংলাদেশ আফগানিস্তান হয়ে যাবে এবং মুক্ত সমাজে এই ধরনের আইন করা যাবেনা। অন্য দিকে এইটাও সত্য যে ব্লগার থাবা বাবা যে ধরনের লেখা লিখেছিল, তা অত্যন্ত আপত্তিকর।

এবং এই যুক্তিটা আসে, প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কটূক্তি করলে জেল হতে পারলে, রাসুল (সা.) কে নিয়ে উক্তি করা কেন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে না।

আমার কাছে মনে হয়েছে, এই উভয় পক্ষের মতকে ক্রিটিক করে একটা

আলোচনার দরকার আছে, যেটা আমি বিশাল একটা নোট এ প্রকাশ করি।

এই নোটটা সম্পূর্ণ ওয়েস্টার্ন লিবারটিয়ান কন্সেপ্ট দিয়ে তৈরি করা। আমি এইখানে ক্রিটিক করে দেখাই যে, একদম গোঁড়া ওয়েস্টার্ন মুক্ত সমাজেও ফ্রিডম অব স্পিচের একটা সীমা আছে যেইটা নির্ধারণ করে সমাজ।

ফলে, আমাদের সমাজে যেইটা গ্রহণযোগ্য নয় সেইটাই আমাদের সমাজের জন্যে ফ্রিডম অব স্পিচের সীমা। এবং এইটার জন্যে আইনি কাঠামো তৈরি করতে কোন সমস্যা নাই। এবং আমি যুক্তি দেই যেহেতু আমাদের দেশের মানুষ, রাসুলের ব্যাপারে অত্যন্ত সেনসিটিভ এবং আমাদের সামাজিক স্পেসে রাসুলের ব্যাপারে সমালোচনা খুবই অগ্রহণযোগ্য এই জন্যে ওয়েস্টার্ন লিবারটিয়ান তত্ত্বের গুরু জন স্টুয়ারট মিলের তত্ত অনুসারেই আমাদের দেশে ব্লাসফেমি আইন হতে পারে কিন্তু সেইটার শাস্তি কখনই মৃত্যুদণ্ড হতে পারে না। এবং এইটা সকল ধর্মের নবী রাসুল বা ধর্ম প্রণেতাদের জন্যেই হতে পারে। এইটা স্বয়ং স্টুয়ারট মিলের বক্তব্য। কিন্তু এর অপপ্রয়োগ সম্পর্কেও আমি সতর্ক করি।

কিন্তু, এইটাও আমি বলি এমনকি ইসলামের আইনেই সেই অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হতে পারে না। এবং বিষয়ে আমি দ্বিতীয় পর্বে, হাদিস এবং কোরানের রেফারেন্সে একটা লেখার প্রতিশ্রুতি দেই যা আর লেখা হয় নাই।

এইখানে আমি দেখাই। সোস্যাল স্পেস যেহেতু ফ্রিডম অব স্পিচের সীমানা নির্ধারণ করে, সেই জন্যে ইন্টারনেট স্পেসের জিনিস যেইটা বাংলাদেশের সামাজিক স্পেসের জন্যে লেখা হয়নি সেই খান থেকে আপত্তিকর লেখা তুলে এনে এসে পত্রিকার প্রথম পেজে প্রকাশ করে মাহমুদুর রহমান একটা গর্হিত অপরাধ করেছেন।

এই নোটটা সামুতে স্টিকি হয়। এবং আমি প্রচুর গালি খাই। পক্ষ বিপক্ষ উভয় সাইডেই। নোটটা নিচে দিচ্ছি। এইটা অনেক বড়। তাই সামারি করে উপরে বললাম।

এইটা একদম টেকনিকাল মেরিটে আলোচনা। তাই, বোরিং লাগতে পারে।

ব্লাসফেমি নিয়া ক্যাচাল—চা নিয়া, পান চাবাইয়া বসেন। লম্বা কথা আছে।

৯ এপ্রিল ২০১৩ রাত ১১: ১৭

ব্লাসফেমি ব্লাসফেমি ব্লাসফেমি—এখন টক অফ দা টাউন।

গত ৬ এপ্রিল হেফাজতে ইসলাম ঢাকায় যে শো ডাউন করল তাতে ব্লাসফেমি আইন নিয়ে বিতর্কটা দেশের পলিটিকাল ল্যান্ডস্কেপের সামনের সারিতে নিয়ে আসছে।

যদিও হেফাজতের ১৩ দফা দাবি তবুও ৬ তারিখে বক্তাদের কথা শুনলে বুঝা যায় বেশিরভাগ বক্তা রাসুলের অবমাননাকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিছেন। লিস্টি অনুসারে মূল দাবির ভাষা ছিল এই রকম:

'আল্লাহ্, রাসুল (সা.) ও ইসলাম ধর্মের অবমাননা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা রোধে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে জাতীয় সংসদে আইন পাস করতে হবে।'

অন্যদিকে, ৮ তারিখ প্রধানমন্ত্রী বিবিসিকে সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ব্লাসফেমি আইন করা হবে না। এরপর, আজ ৯ এপ্রিল হেফাজত একটা সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছে যে দাবি তারা আদায় করে ছাড়বে। হেফাজত ঢাকায় ৫ লাখ থেকে ১০ লাখের মতো জনসমাবেশ করছে আর প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রের প্রধান। ফলে সিচুয়েশানটা যথেষ্ট ক্রিটিকাল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ইস্যুটা নিয়ে দেশে আরো সহিংস পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। এই অবস্থায় ব্লাসফেমি আইন এবং এই সম্পর্কে একটা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে।

চা নিয়া, পান চাবাইয়া বসেন। এইটা লম্বা ক্যাচাল।

ব্লাসফেমির সংজ্ঞা ও সীমানা:

প্রথমে দেখি। ব্লাসফেমি কি জিনিস।

ব্লাসফেমি অ্যাকচুয়ালি ইউরোপিয়ান ইম্পোরট। কিন্তু আমি ওই দিকে যাব না।

যুগে যুগে দেশে দেশে ব্লাসফেমিকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে ট্রিট করা হইছে। আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলা, রাসুলের সমালোচনা করা, নিজেকে রাসুল হিসেবে দাবি করা, রসুলের ছবি আঁকাসহ বিভিন্ন আচরণ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে ব্লাসফেমির আওতায় পড়ছে।

কোনো কোনো দেশে আবার কোরআনকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা দেয়া, মুসলমানদের সমালোচনা করা, নামাজের সময় শিস দেয়া, মেকআপ করা বা সাজা, যোগব্যায়াম চর্চা করা, নন-মুসলিমদের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া, নাস্তিকতার চর্চা করা, জুয়া খেলাসহ অনেক কার্যক্রমও ব্লাসফেমির আওতায় পড়ছে।

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে ব্লাসফেমির সংজ্ঞা প্রদান ও সীমানা নির্ধারণ:

ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মকে সমালোচনা করা, আমাদের সোসাইটিতে খুব অস্বাভাবিক কোন প্রবণতা নয়। আমাদের সমাজে মৌলবাদী, নরমপপন্থী, চরমপন্থী সবার মধ্যেই ধর্ম নিয়ে সমালোচনামূলক আলোচনার একটা গ্রহণযোগ্যতা আছে এবং সোস্যাল স্পেসের বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়তই ধর্ম নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হয়ে থাকে। যেমন, জাকির নায়েকের টিভি প্রোগ্রামগুলো আমাদের দেশে যথেষ্ট জনপ্রিয়। সেখানে ধর্ম নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা এবং বিভিন্ন সময় ভিন্নধর্মীদের হাজির করে ধর্মকে নিয়ে খুবই চরম বিতর্ক, সমালোচনা এবং পর্যালোচনা করা হয়। এই প্রোগ্রামগুলো আমাদের দেশে খুবই জনপ্রিয়। সেইগুলো কখনও ব্লাসফেমাস আচরণ হিসেবে ধরা হয় না।

কিন্তু ইসলামের নবী-রাসুল মোহাম্মাদ (সা.) নিয়ে কুৎসা এবং রাসুলের জীবন নিয়ে ব্যঙ্গ এবং বিষোদগার আমাদের সমাজে অফ লিমিট এবং অগ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। এই বিষয়গুলোই নেট থেকে খুঁজে নিয়ে আমার দেশ পত্রিকা হাইলাইট করে যা সাধারণ মুসলমানদেরকে খেপিয়ে তুলছে এবং এইটা থেকেই মূল ক্ষোভের উৎপত্তি হয়ে একটা বিস্ফোরণ ঘটছে।

ফলে দেখা যাচ্ছে নবীকে বিষোদগার এবং কুৎসাই ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ক্ষোভের মূল কারণ। তাই আমি এই আলোচনায় ব্লাসফেমির স্কোপ শুধুমাত্র রাসূলকে নিয়ে সমালোচনা এবং রাসুলের জীবন নিয়ে কুৎসা রচনা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব এবং ব্লাসফেমি শব্দটা শুধুমাত্র এই অর্থে ব্যবহার করব। যুগে যুগে দেশে দেশে ব্লাসফেমির স্কোপ এক একভাবে নির্ধারিত হইছে। তাই এই লেখায় যদি ব্লাসফেমিকে শুধু মাত্র রাসুলকে নিয়ে কুটনা গাওয়াতে সীমাবদ্ধ করা হয় সেইটা ভুল হবে না।

ফ্রিডম অব স্পিচের প্রেক্ষাপটে এই সীমানা নির্ধারণের একটা তাত্ত্বিক ভিত্তি আছে। সেই ভিত্তিটাকে বোঝার জন্যে আমি জন স্টুয়ার্ট মিলের হেল্প নিব।

স্টুয়ার্ট মিলকে মুক্ত সমাজের ধারণার প্রধান তাত্ত্বিক হিসেবে ধরা হয়।

স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন,

'একজন ব্যক্তির যে কোনো বিষয়ে আলোচনা করার, মতামত দেয়ার এবং পর্যালোচনা করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকতে হবে, তা যতই অনৈতিক হোক।'

মিল থিওরাইজ করেন যে,

‘সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে একটা যুক্তি তার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার সীমা পেরিয়ে তার যৌক্তিকতার শেষ সীমায় পৌঁছায়।’

আমরা স্টুয়ার্ট মিলের সাহায্য নিয়ে রাসুল (সা.) কে নিয়ে ব্যক্তিগত কুৎসা এবং নোংরা কদর্য রচনাকে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা পেরিয়ে যৌক্তিকতার শেষ সীমায় পৌঁছে কদর্য আক্রমণে রূপ নিয়েছে বলে ধরে নিতে পারি।

আমরা পরবর্তীতে দেখব, এই সীমানা অতিক্রম করার লাইনটাকেই পশ্চিমা বিশ্বের ফ্রি সোসাইটি এবং মুক্তবুদ্ধির তাত্ত্বিকরা ফ্রিডম অব স্পিচের বাউনডারি হিসেবে বেঁধে দিয়েছেন।

কেন এই আলোচনা প্রয়োজন?

কিছু প্রতিক্রিয়াশীল গ্রুপের হাতে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বাদে বাংলাদেশের সমাজ এবং রাষ্ট্র ইসলাম বা অন্য ধর্ম চর্চার ব্যাপারে তেমন কোনো গোঁড়ামি দেখায় না।

বাঙালি মূল্যবোধের সাথে ইসলামি অনুশাসনের মিথস্ক্রিয়াতে বাঙালি সমাজে একটা ইউনিক ধর্মচেতনা গড়ে উঠেছে যা অনেক সহনশীল এবং আপোষকামী। সেই আপোষকামী মনোভাবে মৌলচেতনার দলগুলো অনেক ক্ষেত্রে চরমপন্থী আনার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি কখনো তাদেরকে মূলধারায় আসতে দেয়নি। এজন্যই আমাদের দেশে এখনো দুইজন মহিলা পালাক্রমে দেশ চালাচ্ছেন (যদিও খুবই বাজেভাবে চালাচ্ছেন) কোনো ধরনের ধর্মীয় প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন না হয়েই।

কিন্তু শাহবাগের উত্তাল দিনগুলোর সময় রাজীবের হত্যাকাণ্ডের পর রাজীবকে দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ হিসেবে ব্র্যান্ড করাসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ডে জাতীয়তাবাদী পত্রিকা আমার দেশ—বিএনপির রাজনৈতিক মিত্র জামায়াতকে রক্ষা করার জন্য থাবা বাবার নোংরা এবং কদর্য লেখাগুলো দিয়ে পুরো শাহবাগ মুভমেন্টকে ডিলিজিটিমাইজ করার স্ট্র্যাটেজি নেয় এবং থাবা বাবার লেখাকে রাজনীতিকরণ করেন।

দিনের পর দিন তারা একটা ভয়ঙ্কর পলিটিক্যাল গেম খেলেছেন, নেটের কোনায়-কোনায় পড়ে থাকা, জিরো হিট, জিরো একসেপট্যাবল লেখাগুলো দিয়ে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ধর্মীয় বোধ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে।

থাবা বাবার লেখাগুলো ছিল চরম ঘৃণ্য এবং কদর্য।

গোঁড়া ধর্মীয় মৌলবাদীর কথা বাদ দিলাম, সাধারণ মুসলমানের কাছেই থাবা বাবার নামে লেখাগুলো টলারেবল ছিল না। ফলে আমার দেশের এই প্রোপাগান্ডায় বিভিন্ন মৌলিক ইসলামি দলগুলোর মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয় তার বিস্ফোরণ ঘটে ৫ এপ্রিল, যখন প্রায় ৫ হতে ১০ লাখ লোকের শো-ডাউন হয় ঢাকার রাস্তায় এবং সারাদেশে, যেখানে তারা ১৩ দফা দাবি পেশ করে।

তাদের এই বিক্ষোভ বাংলাদেশের জন্মের পর, এরশাদবিরোধী বিক্ষোভ বাদ দিলে সর্ববৃহৎ বিক্ষোভ হিসেবে ধরে নেয়া যায়। সংখ্যার একটা ওজন আছে। ফলে এতো দিন ফ্রিঞ্জ লাইনে থাকা এই গ্রুপগুলোর দাবি-দাওয়াকে এখন সিরিয়াসলি পর্যালোচনা করার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। কারণ এই ব্যাপক জনসমাবেশ করার পর তারা এখন সরকারের ওপর, রাষ্ট্রের ওপর, সমাজের ওপর বড় একটা প্রেসার গ্রুপ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

এই অবস্থায় তাদের দাবিকে আওয়ামী লীগের কায়দায় ডিনাই করা সম্ভব কিন্তু তাদের উপেক্ষা করা সম্ভব নয় এবং তাদের কনফ্রন্ট করার প্রয়োজন রয়েছে।

সমস্যা হচ্ছে, ব্লাসফেমি আইনের এই আলোচনাটার ইন্সটিগেটর চরম প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় মৌলবাদী হওয়ার কারণে এবং তাদের দাবিগুলো এক্সট্রিম চরিত্রের হওয়াতে এবং তাদের বেশির ভাগ দাবি আমাদের সমাজের চেতনায় সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণযোগ্য হওয়াতে, সত্যিকার এবং মিথ্যাকার উভয় শ্রেণির প্রগতিশীল কোনোভাবেই প্রশ্রয় দিয়ে দাবিগুলোকে গুরুত্ব দিতে সম্মত নয়।

তাদের ১৩ টা দাবি নিয়ে আমি কোনো আলোচনায় যাব না। আমি শুধু আলোচনা করব তাদের মূল দাবি নিয়ে যেটা থেকে এই ক্ষোভ এবং বিক্ষোভের জন্ম, সেইটা হলো,

‘আল্লাহ্, রাসুল (সা.) ও ইসলাম ধর্মের অবমাননা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা রোধে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে জাতীয় সংসদে আইন পাস করতে হবে।’

এমন কী মৌলিক ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতেও এইটা একটা অন্যায্য দাবি।

কারণ আমরা পরবর্তীতে আলোচনায় দেখব, যে ইসলামের ভিত্তিতে তারা এই দাবিগুলো তুলছে সেই ইসলামের মূল গ্রন্থ আল-কোরআনে ব্লাসফেমি আচরণে মৃত্যুদণ্ড তো দূরের কথা, এমন কি শাস্তির কথাও বলা হয় নাই। এই নিয়ে খুব পরিষ্কার আয়াত রয়েছে। ফলে এমনকি কোরানের আয়াত উপেক্ষা করে তাদের

এই দাবিগুলো পরিষ্কার যুক্তির আলোকে আলোচনা করা দরকার এবং তাদের মোকাবেলা করার জন্যে সঠিক যুক্তিগুলো তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া দরকার।
তাছাড়া তাদের এই দাবি মুক্তবুদ্ধির চর্চার ক্ষেত্রে এবং সত্যিকারের প্রগতিশীল সমাজ এবং রাষ্ট্র গড়ার পথে চরম একটা বাধা সৃষ্টি করবে, কারণ, যুগে যুগে দেখা গেছে এই ধরনের আইন সৃষ্টি করে রাষ্ট্র এবং সমাজের মৌল একটা অংশ অপশাসন, কুশাসন এবং আইনের অপপ্রয়োগের মাধ্যমে মূলত তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতাই সংহত করে এবং সমাজে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে। এইটাও দীর্ঘ আলোচনায় আসবে।
অন্যদিকে আছে চরম প্রতিক্রিয়াশীল তথাকথিত মুক্তবুদ্ধির ধারকেরা।
তারা এই বিষয়ে কোনো আলোচনাই করতে রাজি না। তাদের কাছে এই ডিসকাশন করাটাই হইল বাংলাদেশ পাকিস্তান হয়ে যাওয়া।
শেখ হাসিনারে কটূক্তি করলে বাংলাদেশে আইন থাকতে পারে, বঙ্গবন্ধুরে কটূক্তি করলে বাংলাদেশে আইন থাকতে পারে, কিন্তু রাসুলকে নিয়ে যা ইচ্ছে তা বলা যাবে এবং এই নিয়ে কোনো আলোচনা করতে গেলে সেটা ফ্রি স্পিচের জন্য বাধা হিসেবে ট্রিট করে তারা।
মুক্ত আলোচনায় তাদের ইনটলারেন্স লেভেল গোঁড়া মৌলবাদীর থেকে কম নয়।
এইজন্য পুরো প্রশ্নটাকে ধর্মীয় মৌলবাদ আর ভণ্ড প্রগতিশীলদের পারস্পেকটিভ থেকে মাইনাস করে, মুক্ত সমাজ, ফ্রিডম অফ স্পিচের মৌলিক আইন এবং কোরানে কি বলা আছে তার টেকনিক্যাল মেরিট আলোচনা করার প্রয়োজন আছে এবং আমি অল্প জ্ঞান নিয়েও তার একটা অক্ষম চেষ্টা করব।
এখানে আমি স্বীকার করে নিই মুক্তচর্চা, ফ্রিডম অফ স্পিচ, লিবার্টি আমার নিজস্ব ইন্টারেস্টের জায়গা। কিন্তু থিওলজি আমারি এরিয়া অব ইন্টারেস্ট না। ফলে এইটা নিয়ে আমাকে নিজস্ব রিসার্চ করতে হইছে। এবং আমি যেহেতু কোরআনের তাফসীর না, ফলে, ধর্মীয় বিষয়ে আমার অ্যানালাইসিস এ কোন ভুল থাকলে আমি আগে থেকে তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।
ব্লাসফেমি এবং ফ্রিডম অব স্পিচ:
ধর্ম এবং ধর্মীয় পুরুষদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করার নিষেধাজ্ঞার ধারণাটা মূলত লিবার্টি, ফ্রিডম অব স্পিচ এবং ফ্রিডম অব এঙপ্রেশনের ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক। এইটা

নিয়ে একটা ক্লাসিক্যাল ডিবেট হইছে এবং ডিবেটটা মোটামুটি সেটেল্ড। কিন্তু আমরা এখন মুক্ত চেতনার বেসিক লেভেলে পইড়া আছি। তাই এইটা নিয়ে আমি একটু ডিপ এ যাব।

লিবার্টি, ফ্রিডম অব স্পিচ, ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন যথেষ্ট আধুনিক কনসেপ্ট। মূলত ১৭ শতকের দিকে এই ধারণাগুলো পূর্ণতা পায়। তার আগে মানুষ এই ধারণাগুলোর ব্যাপারে সচেতন ছিল না এবং এর প্রয়োজনীয়তাও খুব তীব্রভাবে অনুভব করে নাই।

১৬ শতকের দিকে হবস, জন লক বা রুশো ঘরানার দার্শনিকেরা সোস্যাল কনট্র্যাকট বা সামাজিক চুক্তিকে ডিফাইন করেন। তারা দেখান যে, রাজার ঐশ্বরিক ক্ষমতা বলে কিছু নাই—রাজার যে ক্ষমতা তা মূলত জনগণের ক্ষমতার যোগফল। এবং তারা দেখান যে, রাজার ক্ষমতা দিয়ে জনগণ পরিচালিত হয় না বরং জনগণের ক্ষমতা দিয়ে রাজা পরিচালিত হয়।

ফলে দার্শনিকদের ভাবনায় রাজার ক্ষমতার বদলে ব্যক্তির ক্ষমতার উপর গুরুত্ব চলে আসে। এই ধারণা থেকে ব্যক্তি স্বাধীনতা একটা গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট হিসেবে আবির্ভূত হয়—এই সময়ে।

১৭৯৩ সালে ফরাসি বিপ্লব ব্যক্তির স্বাধীনতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয় এবং ফরাসি বিপ্লবের প্রবক্তারা ডিক্লেরেশন অব দ্যা রাইটস অব মান এন্ড অব দ্য সিটিজেন অথবা ব্যক্তি এবং নাগরিকের সার্বজনীন ক্ষমতা নামের একটা সার্বজনীন ঘোষণাপত্র দেন যাতে,

মানবতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, নাগরিকের স্বাধীনতাসহ বেশ কিছু ঘোষণা দেয়া হয়—এই ঘোষণাপত্রটি বর্তমান লিবারটিয়ান পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত রচনা করে।

এই ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক হলেন—জন স্টুয়ার্ট মিল। ১৮৫৯ সালে যার লেখা ‘ও লিবার্টি’ নামের প্রবন্ধটি আধুনিক ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং ফ্রিডম অব স্পিচ এবং ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশানের মূল ধারণা এবং সীমানাকে ঘোষণা করে।

জন স্টুয়ার্ট মিলকে চোখ বন্ধ করে পাশ্চাত্যের ফ্রি সোসাইটির মূল তাত্ত্বিক হিসেবে ধরা যায়।

ফ্রিডম অব স্পিচের সাথে ব্যক্তিস্বাধীনতা নিয়ে স্টুয়ার্ট মিলের দুইটা ক্রিটিকাল একজিয়ম বা স্বতঃসিদ্ধ আছে।

প্রথম স্বতঃসিদ্ধ হইল-
first, that the individual is not accountable to society for his actions, in so far as these concern the interests of no person but himself. Advice, instruction, persuasion, and avoidance by other people, if thought necessary by them for their own good, are the only measures by which society can justifiably express its dislike or disapprobation of his conducive.
'একজন ব্যক্তি সমাজের কাছে তার আচরণের জন্যে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়। যতক্ষণ সে নিজের ইচ্ছায় শুধুমাত্র নিজের জন্যে কোনো কাজ করো থাকে এবং শুধুমাত্র উপদেশ দেয়া, বোঝানো এবং এড়িয়ে যাওয়া বাদে সমাজ কোনোভাবেই ব্যক্তির আচরণের ওপর জোর করতে পারবে না।'
Secondly, that for such actions as are prejudicial to the interests of others, the individual is accountable, and may be subjected either to social or to legal punishments, if society is of opinion that the one or the other is requisite for its protection. (LV2)
এই প্রথম একজিওমটার লিমিট দেয়া আছে তার দ্বিতীয় একজিওমে। সেইখানে বলা আছে,
'যদি ব্যক্তির সেই কাজ বা আচরণ অন্য কারো কাছে অগ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে তো ব্যক্তিকে সামাজিক বা আইনি শাস্তি দেয়া যেতে পারে, যদি সমাজ মনে করে প্রথম ব্যক্তি বা দ্বিতীয় ব্যক্তির কার্যকারণে অপর ব্যক্তির অধিকার রক্ষার জন্যে সামাজিক বা আইনি প্রতিরক্ষার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে।'
দ্বিতীয় স্বতঃসিদ্ধটাকে বর্তমানে সামাজিক কর্তৃত্বের তত্ত্ব বলা হয়।
এইটা ইন্টারেস্টিং এই জন্যে যে, ফ্রি সোসাইটি বা ফ্রিডম অব স্পিচের উপর বা ব্যক্তির উপর কর্তৃত্বের ক্ষমতা মিল সমাজের উপর স্থাপন করতেছেন। সো, শুধুমাত্র সমাজ যখন মনে করছে যে একটা আচরণ অন্যায়, তখনই সেটা অন্যায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাহলে পার্টিকুলার সমাজের গ্রহণযোগ্যতা ফ্রিডম অব স্পিচ বা ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্যতম একটা ব্যারিয়ার।
এবং ব্যক্তির নিজের মতামত প্রকাশ বা ব্যক্তিস্বাধীনতার সীমানা হিসেবে মিল আরো একটা তত্ত্বের জন্ম দেন যাকে তিনি বলেন 'হার্ম প্রিন্সিপল' বা 'ক্ষতির

নিয়ম’।

http://en.wikipedia.org/wiki/Harm_principle

হার্ম প্রিন্সিপলের মাধ্যমে মিল ফ্রিডম অব স্পিচ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার সীমানা নির্ধারণ করে দেন। হার্ম প্রিন্সিপল বলে, যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য একজন ব্যক্তি বা কমিউনিটির ক্ষতির সম্ভাবনা দাঁড়ায় ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা বা ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

পরবর্তীতে মিলের হার্ম প্রিন্সিপলের কিছু দুর্বলতা বেরিয়ে আসে। কারণ দেখা যায় যে, কারো হার্ম করা বা ক্ষতি করার আগেই অন্য কোনো ব্যক্তি বা কমিউনিটি ব্যক্তির আচরণের কারণে মানসিক ভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং মানুষের মানসিক আঘাত অনেক ক্ষেত্রে শারীরিক আঘাত থেকেও বড় হচ্ছে।

এই আইডিয়া থেকে ফ্রি সোসাইটিতে মিলের হার্ম প্রিন্সিপলটাকে এক্সপান্ড করা হইছে এবং

ফ্রিডম অব স্পিচ এবং এক্সপ্রেশানের বাউন্ডারির সীমা হিসেবে যুক্ত হইছে নতুন একটা প্রিন্সিপল যাকে বলা হচ্ছে অফেন্স প্রিন্সিপল যাকে আমি বাংলায় ভাব অনুবাদ করলে বলতে পারি, কষ্ট পাওয়ার তত্ত্ব।

http://www.mendeley.com/research/harm-principle-offense-principle-skokie-affair/

অফেন্স প্রিন্সিপলের আইডিয়াটা হইল ব্যক্তির কিছু আচরণ, কাজ, কথা যদি অন্য ব্যক্তিকে মানসিকভাবেও আহত করে, তবে তার বিরুদ্ধে আইনের ব্যবস্থা নেয়ার সুযোগ থাকতে হবে। কিন্তু এও বলা হইছে, যেহেতু অফেনসিভ আচরণ, মানুষের ক্ষতি করার থেকে কম সিরিয়াস, তাই এর শাস্তির মাত্রা হার্ম প্রিন্সিপল থেকে কম হওয়া উচিৎ।

কিন্তু এখন কোনটা অফেনসিভ, কোনটা অফেনসিভ না এটা কিন্তু সোস্যাল ভ্যালুজের উপর ডিপেন্ড করে এবং তার গুরুত্ব নির্ভর করে বক্তার উদ্দেশ্য, যে আঘাত প্রাপ্ত হইছে তার আঘাতের মাত্রা, কত বড় জনগোষ্ঠীকে মানসিক আঘাত করা হইছে এবং সমাজের সামগ্রিক ইন্টারেস্টের উপর।

আরো দেখা গেছে, কোন কোন আচরণ বা কথা ক্ষতি বা মানসিক আঘাত হিসেবে বিবেচিত হবে সেটা সময়ের সাথে সাথে চেঞ্জ হয়। এইজন্য কিন্তু কন্টেক্সটটাকেও দেখতে বলা হইছে। এইটা একটা খুবই খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ

বিষয়।

ব্লাসফেমি (রাসুলের বিরুদ্ধে কটূক্তি) এবং ফ্রিডম অব স্পিচ

এইটাকে যদি আমরা ব্লাসফেমির কনসেপ্টে ফালাই তাইলে দেখব, রাসুলের বিরুদ্ধে কটূক্তি ডাইরেক্টলি কারো হার্ম করে না। কিন্তু অফেন্স প্রিন্সিপল-এ এসে রাসুলের বিরুদ্ধে কটুক্তি এবং কুৎসা কিন্তু মানুষের মনে আঘাত করে। এবং এইটা একটা লিগাল প্রটেকশান দাবি করে এবং এই ব্লাসফেমি ধীরে ধীরে জমতে জমতে সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে বিস্ফোরিত হয় এবং ৬ এপ্রিলের মতো একটা সামগ্রিক বিস্ফোরণ ঘটে।

ফলে ক্লিয়ারলি অফেন্স প্রিন্সিপালের আইডিয়া থেকে রাসুলের বিরুদ্ধে কটূক্তি করা, আইনের সীমানায় আসতে পারে, পাশ্চাত্যের গোঁড়া লিবার্টি এবং ফ্রিডম অব স্পিচের তত্ত্বের মধ্যেই। এইটা পিওর টেকনিক্যাল একটা কথা। এইখানে কোন ভগিজগি নাই। তাত্ত্বিকরা ফ্রিডম কে অ্যাবসলউট করতে বলেছেন এবং বলেই তারা বুঝেছেন এই স্বাধীনতা সবাই ঠিকমত ব্যবহার করবে না। তাই তারা এই স্বাধীনতার সীমানাটাও নির্ধারণ করে দিছেন।

অনেকে হয়তো অবাক হবেন। বলবেন, সারারাত রামায়ণ পড়ে এখন বলছি সীতা কার বাপ। কিন্তু ইন্ট্রেস্টিংলি মিল-এর একজিওম অনুসারে ব্লগারদেরকে গ্রেফতার করাটা ভুল ছিল। কারণ এই তত্ত্ব অনুসারে তারা লিগাল অফেন্স করে নাই।

ওয়েল, এই জন্যেই ডিপ-এ যেতে হয়। মিল-এর তত্ত্ব দুটা সিম্পল কয়েককটা লাইন। কিন্তু এর ইন্টাপ্রিটেশান অনেক অনেক গভীর।

একটু বলে নেই, যে ব্লগারদের গ্রেফতার করা হইছে তাদের কাউকে ব্যক্তিগত ভাবে আমি চিনি না এবং কারো লেখার সাথে পূর্বপরিচিত নই। কোনো এক সময় আসিফ মহিউদ্দিনের কিছু লেখা পড়েছি। কিন্তু থিওলজি আমার ইন্টারেস্টের সাবজেক্ট না; আমি ডেভেলপমেন্ট একটিভিস্ট ফলে তা কখনো স্টাডি করি নাই এবং রিলিজিয়াস ডিবেটগুলোতে কখনো আমি নিজেকে এনগেজ করি নাই। ফলে এই ব্লগারদের পার্সোনাল লেখার মেরিট বা ডিমেরিট সম্পর্কে মন্তব্য করার ব্যাপারে আমি যথেষ্ট জ্ঞান রাখি না।

যাই হোক, দেখা যাক, তাহলে কেন বলছি, যদি কেউ অফেনসিভ কিছু লিখে লিবার্টির তত্ত্ব অনুসারে যে ব্লগারদেরকে ধরা হইছে তাদের অপরাধী বলা যাবে

না?

মিলের সেকেন্ড এক্সিওম বলছে, ইনডিভিজুয়াল যা ইচ্ছে তা করতে পারবে, এবং সেইটা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য না হলে তা আইনের মাধ্যমে বা সামাজিক ভাবে শাস্তিযোগ্য।

ধরে নিলাম একজন ব্লগার ব্লাসফেমাস কথা-বার্তা লিখছে, যেইটা আমাদের ইট পাথরের সমাজে সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য এবং হার্ম প্রিন্সিপল কিংবা অফেন্স প্রিন্সিপল অনুসারে শাস্তিযোগ্য।

এখন সামাজিক কর্তৃত্বের তত্ত্ব অনুসারে আমাদের কিন্তু এইটাও দেখতে হবে, কোন সমাজে তার লিখাটা লিখসে? তারা কি আমাদের ইট-পাথরের সোস্যাল-এর স্পেসে এ লেখাগুলো লিখছে?

এইটার উত্তর হইল, না। তারা লিখছে ভার্চুয়াল ওয়ার্লডের জন্যে।

ভার্চুয়াল ওয়ার্লড সম্পূর্ণ সেপারেট একটা সামাজিক প্রেক্ষাপট। সেইটার রিলেশনশিপ ডিফারেন্ট। সেইটার দাতা-গ্রহীতা ডিফারেন্ট। সেইটার গ্রহণযোগ্যতার সীমা এবং রাষ্ট্রের ভেতরে অবস্থিত সমাজের গ্রহণযোগ্যতার সীমা এক নয়।

ফলে আমাদের ইট-পাথরের সমাজের সামাজিক কর্তৃত্বে সমাজ যেইটা মেনে নেয় ভার্চুয়াল ওয়ার্লডের সামাজিক কর্তৃত্বে সেইটা কিন্তু এক্সেপটেবল হইতেও পারে। ফলে মিলের তত্ত্ব অনুসারে আজ ব্লগারদের কোন লেখা যদি ভার্চুয়াল ওয়ার্লড-এ অফেনসিভ না হয়ে থাকে তাকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভেতরের ইট-পাথরের সমাজের নিক্তিতে মাপাটা গ্রহণযোগ্য নয়।

কারণটা আবার বলছি। ভার্চুয়াল ওয়ার্লড-এ কি গ্রহণযোগ্য কি গ্রহণযোগ্য না, তার এক্সেপটিবিলিটি বাংলাদেশের সামাজিক স্পেস থেকে ডিফারেন্ট। তাই সামাজিক কর্তৃত্বের তত্ত অনুসারে একজন ব্যক্তি কিছু একটা লিখে অপরাধ করছে কি করে নাই তা সে যেই জগতে লিখেছে সেই ভার্চুয়াল জগতের গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে দেখতে হবে।

কিন্তু আবার, ভার্চুয়াল স্পেসেও যদি সেইটা গ্রহণযোগ্য না হয়ে থাকে এবং হার্ম বা অফেন্স প্রিন্সিপাল অনুসারে সেই স্পেসের মানুষদের জন্যে সেটা গ্রহণযোগ্য না হয়ে থাকে, একজন ব্লগার তার ব্লাসফেমাস লেখার কারণে শাস্তি পাওয়ার দাবি রাখেন। লিবারটি মানলে এইটা মানতে হবে।

এইখানে ক্রিটিক্যাল একটা বুঝার বিষয় হইল নেটের ব্লাসফেমাস লেখাগুলো মূলত ২০০৯ বা ১০-এর পূর্বেকার, যখন ফেসবুক মেইনস্ট্রিম হয় নাই।

তখন গুটিকয়েক মানুষ ব্লগ-এ বিচরণ করত। এই সময় নেট ছিল একটা আইসোলেটেড জায়গা। একটা লুনী মানিয়্যাক, কীবোর্ডের পেছনে বসে যা চাইত তা লিখতে পারত।

নেট ফানডামেন্টালি পরিবর্তন হয় যখন ফেসবুক আসলো। তখন নেটের বিচরণ হয়ে গেল সোস্যাল। মানুষ ঘুমাইতে গেলেও স্ট্যাটাস দিয়া যায়, আমি ঘুমাইতে গেলাম। সবকিছু হয়ে গেল পাবলিক। আমাদের লাইফ হয়ে গেল পাবলিক প্রপার্টি।

এখন কেউ একটা মুভি দেখলেও সারা দুনিয়ারে জানান দেয় দেখ, আমি আতেল, আমি এই মুভিটা দেখছি। ফলে, নেটের স্পেসটার অনেক এক্সপানশন হইছে গত তিন বছরে। নেট যখন সোস্যাল হয়ে পাবলিক স্পেস হয়ে গেল তারপর আমার জানামতে খুবই সীমিত পরিমাণ লোকজন তখন ব্লাসফেমাস লেখালেখি করছে।

পয়েন্টটা কি? পয়েন্টটা এতক্ষণ যা বলছি তাই? একজন যে হার্ম বা অফেন্স প্রিন্সিপল ভাঙছে কিনা তা যাচাই করতে তার সোস্যাল স্পেসটা কনসিডার করতে হবে।

এইটা কনসিডার করলে দেখবেন হাতে গোনা দুই-একজন এই ধরনের লেখালেখি করে। এবং সাথে আর একটা বিষয় কন্সিডার করতে হবে। সেইটা হল—যেহেতু কোনটা অফেনসিভ, কোনটা অফেনসিভ না, সেইটা এক এক জনের কাছে এক এক রকম সেইজন্যে, কোনটা ঠিক কোনটা ঠিক না সেইটাকে আইনের আওতায় আনতে হইলে সমাজকে এবং ইভেনচুয়ালি রাষ্ট্রকে সেইটা আগে থেকে ডিফাইন করতে হয়।

কিন্তু আমাদের সমাজ/রাষ্ট্র, এই ডেফিনিশনটা দেয় নাই এবং এখনো দিচ্ছে না। ফ্রি স্পিচের নামে এই ডেফিনিশন ক্রিয়েট করার পথে আরগুমেন্ট সৃষ্টি করা হচ্ছে যেইটা ফ্রি স্পিচেরই পরিপপন্থী।

ফলে, আপনি যেহেতু বাউন্ডারিটা ক্রিয়েট করেন নাই, তখন আপনি একজনরে ধরতে পারবেননা এবং ধরে জেলে ঢোকাতে পারবেন না। কোনটা অফেন্স এবং কোনটা অন্যায় সেইটা আপনাকে আগে ডিফাইন করতে হবে। নইলে আপনি

কিসের ভিত্তি কোন কাজটারে অপরাধ বলবেন?
আইনটা ভঙ্গ করেছে মূলত আমার দেশ
পিওরলি ওয়েস্টার্ন লিবারটিয়ান কনসেপ্ট এ, আমার দেশ কিন্তু প্রচণ্ড অপরাধী হয়ে দাঁড়ায়। কারণ ক্লিয়ারলি নেটের কোনাকাঞ্চিতে পড়ে থাকা কমিউনিটিতে অগ্রহণযোগ্য এবং মার্জিনালাইজড ব্যক্তিদের লেখাগুলো সামনে প্রথম পাতায় বড় বড় লাল কালি দিয়ে ছেপে দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে খেপিয়ে দেয়া ক্লিয়ারলি হার্ম প্রিন্সিপলের ভায়োলেশন হবে।
কারণ লেখাগুলো পড়লে লেখক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে এবং এই লেখাগুলো সামাজিক অস্থিরতা ছড়িয়ে দিয়ে সমাজকে ডিস্টাবিলাইজড করতে পারে এবং পরবর্তীতে তার থেকে বৃহৎ দাঙ্গাসহ আরো অনেক ক্ষতি হতে পারে যার ফলে অস্থিরতা থেকে মানুষের মৃত্যু হতে পারে। এইগুলো ডাইরেক্টলি হার্ম প্রিন্সিপল ভায়োলেশন।
তারা ভারচুয়াল সমাজের চিপা থেকে একটা আইটেম তুলে একটা পাবলিক সমাজে নিয়ে আসছে, যেইগুলো কোনোমতেই আমাদের ইট-পাথরের সোসাইটিতে গ্রহণযোগ্য না। আমার দেশ গ্রুপ তখন খুব বড় এই একটা অন্যায়ের জন্যে দণ্ডিত হওয়ার দাবি রাখে। কারণ তারা একটা জনগোষ্ঠীকে উসকানি দিচ্ছে, সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করছে।
আজ তাই আইন প্রয়োজন।
ঠিক এই পারস্পেকটিভ থেকেই আজ নেট ব্যবহারকারীদের জন্যেই রাসুলকে কটূক্তি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে একটা আইন থাকতে পারে। কারণ ফেসবুক আসার পর নেটের স্পেসটা সামাজিক স্পেসের সাথে মিশে গেছে। এখন আপনি যা ইচ্ছে তাই লিখলে অন্যদের অফেন্স হয় এবং ক্ষেত্রে বিশেষে হার্মও হয়।
আমার মনে হয় প্রবলেমটা আরো ডিপ।
বেসিক্যালি গত ১৫/২০ বছরে স্যাটেলাইট টিভির আগমনের পর আমরা একটা আনপ্রিসিডেনটেড সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মুখে পড়ছি। আমাদের সমাজে ২০০/৩০০ বছরে একটা টলারেন্সের চর্চা করে কী একসেপট্যাবল কি আনএকসেপট্যাবল সেই মাত্রাটা দাঁড়াইছে। কিন্তু হুট করে এখন টিভি দেখার সময় ক্যাটরিনা, মালাইকা আরোরার জাওয়ানি চলে আসতাছে, বডি স্প্রে অ্যাডের সময় গ্রুপ সেক্সের প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে। এইটা আমরা কোনো ডিবেটে

বাদ দিয়ে ঢুকতে দিছি।

এরপর এলো ইন্টারনেট। এইখানে একটা ফেইক নিক নিয়া যেখানে সেখানে যা ইছে তা বলা যায়। কারো পছন্দ হইল না, সে রাসুলরে নিয়ে, নেটের ইহুদি এবং খ্রিস্টান ক্রুসেড প্রপাগান্ডা পেজের রেফারেন্স কপি কইরা যা ইচ্ছা বলা শুরু করল।

এইটা আমাদের ফ্রিডম অব স্পিচের লিমিটটাকে টেস্ট করছে।

নাউ ওয়াট? উই হ্যাভ টু কনফ্রন্ট দিস। ডিনায়াল কোনো অপশন না, ডাকিং কোনো অপশন না, কল্লাকাটা কোনো অপশন না, ব্লগারদের গ্রেফতার কোনো অপশন না, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং ফ্রিডম অব স্পিচকে লিমিট করা তো কোনোমতেই অপশন না।

তাই একদিকে যেমন আমাদের ফ্রিডম অব স্পিচকে প্রটেক্ট করতে হবে, আরেক দিক থেকে আমাদের ফ্রিডম অব স্পিচের সীমানা নির্ধারণ করে দিতে হবে।

আমাদের সোসাইটির থিংকাররা যখন পশ্চিমা বিশ্বের ভ্যালুজগুলো ডাইরেক্টলি ইমপোরট করেন এবং সেইটারে ফ্রিডম অব স্পিচ বা ফ্রিডম অব এঙপ্রেশান বলে চালিয়ে দেন তখন কিন্তু তারা ফ্রিডম অব স্পিচের মূল টেনেন্টটাকেই বিরোধিতা করেন, না বুইঝাই।

কারণ তারা ওইটা করার সময় সামাজিক কর্তৃত্বের তত্ত্ব অনুসারে সোস্যাল কন্টেক্সটটাকে উপেক্ষা করেন এবং না বুঝে পশ্চিমা সোস্যাল কন্টেক্সটটাকে আমাদের মতো দেশে প্রয়োগ করতে জোরাজুরি করেন এবং হার্ম প্রিন্সিপল বা অফেন্স প্রিন্সিপল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ফলে যেইটা হয়, ওয়েস্টার্ন ভ্যালুজের ডাইরেক্ট প্রয়োগে সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়।

মিলের একজিওম দুইটার জনপ্রিয়তার অন্যতম একটা কারণ এইগুলো প্রাকৃতিক তত্ত্ব। এইগুলো কোনো আবিষ্কারকের উদ্ভাবনের ভিত্তিতে সোসাল এঙপেরিমেন্ট না। এইগুলো সোসাইটিতে মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে এক্সপেস্নইন করে মাত্র। তাই এইসব আইন আমেরিকাতে যেমন খাটে, বাংলাদেশের মতো আবদ্ধ দেশেও খাটে।

এইসব ন্যাচারাল ল’ কে বুঝতে পারার ব্যর্থতা এবং পাশ্চাত্য থেকে ডাইরেক্টলি

ভ্যালুজ ইমপোর্ট করে এবং ভারতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে বিনা বাধায় ঢুকতে দিয়ে যুগে যুগে গড়ে ওঠা ভ্যালু স্ট্রাকচার ভেঙে দেয়াটা আমাদের জন্যে যে কি ক্ষতি করছে এবং কী পরিমাণ অশান্তি এবং অস্থিরতার জন্ম দিছে তার চাÿুষ প্রমাণ ৬ এপ্রিলের বিস্ফোরণ।

আজকে তাই রাসুলকে নিয়ে কটূক্তি করাতে আইন সৃষ্টি করার প্রয়োজন খুব ক্লিয়ার। কিন্তু অবশ্যই সেইটা হেফাজতের দাবি অনুসারে নয় এবং আমাদের প্রয়োজন থেকেই।

হেফাজতিরা যে বলছে আল্লাহ খোদা নিয়ে কটূক্তি করলে, তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে, সেইটা স্টুয়ার্ট মিলের তত্ত্ব বাদ দিলাম ইভেন আমাদের শরিয়া পরিভাষায়ও গ্রহণযোগ্য নয়।

আমি আলোচনা করব, রাসূলকে নিয়ে কটূক্তি করে আইন সৃষ্টির সাথে সেকুলারিজমের সম্পর্ক কতটুকু আছে কতটুকু নাই। যারা গেল গেল বলে রব তুলছেন, তাদের জন্যে থাকবে ২০০৭ সালে, জার্মানি তে হলকাস্ট ডিনায়ালের কারণে এক ব্যক্তিকে ৫ বছরের জেল দেয়ার একটা রেফারেন্স। এবং ব্লাসফেমি আইনের অপপ্রয়োগ নিয়ে পাকিস্তানে মালাহি নামের এক বুদ্ধি প্রতিবন্ধি ১৪ বছরের ক্রিশ্চিয়ান কিশোরীর জেলে যাওয়ার পর বিশ্বব্যাপী নিন্দা হওয়ার বিবরণ। আমি আরো আলোচনা করব ইকুয়ালিটির সাথে রাসুলকে নিয়ে স্পেশাল আইন জারির একটা সত্যিকারের বিরোধ আছে এবং এই দ্বন্দ্বটা নিয়ে দ্বিতীয় কিস্তিতে বিশদ আলোচনা থাকবে।

কিন্তু, এই দ্বিতীয় কিস্তিটা আর লেখা হয় নি। সময়ের অভাবে।

হেফাজতের মুভমেন্টের পর ১১ এপ্রিল মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয় এবং আমার দেশ পত্রিকা সিল গালা করে দেয়া হয়।। কিন্তু, মাহমুদুর রহমান তখন সফলভাবে তার কাউন্টার মুভমেন্ট ছড়িয়ে দিয়েছেন।

আমি মাহমুদুর রহমানের কড়া সমালোচনা করেছি।। কিন্তু, আমার হিসেবে সেই সবের সর্বোচ্চ শাস্তি হচ্ছে, সেন্সিটিভ নিউজ প্রেস কাউন্সিলের মাধ্যমে সেন্সর করা। কিন্তু, সরকার এই ভাবে একটা প্রধান নিউজ পেপার বন্ধ করে দিতে পারে এবং একজন সম্পাদককে গ্রেফতার করতে পারে তা আমাদের জন্যে অচিমত্মনীয় ছিল।

চ্যাপ্টার ৩১. ৫ মে ঢাকা অবরোধ আর ৫ মে অপারেশনের রহস্য

হেফাজতের পরবর্তী মুভমেন্ট ছিল ঢাকা অবরোধের ঘোষণা: ৫ মে।

৫ মে হেফাজতের ঢাকা সমাবেশের আগে আর একটা ইম্পর্টান্ট ইস্যু ছিল রানা প্লাজার ধসে পরার ঘটনা যা ঘটে ২৪ এপ্রিলে। ফলে রানা প্লাজার উদ্ধার নিয়ে পুরো জাতি প্রায় ৭-৮ দিন মগ্ন ছিল।

১ মে হেফাজত হাঁক-ডাক দিতে থাকে যে তাদের দাবি মানতে হবে এবং এইবার তারা ঢাকায় কিছু একটা ঘটিয়ে দিবে।

এইটা বলার রাইট তারা পাইছিল, কারণ, তাদের ৫ এপ্রিলের ঢাকা লংমার্চ ছিল চরম সফল একটা মুভমেন্ট। ওইদিন তারা সরকারের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। তাদের জনসভায় যেই পরিমাণ মানুষ হইছে তা ৯০-এর আন্দোলনের সাথে তুলনীয়। এবং তাদের মিছিল পুরো ঢাকার রাস্তা জুড়ে ছিল।

ফলে সরকার মধ্যে একটা অস্বস্তি ছিল ৫ মে হেফাজত কি করবে।

এবং হেফাজত এই সময় একটা চরম কনফিডেন্সে চলে আসে। সোস্যাল মিডিয়াতে নিউজ আসে যে হেফাজতের লোক কিছু কিছু জায়গায় বাসে উঠে মেয়েদেরকে মাথায় কাপড় দিতে বলছে। কাপলদের জিজ্ঞেস আপনেরা কি জামাই-বউ নাকি? এইগুলো গুজব না সত্য তা ভেরিফাই করার উপায় নাই, কিন্তু এই আলোচনাগুলো আসছে এবং সমালোচিত হইছে।

এবং সরকার তখন অসম্ভব অস্বস্তি ফিল করতেছিল। প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে সেই অস্বস্তির পরিচয় দেখা দেয়, ৩ মে প্রধানমন্ত্রী হেফাজতকে সমাবেশ বন্ধ করতে আহবান জানান।

এই সময়ে কোনো একদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশ চলবে মদিনা সনদ অনুযায়ী। যেইটা আবার সোস্যাল মিডিয়াতে আলোড়নের সৃষ্টি করে। অবশ্য তা ঠিক ৩ মে নয় আরো আগে বলা হইছে। ৩ মে প্রধানমন্ত্রী হেফাজতের ১৩ দফা দাবির লিস্ট ধরে বলেন যে তারা এই ১৩ দফার অনেকগুলো বাস্তবায়ন ইতিমধ্যেই করছেন। বাকিগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে।

সরকার দৃশ্যতই নার্ভাস।

কারণ, ধর্মভিত্তিক দল অত্যন্ত সেনসিটিভ। এবং তাদের দাবির সূত্রপাত রাসুলের অপমান। এবং যেইটা একটা সত্য ঘটনা এবং যেই ইস্যুতে বিগত ৩ মাসে পুরো

দেশ ফেনিয়ে তোলা হইছে। সো, সরকার এই সময়ে খুবই সতর্কভাবে মুভ করে।

বিএনপি এই সময় একটা সুযোগ টের পায়। এবং সরকারের এই দুর্বলতাটাকে কেন্দ্র করে ৪ তারিখে ১৮ দলীয় জোটের সমাবেশে ৪৮ ঘন্টার আলটিমেটাম দেন খালেদা জিয়া। সেইখানে উনি দাবি দেন: নির্দলীয় সরকারের সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে আলোচনায় বসুন, অন্যথায় লাগাতার অবস্থান। বিএনপি সব সময় শাহবাগ হেফাজত সব কিছুর থেকে তাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবির লিভারেজ খুজে গেছে এই জন্যে এই পুরো সময়ে তারা প্রাসঙ্গিক হইতে পারে নাই।

৪ মে, রাত ১০ টায় আমার একটা স্ট্যাটাস ছিল এই রকম।

হেফাজতের ১৩ দফা দাবির মধ্যে আমি বাংলাদেশে পলিটিকাল ইসলামের উত্থান দেখি। হেফাজত ক্লিয়ারলি একটা পলিটিকাল ফোর্স, এবং তারা এইটা হাইড করে না। হেফাজতের নেতারা বিভিন্ন ফোরামে বলছেন তারা বাংলাদেশে ইসলামিক শাসন চান। এই চাওয়াটা কোন অন্যায় না। একটা ডেমোক্রেটিক দল যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক দাবি তুলতে পারে।

কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ যারা এত বছর ধরে ইসলামিক এবং ধর্ম ভিত্তিক পলিটিকসের প্রতি বিমুখ ছিল তারা হেফাজত এর পলিটিকাল ইসলাম এর প্রতি আকৃষ্ট হবে কিনা সেইটা একটা ইমপর্টান্ট প্রশ্ন।

প্রবলেম ইজ, বাংলাদেশের একটা বড় জনগোষ্ঠির সেই দাবির প্রতি একাত্ততা হওয়াটা এখন একটা রাজনৈতিক বাস্তবতা। বার বার ব্যান করার পরেও, ফেসবুকে বাঁশেরকেল্লার জনপ্রিয়তা এবং জাতীয়তাবাদী ফেসবুকারদের হেফাজতের সমর্থনে পোস্ট দেয়া এবং সেই সব পোস্ট এ হাজার হাজার লাইক সেই নির্দেশনা দেয়। ধরে নেয়ার কারণ আছে, ফেসবুকের থেকে গ্রাস রুট লেভেল এ হেফাজতের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি।

বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে ধর্মভিত্তিক রাজিনীতি এত দিনে কেন হালে পানি পায়নি, সেইটাই একটা অবাক হবার মতো বিষয়। দারিদ্র্য সব সময় মৌলবাদের জন্যে উপযুক্ত ক্ষেত্র। ধরে নেয়া যায়, এত কালের প্রধান ধর্মভিত্তিক দল, জামায়াতের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিতর্কিত ভূমিকা ধর্মভিত্তিক দলের উত্থানের বিরুদ্ধে একটা প্রটেকশন হিসেবে কাজ করেছে। তাছাড়া,

আমাদের বাঙালি জাতীয়তার বোধ, ধর্মের অনেক সামাজিক অনুশাসনের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়াতে, বাঙালি মানসে সব সময় একটা দ্বন্দ্ব কাজ করে। এই দ্বন্দ্বে আমাদের অভ্যাস গত চেতনায় ধর্ম পরিচয় থেকে, জাতীয়তার পরিচয় টাকে আমরা প্রায়শই প্রাধান্য দেই। ফর একজাম্পল, আমাদের দেশের যে নারীরা ৫ ওয়াক্ত নামায পরে, সেই নারী বিনা দ্বিধায় শাড়ি পরে সামাজিক ভাবে ঘোরা ফেরা করে, গোঁড়া মৌলবাদী বাদে তেমন কেউ এইটা এনটি ইসলামিক হিসেবে দেখেনা।

কিন্তু, মানুষের রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক সবগুলো চয়েসের একটা গোল আছে। তা হইল, পরিবার পরিজন সহ খেয়ে পরে, সুন্দর মতো বেচে থাকা এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু সেই মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে, তার কর্ম স্প্রিহার সব চেয়ে বড় বাধা হয়েছে দুই দল। এনাব্লার হওয়ার বদলে, তারা ছিল তাকে টেনে পিছিয়ে নেয়ার ভূমিকায়। দুই দুই বার দুই দল কে তারা টেস্ট করছে। গত ২০ বছরে, প্রতিটি সরকার তার আগের সরকার থেকে খারাপ হইছে।

এখন আমাদের দেশের মানুষ ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছে, তার যে চয়েসগুলো তার অবস্থার উন্নতি ঘটাবে এবং তার সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করবে বলে ভেবেছিল, সেই চয়েসগুলো শেষ পর্যন্ত তার উপর পলিটিকাল এলিট দের হাতে শোষণ নিশ্চিত করছে। ফলে এখন যদি সে যদি ডিফারনেট চয়েস নেয়, অবাক হওয়ার কিছু নাই।

তাই, গত ২০ বছরের, অভিজ্ঞতা থেকে কেউ যদি ধরে নেয়, আওয়ামী লীগ, বি এন পি, জাতীয় পার্টি এবং জামায়াত এবং কিছু বাম দলের এই পলিটিকাল ডাইনাস্টি মানুষ দাস খতের মতো মেনে নিছে, তো তারা ভুল করবে। বরং, এখন চেঞ্জ ইজ মাস্ট। কেও জানত না। হেফাজতের মতো দলের উত্থান হবে। কেও জানত না শাহবাগ এর মাধ্যেম তরুন মধ্যবিত্ত এই ভাবে তাদের ফ্রাস্ট্রেশান ভেন্টিলেট করতে জেগে উঠবে।। কেউ জানত না, শাহবাগ এই ভাবে বাংলা পরীক্ষার দিন বাংলা পরীক্ষা দেয়ার নামে নিজের স্কোপ এত সঙ্কুচিত করে ফেলবে।

হেফাজতের রাজনৈতিক শক্তি আজ একটা বাস্তবতা। তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাদের কত দূর নিয়ে যেতে পারবে, সেইটা সময় বলবে। কিন্তু, আমি নিশ্চিত

তারা অল্পে সন্তুষ্ট হবেনা।
তাদের উত্থান এবং হেফাজতের হাতে উগ্রপন্থী ইসলামিক রাজনীতির উত্থানের দায়, আজ আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির। এই অপরাধে আমাদের ইতিহাস পলিটিকাল এলিটদের প্রধান দুই নায়িকা, দুই দলের দুই নেত্রীকে ক্ষমা করবে না।

৫ মে কি হয়েছিল?

৫ তারিখে সারা দেশ টান টান উত্তেজনার মধ্যে ছিল।
হেফাজতের কর্মীরা সকাল থেকেই ঢাকায় পদব্রজে যাত্রা শুরু করে। আমার দেশের সংবাদে দেখা যায়, হেফাজতের প্ল্যান ছিল ৬ টি প্রবেশপথে অবরোধ করবে। শুরু করবে ভোর থেকে এবং দুপুরে বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে সমাবেশ হবে। সকাল থেকে তারা ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করে।
এই প্ল্যান অনুসারে দুপুর থেকে মতিঝিল এবং পল্টন এলাকায় হেফাজতের হাজার হাজার কর্মী জড়ো হয়। কখন কিভাবে সংঘর্ষের সূচনা হয় সেইটা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। কিন্তু দুপুর থেকে হেফাজতের কর্মীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে।
এবং পল্টন মোড় থেকে দৈনিক বাংলার মোড় পর্যন্ত ডিভাইডার ভেঙে রাস্তায় অবরোধ সৃষ্টি করে হেফাজতের কর্মীরা। এই সময়ে হেফাজতের সাথে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে।
পুরো রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় আগুন দেওয়া হয়। আশপাশের গলিতেও আগুন জ্বালায় হেফাজতের কর্মীরা। কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) কার্যালয়ে ও বেশ কিছুই বইয়ের দোকানে এবং রাস্তার পাশের খুচরা দোকানিদের টং এ আগুন দেয়া হয়। এইখানে পবিত্র কোরান পোড়ানোর ছবি নিয়ে পরে অনেক বিতর্ক হয়।
রাজধানীবাসীকে হেফাজতের পাশে দাঁড়াতে খালেদা জিয়া আহবান জানান: প্রথম আলো
এবং সারা দিন পুরো এলাকা রণক্ষেত্র হয়ে ছিল এবং সন্ধ্যার থেকে হেফাজতের কর্মীরা মতিঝিলে শাপলা চত্বরে অবস্থান গ্রহণ করে। এবং তারা ১৩ দফা দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত শাপলা চত্বরে অবস্থানের ঘোষণা দেয়। আওয়ামী লীগের

সাধারণ সম্পাদক ও এলজিআরডি মন্ত্রী আশরাফুল ইসলাম হেফাজতে ইসলামকে সন্ধ্যার মধ্যে সমাবেশ শেষ করে ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার ঘোষণা দিলেও তাতে কর্ণপাত করেননি হেফাজত নেতারা। বরং তারা বলেছেন, আগামীকালের মধ্যে আওয়ামী নেতাদের দেশ ছাড়তে হবে। (সূত্র: আমার দেশ)

সন্ধার সময় হেফাজতের মিটিং এ আল্লামা শফির যাওয়ার কথা থাকলেও তিনি যান নাই বা সংবাদমতে উনাকে যেতে দেয়া হয় নাই।

হেফাজতের উপর রাতে একটা হামলা হবে বলে গুজব ছড়িয়ে যায় সোস্যাল মিডিয়াতে।

সন্ধ্যা থেকেই পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি মতিঝিলে হেফাজতের সমাবেশের আশেপাশে অবস্থান নেয়।

রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহীউদ্দীন খান আলমগীর প্রথম আলো ডটকমকে জানান, সকালের মধ্যেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে: প্রথম আলো।

এবং রাতে হেফাজতের অবস্থানের উপর র‍্যাব, পুলিশ আর বিজিবির একটা যৌথ বাহিনী দিয়ে মতিঝিল এলাকার সব বাতি নিভিয়ে সংঘবদ্ধ ভাবে একটা অপারেশন করা হয়। এবং এই হামলায় হেফাজতকে শাপলা চত্ত্বর থেকে উৎখাত করা হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে ওই অভিযানের নাম দেয়া হয় ‘অপারেশন সিকিউরড শাপলা'। র‍্যাবের সাংকেতিক নাম ছিল ‘অপারেশন ফ্লাশ আউট’ এবং রাত চারটা ২৪ মিনিটে দিগন্ত ও ইসলামিক টিভির সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়া হয়।

প্রথম আলো বেশ কিছু রক্ত মাখা, মাটিতে পড়ে থাকা, নির্জীব আলেম ধরনের চেহারার আর জোববা পরিহিত যুবকের ছবি সোস্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে।

ফলে সকাল থেকেই সারা দেশে সোস্যাল মিডিয়া এবং নিউজ সাইটের ভিত্তিতে গুজব ছড়িয়ে পড়ে হেফাজতের উপরে হামলায় হাজার হাজার আলেম নিহত হয়েছে। ট্রাকে ট্রাকে লাশ সরানো হয়েছে।

কিন্তু যাই হোক ভোরের আগেই মতিঝিল খালি হয়ে যায়।

পরের দিন হেফাজতের নেতা বাবুনগরীকে গ্রেফতার করা হয়। এবং আল্লামা শফিকে পুলিশ প্রহরায় চট্টগ্রামে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এবং সরকার হেফাজতের

ঢাকা অবরোধ ক্লিয়ার করে।

বিএনপির দাবি করে, ওই রাতে আড়াই থেকে তিন হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে বলে তারা বিভিন্ন সূত্রে জেনেছে।

এই 'হত্যাকাণ্ড' শুধু ২৫ মার্চের সঙ্গেই তুলনীয়ঃ বিএনপি সুত্র প্রথম আলো

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাবি করেন একজনও আহত হয় নাই।

ফেরার পথে নারায়ণগঞ্জে ভোরে ব্যাপক মারামারি শুরু হয়। ২০ জন মারা যায়।

'ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার সিদ্ধিরগঞ্জ ও সাইনবোর্ড থেকে সানারপাড়-শিমরাইল হয়ে সোনারগাঁ উপজেলার কাঁচপুর পর্যন্ত পাঁচ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে তাণ্ডব চালায় হেফাজতে ইসলাম। তারা গাছ ফেলে সড়ক অবরোধ করে এবং হাইওয়ে পুলিশের ফাঁড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনা ও সড়কে আগুন দেয়। এ সময় পুলিশ-র‍্যাব-বিজিবির সঙ্গে তাদের সংঘর্ষে ২০ জন নিহত হন। আহত হন দেড় শতাধিক। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে পুলিশের দুজন ও বিজিবির একজন সদস্য রয়েছেন। প্রথম আলো'

হেফাজতের ৪০ কর্মী দুই দিনের রিমাণ্ডে: প্রথম আলো

হেফাজত পর্বের কাহিনী এইখানে শেষ।

কিন্তু কি হয়েছিল ৫ মে রাতে

হেফাজতের এই ঢাকা অবরোধ এবং মতিঝিল অপারেশনের সময় কি হয়েছিল সেইটা নিয়ে বিতর্ক এখনো চলছে এবং চলতেই থাকবে। এই ব্যাপারে এই ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এসেও সরকার অসম্ভব সেনসিটিভিটি দেখায়। অধিকার নামক একটি মানবাধিকার সংস্থা দাবি করে সেই রাতের অভিযানে ৬৪ জন মারা গেছে যেটা তারা নাম ঠিকানাসহ দিয়েছে। কিন্তু সরকার সেইটার ব্যাপারেও সেনসিটিভ এবং অধিকার-এর প্রধানকে এই লিস্টের জন্যে জেলের ভাত খাইয়েছে।

এইটা আমার অবাক লাগে। কারণ অধিকারের এর এই ৬৪ এর লিস্টটাও বাংলাদেশের অসংখ্য লোক মানে না। অনেকে মনে করে ৫০,০০০ লোক মারা গেছে। অনেকে বলে কয়েক হাজার। মূল বিষয়টা হচ্ছে ট্রাডিশনাল মিডিয়া যখন সম্পূর্ণভাবে সরকারি বশীভূত এবং যেহেতু সেই রাতে ইসলামী টিভি এবং

দিগন্ত টিভি বন্ধ হইছে এবং যেহেতু এই সময়ে আমার দেশ বন্ধ সেহেতু গুজবের উপরেই হেফাজতের মুভমেন্ট সমর্থকেরা নির্ভর করেছে। ফলে গুজবই এইখানে নিউজ।

ফলে যেইটা দাঁড়াইছে তা হলো, এই অপেরেশনটায় কতজন মারা গেছে সেইটা আসল প্রশ্ন না। প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি কি বিশ্বাস করেন। এবং আপনি যেইটা বিশ্বাস করেন সেইটা দিয়েই নির্ধারিত হয় আপনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে কোন পক্ষের লোক। এই নিয়ে একটা ছোট্ট কবিতা দিচ্ছি যাতে বিষয়টা বুঝতে পারবেন। কবিতাটার নাম, গুজবে বিশ্বাস করুন।

গুজবে বিশ্বাস করুন।

গুজব এখন নিজেই জলজ্যান্ত মিডিয়া—পুলিতজার প্রাপ্ত।
গুজব এখন নিজেই এম্বেডেড বা সিটিজেন জারনালিস্ট।
গুজব এখন কাল টাকায় গড়া ট্রান্সকম বা বসুন্ধরার থেকে বড় মিডিয়া হাউজ।
তাই ১০ হাজার ইউনিফরম যখন সমবেত হয়,
সাংবাদিকদের বলা হয় স্থান ত্যাগ করতে,
মাঝরাতে ছিনিয়ে নেয় ট্রান্সমিশান যন্ত্রপাতি—তখন গুজবই ভরসা।
গুজব এখন রাজাধিরাজ, সত্যের চেয়ে বড় সত্য।
এক পাল্লায় বিশ্বাস, আরেক পাল্লায় লাশ।
মেপে নিন আপনার বিশ্বাসের ওজন।
জেনে নিন আপনার পরিচয়।
কত আসলো ভাই?
২৫ হাজারে এ হেফাজত।
২৫০০ এ জামায়াত।
২৫০ এ নাগরিক।
২৫ এ ভারসাম্য রাখতে ব্যস্ত সুশীল।
শূন্যে জেনে নিন, আপনি একজন আওয়ামী লীগার।
তাই গুজবে বিশ্বাস করুন। গুজব শাশ্বত সত্য।
শুধু মিথ্যা,অজস্র ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থাকা রাবার বুলেটে বিদ্ধ দেহ।
শাপলা চত্বরে পড়ে থাকা কাফনে বাঁধা চারটা লাশ।
আর একটা পুলিশকে জড়িয়ে ধরে রাখা একটা নিটোল কিশোরের চোখের

সন্ত্রাস।

আমি আবার হেফাজতের এই অপারেশন সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে আমার ফেসবুক স্ট্যাটাস এবং নোটগুলোর সাহায্য নিব।

৫ মে অপেরেশন হবে সেইটা রাতে ঘুমানোর আগেই বিভিন্ন চ্যানেলে দেখেছিলাম। ফলে সকালে আমি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠি। এবং টিভি খুলে বসি। এবং সকালে কত জন মারা গেছে সেইটা নিয়ে আরো অনেক ইনফরমেশন বা গুজব জানার আগেই আমি এই স্ট্যাটাসটা দেই:

৬ তারিখে ভোরে আমি এই স্ট্যাটাসটা দেই।

গতকাল রাতে কি হইছে, তা এখনও সম্পূর্ণ ক্লিয়ার না। ট্রাডিশনাল মিডিয়া হেফাজতের ৪ এপ্রিল শো ডাউনের সময় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, আর রান্নার অনুষ্ঠান দেখিয়ে তাদের গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে।

অন্যদিকে হেফাজতের পক্ষের মিডিয়া দিগন্ত টিভি বন্ধ করে দিছে সরকার। ফলে এখন বোথ সাইড শুনে নিজের জাজমেন্ট করে নেয়ার উপায় আর নাই।

কিন্তু ফেসবুকে গুজব খুব গরম। কাল রাতে মতিঝিল এ কারেন্ট বন্ধ করে দেয়ার পর সব সাংবাদিক বের করে দেয়ার পর গুজব রটার পর—কি ঘটবে তা নিয়ে সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে।

সব সাংবাদিক বের করাটা ডেফিনিটলি গুজব ছিল।

ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি একটা ভাল ফুটেজ দেখাইছে, যাতে আক্রমণটা ক্লিয়ারলি বোঝা গেছে। কয়টার সময় বলতে পারব না কিন্তু ফুটেজটাতে দেখলাম একটা বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে দেখাচ্ছে—হাজার হাজার লোক শাপলা চত্বরে।

কিন্তু হঠাৎ শুরু হল ব্যাপক গোলাগুলি এবং দশ মিনিটে সব লোক পালিয়ে গেল। এরপর হেফাজতের লোকজন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এবং মেইনলি বড় বড় অফিস বিল্ডিংগুলোতে ঢুকে পড়ে। যাদের কে পুলিশ আলাদা আলাদা ভাবে টার্গেট করে। ভাল ফুটেজ দেখাইছে চ্যানেল আই। যাতে এম্বেডেড জার্নালিস্ট দের মতো অভিযান ডাইরেক্ট কাভার করে। তাতে দেখা গেছে পুলিশ পয়েন্ট ব্লাঙ্ক এ গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে হেফাজত কে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদ অনুসারে সকাল ৫ টা পর্যন্ত মারামারি হচ্ছিল। কতজন লোক মারা বা আহত হইছে, তাও ক্লিয়ার না। র‍্যাব কে বলতে শুনছি চার জন মারা গেছে।

ইন্ডিপেন্ডেন্টের রিপোর্টার বলছিল, সে আশেপাশের হসপিটালগুলোতে অসংখ্য মানুষ দেখছে। কিন্তু সবচেয়ে ইন্টেরেস্টিং হল, সেই রিপোর্টার বলছিল, আমাদের কে ওরা জোর করে ঢুকিয়ে বলছিল, আমাদের ভিডিও করেন— নইলে আটকে রাখব। সেই ভিডিও তারা দেখায়নি যদিও। শাপলা চত্ত্বর থেকে সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে এক রিপোর্টারকে দেখলাম মাটি তে হাত দিয়ে বলছে শয়ে শয়ে বুলেটের খোসা। সে মাটিতে হাত দিয়ে কিছু খোসা তুলল।
এই মুহূর্তে কে সংবাদটা ঠিক দিচ্ছে তা নির্ভর করবে আপনি কোন দল সাপোর্ট করেন তার উপর। বাঁশের কেল্লা দুই মিনিট পর পর স্ট্যাটাস দিচ্ছে। এবং হাজার হাজার মানুষের লাশ পড়ে আছে বলছে, কিন্তু সকালে লাইভ ভিডিও তে এমন কিছু দেখা যায়নি। মতিঝিল এখন সম্পূর্ণ কন্ট্রোলে আছে। আজকে অফিসে যাইতে পারবেন।
দিগন্ত টিভি ডেফিনিটলি গন। চ্যানেল ৭১ এবং দিগন্ত টিভির সংবাদকে যোগ করে, দুই দিয়ে ভাগ করে সত্য সংবাদটা জানার যে সুযোগ এত দিন ছিল তাও গেল।

কয় জন মারা গেছে সেইটা নিয়ে তখন বিভিন্ন রকম রিপোর্ট ভেসে আসছে।
৬ তারিখের সকালে আমার আর একটা স্ট্যাটাস:
দিগন্ত টিভি বন্ধ করে দেয়াটা, আওয়ামী লীগের জন্যে হিতে বিপরীত হবে। হেফাজতের পক্ষের মিডিয়া এখন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ফলে, এখন তাদের জন্যে গুজবটাই ভরসা। এবং এই গুজবগুলো তারা বিশ্বাস করবে, যা তাদের ক্ষোভ আরও ফেনিয়ে তুলবে। ৪৩১ একটা সংখ্যা এসেছে মৃত মানুষের সংখ্যা হিসেবে।
এইটাকে কে বিশ্বাস করবে কে করবে না তা নির্ভর করে একজন মানুষের ব্যক্তিগত অবস্থানের উপর। এবং ৪৩১ জন মৃত মানুষের এই ধারণাটা অনেক মানুষের মনে এস্টাব্লিশ হয়ে যাবে যা সামনে আরও অনেক সংঘর্ষের নৈতিক খোরাক জোগাবে।
সত্যিকার নিরপেক্ষ মিডিয়ার অভাব তীব্রভাবে অনুভব করছি। এইটা বোধ হয়, গরুর দুধের সিগারেটের মতো একটা অসম্ভব জিনিস।

৬ তারিখের আর একটা স্ট্যাটাস

ফেসবুকে বাঁশের কেল্লাসহ অন্যান্য ইসলামিক সাইটগুলোকে আমি লিস্ট করে ফলো করি। করতে হয়। সময়ের প্রয়োজনে। হেফাজত যখন ঢাকায় শো ডাউন করল সেইদিন সত্যি ঘটনা বুঝতে দিগন্তের উপর নির্ভর করতে হইছে। কারণ দিগন্তে দেখাচ্ছে লক্ষ লক্ষ লোক আর অন্যান্য সব মিডিয়াতে তখন দেখাচ্ছে রান্নার প্রোগ্রাম আর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। ট্র্যাডিশনাল মিডিয়া এখন সম্পূর্ণভাবে সরকারি ন্যারেটিভটা কোন ফিল্টার ছাড়া ঝেড়ে দিচ্ছে। আমরাও সেইটা খাচ্ছি এবং নিজের জাজমেন্ট ফর্ম করছি।

গতকাল রাতের ঘটনায় সব নিউজ বলছে, ৪/৫/১০ জন মারা গেছে। কিন্তু এই ইসলামিক সাইটগুলোতে সোনালি ব্যাংকের ভবনের ভেতরে এবং সামনে মাটিতে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকা অনেক ছবি দেখছি। যারা আহত না নিহত বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু মৃত মানুষের লাশের মতোই লাগছে। ফলে এই সংখ্যাটা ঠিক না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

এই দেশে তো এইটাই প্রথম অবস্থান দখল না, এইটাই প্রথম অবরোধ বা ভাংচুর না। কিন্তু এই দেশের নাগরিকের উপর ঢাকা শহরের বুকে রাতের বেলা নিয়মিত বাহিনীর মাধ্যমে কমান্ডো স্টাইলে হামলা চালিয়ে এইভাবে গুলি করে মানুষ মারা এই প্রথম। তার আগে হইছিল দেশ যখন ছিল পাকি বাহিনীর হাতে অবরুদ্ধ ২৫ মার্চ ১৯৭১—যারা এই দেশের নাগরিক কে মানুষ মনে করত না।

ছবিগুলো দেখে মনে হচ্ছে আহত-নিহতের সংখ্যা অনেক বেশি। নিজের আইডিওলজি অনুসারে যে যার মতো পক্ষ নিন। কিন্তু সময়, একাত্তরসহ অন্যান্য মিডিয়া যা দেখাছে, তা চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস কইরেন না। আর রাষ্ট্র যন্ত্রের হাতে নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীর এই রকম মানুষ হত্যা আর জখম করার বিপক্ষে থাকুন।

ইন্টেরেস্টিংলি ৫ মে রাতে কত জন মারা গেছে তা নিয়ে মানুষের অনেক আগ্রহ। এর কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা বলা কঠিন। কিন্তু ৬ এবং ৭ মে সারা দেশের হেফাজতের সাথে পুলিশের সংঘর্ষে ৪০ থেকে ৫০ জন মারা যায়। শুধু নারায়ণগঞ্জেই মারা যায় ২০ জন, সেইটা প্রথম আলোতে এসেছে নামসহ। এইগুলো নিয়ে কারো মাথা ব্যাথা নাই।

আলোচনা সমালোচনা চলতে থাকে। কিন্তু এইভাবেই হেফাজতের ঢাকা অবরোধের সমাপ্তি ঘটে। এবং টেকনিকালি মাহমুদুর রহমানের কাউন্টার বিপ্লবের একটা ইম্পর্ট্যান্ট ফেজের সমাপ্তি হয়।

রানা প্লাজার ধসে পরার ১৭ দিন পরে বিশ্ব রেকর্ড করে ১০ তারিখে রেশমা নামের একটি মেয়েকে পাওয়া যায়, যার পোশাক পরিচ্ছেদ নখের সাইজ সবই ছিল সন্দেহজনক। কিন্তু গোল্ডফিশ জাতি রেশমাকে নিয়ে মেতে ওঠে।

হেফাজত সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনাটা আমি এই নোটের মাধ্যমে শেষ করব।

চ্যাপ্টার ৩২. ক্ল্যাশ অফ সিভিলাইজেশান বা সভ্যতার সংঘর্ষে অসভ্যতার রাজনীতি—একটা বিশাল বিশাল ক্যাচাল।

৮ মে ২০১৩ রাত ১২:১৮ টা

একটা প্রেশার কুকারের সব সাইড বন্ধ করে দিয়ে আপনি যদি সেইটায় ক্রমাগত হিট দিতে থাকেন তো কুকারের ভেতরের জিনিসগুলো ক্রমাগত ফুটতে থাকবে। ফুটতে ফুটতে এক পর্যায়ে সেইটা প্রচণ্ডভাবে বিস্ফোরিত হবে। এমনকি বার্স্ট করার আগে সে যদি কোন একটা ফুটো পায় সেই ফুটো দিয়ে ঐ প্রেশারটা তীব্র বেগে বের হতে গিয়েও বিস্ফোরণ হতে পারে।

আর প্রেশার কুকারের ভেতরে যদি পানির বদলে পেট্রল থাকে তো সেই বিস্ফোরণ হবে ভয়াবহ। কারণ পেট্রলের দাহ্যতা অনেক বেশি কিন্তু স্ফুটনাঙ্ক অনেক কম।

তাদের সাথে কোন আলোচনা না করে তাদের কে এই ভাবে পিটিয়ে, গুলি করে, অজ্ঞাতসংখ্যক মানুষকে হত্যা করে, অসংখ্য মানুষকে মারাত্মক ভাবে আহত করে এই ভাবে বের দেয়া, এবং তাদের প্রতিনিধি মিডিয়া বন্ধ করে দিয়ে কমিউনিটি ব্লগ সাইট ব্লক করে ব্লগের অ্যাডমিনদের গ্রেফতার করে তাদের মতামত প্রকাশের সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে সরকার তাদের আরও খুঁচিয়ে তুলছে।

গত কয়েক মাসে ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীল এবং মৌলবাদী উত্থান এই বিস্ফোরণের সাথে তুলনীয়।

রিলিজিয়াস পিপলকে পৃথিবীর সব দেশে সেনসিটিভলি দেখা হয়, কারণ, ইনারা

বাই ডিফল্ট সেনসিটিভ মানুষ।

কিন্তু সমস্যা হইছে, এই মৌল জনগোষ্ঠীটাকে গত কয়েক বছর ধরে তেমন কোন বড় অপরাধ না করা সত্ত্বেও ক্রমাগত খোঁচানো হইছে এবং হইতাছে। যার ফলে তাদের একটা ক্ষোভ পুঞ্জিভুত হইছে। এবং যেইটার বিস্ফোরণ ঘটছে। আনফরচুনেটলি সেই বিস্ফোরণ কনটেন করার বদলে নিয়মিত আর্মড বাহিনীর ১০,০০০ সদস্য দিয়ে একটা রক্তক্ষয়ী অভিযানের মাধ্যমে আরও বেশি খোঁচানো হইছে এবং তাদের ক্ষোভ আরও বাড়িয়ে দেয়া হইছে যেইটা এই রাষ্ট্রকে সামনে ভয়ানকভাবে অস্থিতিশীল করবে।

আরব দেশ থেকে উদ্ভুত ইসলাম বাংলার বদ্বীপের নরম পলিমাটির জমিনে এসে অনেক নমনীয় একটা রূপ নিয়েছে।

আবহমান বাংলার সামাজিক অনুশাসন এবং সংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে মানুষকে কনভিন্স করতে পারার কারণে এই দেশে ইসলাম ৮০% মানুষের ধর্মে পরিণত হয়েছে।

ধর্মের সামাজিক অনুশাসন আর ধর্মের আত্মিক দিকটা কিন্তু এক নয়।

স্রষ্টার সাথে প্রার্থনার মাধ্যমে মানুষের যে স্পিরিচুয়াল কানেকশন হয় তাই ধর্মের মূল প্রণোদনা। সামাজিক অনুশাসনের প্রয়োগটা ধর্মের সেকেন্ডারি অবজেক্টিভ। রাসুল (সা.) আরব দেশে জন্ম নিয়েছিলেন বলে আরব দেশের অনেক সামাজিক নীতি ইসলামিক অনুশাসনে রূপ নিয়েছে। এই সামাজিক অনুশাসনের জায়গায় এসে এই দেশের ধর্ম প্রচারকরা বাংলার পীর-আউলিয়ারা অনেক অ্যাডজাস্টমেন্ট করেছেন যা আমাদের বাঙ্গালি পরিচয়ের সাথে ইসলামিক পরিচয়ের এর সম্মিলন করে একটা নতুন আইডেন্টিটির জন্ম দিয়েছে যাকে আমরা বলি, বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমান।

ধর্মের সাথে বাঙ্গালি মুসলমানের এই অ্যাডজাস্টমেন্টটা নির্দ্বিধায় সবাই মেনে নেয় নাই।

যারা ধর্মের মৌল বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেন যারা ধর্মের ব্যাপারে ১০০% অনড় তারা এই অ্যাডজাস্টমেন্টের মধ্যে একটা কনফ্লিক্ট দেখেন। এবং এই কনফ্লিক্টটা নিয়ে তাদের একটা ক্ষোভ আছে। এবং সমাজে ধর্মের সামাজিক অনুশাসনগুলোর স্ট্রিক্ট প্রয়োগের জন্যে একটা অ্যাকটিভিজম তারা করে আসছেন ৭০০ বছর ধরেই। এবং প্রায়শঃই তারা সামাজিক স্পেসে তাদের এই

এজেন্ডা নিয়ে মুখোমুখি হন এবং অনেক সময় তারা সমাজপতিদের ক্রীড়নক হিসেবে নিজের অবস্থান বেচে দিয়ে কিছু সাফল্য অর্জন করলেও বেশির ভাগ জায়গায় তারা ব্যাকফুটে।

কিন্তু ধর্মের মৌলিক বিষয়ে ১০০% কট্টর গোষ্ঠীরাও কিন্তু মেনে নিয়েছেন যে বাঙ্গালি মুসলমান একটা স্বতন্ত্র সত্তা যেইটা সময়ের সাথে টিকে গেছে। যেইটা নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করে লাভ নাই। কিন্তু তবুও তারা তাদের চাহিদা মোতাবেক একটা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন।

কিন্তু অত্যন্ত রক্ষণশীল সেই চাওয়া অর্জনের জন্য চরমপন্থা বা পৃথিবীর অনেক দেশের মতো সহিংস আচরণ তাদের মধ্যে কখনই দেখা যায়নি।

ফলে তাদের আন্দোলন অনেক অনেক লো এবং তাদের স্পিরিটও খুব লো। মনের বাসনা যাই থাকুক মূল জনগোষ্ঠীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই সামাজিক আন্দোলনটির তেমন সফল হওয়ার সম্ভাবনা না দেখার কারণে, তারা বেশির ভাগই ধর্মের স্পিরিচুয়াল দিকেই মনোনিবেশ করেছেন।

ফলে তারা নিজেদের মধ্যে একটা জগত গড়ে নিয়েছেন যাতে তারা অনুশাসনগুলো মেনে চলেন এবং সেই জগত সামগ্রিক সমাজের মধ্যে সহাবস্থানের সময় নিজস্ব আইডেন্টিটি মেইনটেইন করে। এই সুন্দর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বাঙ্গালি মুসলমান সমাজের একটা ইউনিক বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু তাদের প্রায়ই রাজনীতির মাঠে টেনে আনার চেষ্টা করে এক দিকে বিএনপি অন্য দিকে আওয়ামী লীগ আর সবার সামনে জামায়াত।

বিএনপির লাগে এই ধর্মীয় গ্রুপটাকে নিজের পক্ষে রেখে ভোটব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে। আর আওয়ামী লীগ যখন দুর্নীতি এবং গুন্ডামি তে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয় তখন এই চৌর্যবৃত্তিগুলোকে ঢেকে রাখার জন্যে একটা দ্বন্দ্বের প্রয়োজন পড়ে, চৌর্যবৃত্তিগুলোকে আড়াল করার জন্যে সব সময় তাদের একটা প্রতিপক্ষ লাগে। সেই দ্বন্দ্বটা হইল ধর্মীয় মৌলবাদ, প্রতিপক্ষ হইল ইসলামিস্টরা।

ফলে আওয়ামী লীগের লুটপাটতন্ত্রে যখনি চারিদিক সরগরম হয় তখনি চেতনা ব্যবসায়ীরা ইসলামিস্টদের ধরে টানটানি শুরু করে। অথচ আমার নিজস্ব অবজারভেশান হইল প্রচণ্ডভাবে প্রভোকড বা খোঁচানির মুখোমুখি না হলে তারা নিজস্ব জগত থেকে বেরিয়ে রাজনীতির জগতে আসার উচ্চাভিলাষ

কখনও খুব একটা দেখান নাই।
সামাজিক ইস্যুগুলো নিয়ে তাদের ক্ষোভ বেশি কিন্তু সেইটায় তারা পরাজিত পক্ষ এবং এইটা তারা মেনে নিছেন।
রাজনৈতিক বিষয়ে তারা দেশের উন্নয়ন দেখলেই খুশি হন, দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে পার্টিসিপেট করেন এবং দেশের ভালমন্দ নিয়ে আর দশটা নাগরিকের মতো উদ্বিগ্ন থাকেন। পার্থক্য হইল সরকার যখন সামাজিক ইস্যু নিয়ে আইন প্রণয়ন বা এই ধরনের কোনো কাজ করেন, তখন তারা তাদের ডেরা থেকে উঠে ডাক দেন মুভমেন্ট করেন। কিন্তু সরকার না মানলে হার মেনে নিজের ডেরায় ফিরে যান। আল্লাবিল্লায় মনোযোগ দেন।
তাদের এই আন্দোলনটা নন ভায়লেন্ট হওয়ার অন্যতম কারণ ডেমোক্রেসি এবং ফ্রিডম অব স্পিচ।
ডেমোক্রেসি বিল্টইন ভাবে এক্সট্রিমিজমকে চাপা দেয় এবং ফ্রিডম অব স্পিচ বিল্টইন ভাবে একটা অগ্রহণযোগ্যে আইডিয়া বর্জন করে। কারণ একস্ট্রিমিস্ট যখন দেখতে পায় ম্যাক্সিমাম জনগোষ্ঠীর কাছে তার আইডিয়ার কোনো বেইল নাই তখন সে ডিস্পিরিটেড হয়ে পড়ে।
এবং সে যখন তার আইডিয়া নিয়া জনগনের কাছে যাইতে পারে তখন সে একটা কন্টেস্টের মুখে পড়ে। এবং কন্টেস্ট হয়ে যখন আইডিয়াটা ফাইনালি বেইল পায় না তখন সেইটা বাতিল হয়ে যায়। এইটা সে মেনে নেয় কারণ আইডিয়ার গ্রহণযোগ্যতার এট্রিশান প্রসেস বা ধীরে ধীরে বাতিল হয়ে যাওয়ার প্রসেসটা তার চোখের সামনেই ঘটে।
মুক্তসমাজের প্রধান তাত্ত্বিক জন স্টুয়ার্ট মিল এইটা বলে গিয়েছিলেন,
'একজন ব্যক্তির যে কোন বিষয়ে আলোচনা করার, মতামত দেয়ার এবং পর্যালোচনা করার (এই যুগে বলবেন, ছবি আপলোড করার, ভিডিও দেখানোর, টক শো করার, এডিটোরিয়াল লেখার) সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকতে হবে, তা যতই অনৈতিক হোক। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে একটা যুক্তি তার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার সীমা পেরিয়ে তার যৌক্তিকতার শেষ সীমায় পৌঁছায়।'
এই ফ্রিডমটা যখন সমাজ অ্যালাউ করে তখন আর একটা কাজ হয়। একজন কট্টর রক্ষণশীলের মনের কষ্ট অটোমেটিক চাপা পইড়া যায়।
এইটারেই বলে ফ্রিডম অব স্পিচ। আমাদের দেশে ফ্রিডম অফ স্পিচ বলতে

বোঝানো হয় সুশীলদের নাটক, গান বা কবিতা লেখার অধিকার। কিন্তু একজন এক্সট্রিম রক্ষণশীল মানুষের এক্সট্রিম মত প্রকাশের অধিকারটাও ফ্রিডম অব স্পিচ, আমার দেশের যা ইচ্ছা লিখার অধিকারও যে ফ্রিডম অব স্পিচ, দিগন্ত টিভির নিজস্ব দৃষ্টিতে সংবাদ দেখানোর অধিকারটাও যে ফ্রিডম অব স্পীচ— সেইটা কিন্তু আমাদের মুক্ত চিন্তাওয়ালারা অস্বীকার করেন। অবশ্যিই তা যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজে হার্ম বা ক্ষতি না করে বা আর অফেন্স বা আহত না করে। এখন দেখা গেছে আমাদের দেশে কেউ যদি খিলাফত কায়েমের আলাপ করে তো সাথে সাথে একদল বলে উঠে, জঙ্গি, জঙ্গি, জঙ্গি। ধর! ধর! ধর! মার! জেল এ ঢুকা!

ফলে এমন একটা অবস্থা দাঁড়াইছে যে ধরে নেয়া হচ্ছে, আমাদের দেশে ধর্মীয় মৌলবাদীদের জন্যে ফ্রিডম অব স্পীচ প্রযোজ্য নয়।

কিছুদিন আগে ধর্মীয় মৌলবাদীদের ইন্টারনেটের ব্লগিয়ের স্পেস সোনার বাংলা বন্ধ করে দেয়া হইল। তার অ্যাডমিনরে গ্রেফতার করা হইল।

ধর্মীয় মৌলবাদীদের মধ্যেও শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সুশীল, কুশীল, এক্সট্রিম এবং লিবারেল আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে এনলাইটেন্ড অংশটা ব্লগিং করে। এদের আলোচনার স্পেসটাকে বন্ধ করে দেয়া হইল কোনো প্রতিবাদ ছাড়া। এই ব্লগের অ্যাডমিন মোহাইমেন কে গ্রেফতার করা হইল। কেউ প্রতিবাদ করল না। চারজন ব্লগারকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ইন্টারনেট সরগরম। কিন্তু কেউ বলে না ব্লগার কিন্তু গ্রেফতার ৫ জন এবং ফারাবিসহ অ্যাকচুয়ালি ৬ জন। ফলে বাংলাদেশে ইসলামিস্ট দের কাছে সিগনাল গেছে, তাদের জন্যে ফ্রিডম অব স্পিচ প্রযোজ্য না।

একই ভাবে তারা দেখছে, তাদের মতামত প্রকাশের স্পেস দিগন্ত টিভি এবং ইসলামিক টিভি বা আমার দেশ বন্ধ করা হইছে। তো দেখা যাচ্ছে সরকার ছলে-বলে-কৌশলে, ধর্মীয় রক্ষণশীল দের সকল মত প্রকাশের স্পেস কেড়ে নিছে এবং তাতে প্রগতিশীল এবং বাংলায় বাক প্রকাশের স্বাধীনতা বন্ধ হয়ে আফগান হয়ে যাওয়ার ভয়ে উল্লম্ফনকারী গোষ্ঠীর কোনো প্রতিবাদ নাই। এই ভণ্ডামিটা তাদের চোখে পড়ে।

এইটাতো ডাইরেক্ট দেখা গেছে। আর একটা জিনিস আছে, যেইটা দেখা যায় নাই। সেইটা হল, বাঙ্গালি সেকুলার মিডিয়ার ইনভিজিবল ফ্রিডম অব স্পীচ

সাপ্রেশান।

আমাদের মিডিয়া এখন সম্পূর্ণ ভাবে সরকারের বশীভূত। হেফাজত যখন ৪ এপ্রিল প্রথমবার নামলো সেইটা ছিল বিশাল একটা ব্যাপার। প্রায় ৫ থেকে ১০ লক্ষ লোক ঢাকায় মিছিল করছে। কিন্তু দিগন্ত টিভি বাদে প্রতিটা চ্যানেল, আই রিপিট, প্রতিটা চ্যানেল দেখাইছে নাটক, উচ্চাঙ্গসঙ্গীত আর শাবনুর আর সালমান খানের বাংলা সিনেমা। মিডিয়ার এই ধরনের একটা কালেক্টিভ ভণ্ডামি কিন্তু ফ্রিডম অব স্পীচের বড় একটা সাপ্রেশান। এত বড় একটা বিক্ষোভ হইল আর আপনি ন্যাশনাল মিডিয়াতে বলতাছেন কিছু হয় নাই, তখন কিন্তু আপনি যেই গ্রুপটাকে নিয়ে এত বড় একটা মিথ্যা কথা বলতাছেন তাদের এন্টাগোনাইজ করতাছেন। এবং এইটা যখন কালেক্টিভলি সবগুলো মিডিয়া করতাছে তখন তাদের এই ক্ষোভের লেভেলটা অনেক বড় থাকতাছে, কারণ, তারা রিয়ালাইজ করতাছে, একটা দুইটা মিডিয়া নয়, পুরো সিসটেম তাদের বক্তব্য সাপ্রেস করার কাজ করতাছে।

সেকুলার মেডিয়া তাদের কথা বলবে না আর তাদের রিপ্রেজেন্টিটিভ মিডিয়া কে সরকার বন্ধ করে দিবে—তাইলে তো তাদের যাওয়ার কোন জায়গা থাকতাছে না। এইটার ফলাফল এক্সট্রিমিজম। চরম এক্সট্রিমিজম। এবং এর ফলে সামনে যদি তারা রাস্তা ঘাটে ইরাক আর পাকিস্তানের মতো বম ফুটানো শুরু করে আমি অবাক হব না।

আর একটা ইম্পরট্যান্ট খোঁচানির পেরেক হইল যুদ্ধাপরাধের সাথে ইসলাম কে সংযুক্ত করা।

৭১ সালে আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যারা রাজাকার হইছিল তারা মূলত ছিল ২৫ থেকে ৩৫ বছরের। এদের অনেকেই ছিল চোর, ছ্যাঁচড় এবং নীতিনৈতিকতা বিবর্জিত মানুষ এবং গুণ্ডাপাণ্ডা। কিন্ত পরবর্তীতে এই রাজাকারের স্টেরিওটাইপ করা হইছে তা একজন টিপিকাল ইসলামিস্ট। কাদের মোল্লার যে ছবি আমি নেটে দেখি তাতে তার দাড়ি দেখি না। নিয়াজি বা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনার সাথে যেইসব রাজাকারের ছবি দেখি তাদের বেশিরভাগের কিন্তু দাড়ি দেখি না।

রাজাকারের পরিচয় আমাদের সমাজে অনেক বড় একটা স্টিগমা। আমাদের সমাজ রাজাকার ঘৃণা করে। এই দেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ বিপক্ষের শক্তি বলে

আসলে কিছু নাই। অল্প কিছু রাজাকার যাদের বেশির ভাগ এখন মরে গেছে তারা বাদে এই দেশের আপামর জনতা, ইসলামিস্ট নন ইসরামিস্ট সবাই দেশের মুক্তি চেয়েছিল। ফলে একটা মানুষ যার দাড়ি আছে যে একজন ইসলামিস্ট, কিন্তু তার ইসলামিস্ট পরিচয়ের জন্যে যখন তাকে রাজাকারের মতো একটা ঘৃণ্য ট্যাগ খেতে হচ্ছে তখন তার মধ্যে একটা প্রচণ্ড ক্ষোভ জন্মাচ্ছে, যারা তাকে ট্যাগিং করছে তাদের বিরুদ্ধে।

এইটা হওয়ার মুল দায় ৩০ লক্ষ মানুষের হত্যার দায় যাদের আছে সেই যুদ্ধাপরাধী দল—জামায়াতের।

মওদুদীবাদী জামায়াতে ইসলামী তাদের রাজনৈতিক অর্জনের জন্যে মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের হত্যাসহ অন্যান্য কাজে পারটিসিপেশানকে আড়াল করার জন্যে পরবর্তীতে ইসলামের রক্ষাকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়। এবং জামায়াত সব সময় দেখাতে চাইছে এই দেশের সকল ইসলামিস্ট জামায়াত সাপোর্ট করে। ফলে জামায়াত একটা পারসেপশান সৃষ্টি করে যে তার ভোট ব্যাঙ্ক অনেক বড়। এবং জামায়াতের এই ভোট ব্যাঙ্কটাকে পাওয়ার জন্যে প্রধান দুইটি রাজনৈতিক দল প্রায়শই তাকে কাছে টানে এবং দূরে ঠেলে। জামায়াতকে পক্ষে টানা না টানার সমীকরণে পরবর্তীতে ইসলামি রাজনীতির সকল পক্ষকে যুদ্ধাপরাধের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় বা এই ধরনের পারসেপশান তৈরি করা হয়। এইটার মাধ্যমে জামায়াত তার যুদ্ধাপরাধ ঢেকে রাখার জন্যে এবং রাজনৈতিক অর্জনের জন্যে বিশাল একটা ধূম্রজাল সৃষ্টি করে।

ফলে দেখা যাচ্ছে একজন মানুষ যদি ইসলামিস্ট হয় তাকে প্রথমে প্রমাণ করতে হচ্ছে, সে রাজাকার না। যেইটা একজন নন জামাতি ইসলামিস্টের জন্যে খুব অপমানজনক।

এই ডিভিশন সৃষ্টির আর এক নায়ক আওয়ামী চেতনা ব্যবাসায়ীরা।

তাদের কারণটা রাজনৈতিক। আওয়ামী লীগ যখন দুর্নীতি বা দুঃশাসনে সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা ক্যাডারদের সন্ত্রাসে জনপ্রিয়তা হারায় তখন এই ইস্যুগুলো ঢেকে রাখার জন্যে একটা ডিভাইড অ্যান্ড রুল গেমের প্রয়োজন হয়।

যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে বাঙ্গালির এই ক্ষোভটাকে টিকিয়ে রাখার জন্যে, লিগ একটা স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ শক্তির গেম খেলে। এই গেমটা যত ইন্টেনস হবে

তাদের দুর্নীতি ততই আড়ালে থাকবে। এবং জামায়াত যেহেতু ধীরে ধীরে বিলীয়মান একটা শক্তি সেহেতু এই খেলার অংশ হিসেবে—মৌলিক ইসলামে বিশ্বাসী সকল মানুষকে রাজাকার হিসেবে চিহ্নিত করে গেমের স্কোপটা আরেকটু বাড়ানোর প্রয়োজন পড়ে।

হেফাজত কিন্তু জামায়াত না এবং সকল ইসলামিস্ট দলও জামায়াত না। মওদুদীবাদী জামায়াতের সাথে কওমি মাদ্রাসা ভিত্তিক হেফাজতের একটা ট্রাডিশনাল বিরোধ আছে এবং আল্লামা শফি মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার হওয়ার কোন স্টিগমা নাই। কিন্তু ৫ মে রাতে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফকে বলতে শুনলাম, এরা সব রাজাকার। নইলে এদের বাপরা রাজাকার ছিল, বা যুদ্ধাপরাধী ছিল।

এইটা শুধু ৫ মে'র গেম না, অনেক পুরনো গেম। এইটাও আমাদের দেশে ইসলামিস্টদের ব্যাপক ক্ষুব্ধ করছে।

কিন্ত, তবুও তারা এই সব প্রোভোকেশনের মুখে চুপচাপ ছিল, নিজেদের মত থাকতো।

এই ঘুমন্ত ড্রাগন কে তার মূল ধরে টান দেয় মুলত এই আওয়ামী লীগ আর বিএনপির ক্ষমতার পলিটিকস।

এই গল্প সবার জানা। প্রথমে ৩০০ মানুষ কে হত্যার অপরাধ প্রমাণ হওয়ার পরেও কাদের মোল্লার আঁতাতের রায়। সেই রায়ের প্রতিবাদ করতে গুটি গুটি পায়ে মধ্যবিত্ত তরুণদের শাহবাগে আগমন। তারপর গণজাগরণ। তারপর পোষা বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে আওয়ামী লীগের শাহবাগ ছিনতাই। রাজীব হত্যা। রাজীব নিয়ে লাশের রাজনীতি। রাজীব কে দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহিদের মর্যাদা দান, রাজীব এর বাসায় প্রধানমন্ত্রী ভ্রমণ, তারপর থাবা বাবার ধর্মীয় বিদ্বেষপূর্ণ, ঘৃণ্য, ন্যাক্কারজনক লেখাগুলো কে নেট-এর কোনাকাঞ্চি থেকে বের করে আমার দেশ এবং মাহমুদুর রহমান কর্তৃক আলেম সমাজ এবং তৌহিদী জনতাকে খোঁচানো, এরপর রাসুল কে অপমানের প্রতিবাদে সারা দেশে বিক্ষোভ। সেই বিক্ষোভ থেকে ভাংচুর, লুটপাট, এমনকি জায়গায় জায়গায় হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলা, পুলিশ কর্তৃক পাখির মতো গুলি করে মানুষ মারা, এবং আরও বিক্ষোভ, ঢাকায় শো ডাউন, শো ডাউনে নবীকে কুৎসা রচনার শাস্তি দেয়ার আইন সৃষ্টি দাবির পাশে সামাজিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং

অন্যান্য আরও ১২ টা দাবি তোলা, তারপর ফলো আপ শো ডাউনে ৫ তারিখ রাতে ১০,০০০ পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবি দিয়ে অভিযানে অজ্ঞাত সংখ্যক মানুষের মৃত্যু ও আহত হওয়া। সবাই জানে এই গল্প।

আর এখন যেইটা ঘটতাছে তা পিওর প্রপাগান্ডা।

২৫০০ থেকে ২৫০০০ মানুষ মৃত্যুর যে দাবিগুলো উঠতাছে তা একটা চরম মিথ্যা বলে মনে হচ্ছে। প্রপাগান্ডাগুলো কিন্তু মানুষের মনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। নিরপেক্ষ মিডিয়া না থাকাতে মানুষ কি বিশ্বাস করবে বুঝতে পারছেনা। ফলে প্রপাগান্ডাকেই বিশ্বাস করছে। মিথবাস্টিং যা হচ্ছে তাতে অনেক মিসইনফরমেশান আছে। যেমন লাশের ওজন দিয়ে দেখানো হচ্ছে একটা ট্রাক এ ৫ টনের উপর ওজন নেয় না। কিন্তু বাংলাদেশে একটা এভারেজ ৮ টনি ট্রাক ১৪ টন টানে। ফলে কি কি বিশ্বাস করবে তা নির্ভর করছে কার পজিশন কি তার উপর।

কিন্তু বোঝার বিষয় যেটা তা হল এই পুরো ইভেন্টগুলোর মূল ইন্সটিগেটর আমার দেশ গ্রুপ বা মাহমুদুর রহমান কিন্তু ধর্মীয় মৌলবাদী না। ন্যাশনালিস্ট।

আমার দেশ এই গুটিটা চালছে বিএনপিকে শাহবাগ থেকে উদ্ভূত রাজনৈতিক বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে এবং বিএনপির রাজনৈতিক মিত্র জামায়াত রক্ষা করার জন্যে।

শাহবাগের ফলে যে গণজাগরণ হইছে তাতে বিএনপি বিপদে ছিল।

জামায়াতের মতো বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে তারা এলাই বানায়া ক্ষমতায় নিছে। এখন মধ্যবিত্ত যখন আনরিজারভেডলি জামায়াতকে প্রত্যাখ্যান করল, তখন বিএনপির স্ট্র্যাটেজি ছিল শাহবাগ কে বিপদে ফেলা। শাহবাগের নামে, কুৎসা রচনা করা, এবং শাহবাগকে নাস্তিকদের আন্দোলন হিসেবে দেখানো। অথচ শাহবাগ এমন একটা আন্দোলন যাতে আস্তিক, নাস্তিক, হিন্দু, মুসলমান, গরীব, বড়লোক, মাদ্রাসার ছাত্র, ইংলিশ মিডিয়ামের ইয়ো পোলাপান, গ্রামবাসী, প্রবাসী সবাই জয়েন করছে। শাহবাগ জামায়াতের অস্তিত্বকে কে প্রশ্নের মুখে ফেলে এমনকি বিএনপির ভেতর থেকেও জামায়াতকে দূর করার কথা উঠে আসে। কিন্তু বিএনপি সেই শুদ্ধিকরণের দিকে যায় নাই।

বরং বিএনপির মুখপাত্র মাহমুদুর রহমান ও আমার দেশ পত্রিকা শাহবাগ কে ডিলেজিটিমাইজ করার স্ট্র্যাটেজি নেয় এবং থাবা বাবার সুযোগ নিয়ে শাহবাগের

উপর নাস্তিকতার ট্যাগ লাগায়া দেয়, যেই পজিশনটা বিএনপির জন্যে কনভেনিয়েন্ট। বিএনপির রাজনৈতিক বেশ্যাবৃত্তির এই ফাঁদে ইউজড হইছে ধর্মীয় রক্ষণশীলেরা যাদের এখন আমরা হেফাজত হিসেবে চিনতাছি।

আমার দেশ এই যে কাজটা করেছে তা আমার মতে একটা চরম ইরেস্পন্সিবিলিটি।

যারা যারা এইটা অস্বীকার করেন তারা গত তিন মাসে নিহত ৩০০ থেকে ৬০০ মানুষের ফ্যামিলিকে গিয়া জিজ্ঞাসা করতে পারেন। রাজনৈতিক সুবিধা নেয়ার জন্যে দেশে এই রকম ভয়াবহ একটা অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করাটা অনেক মানুষকে জীবনের মূল্যে দিতে হইছে।

ঘটনা যা ঘটার তা ঘটছে। কিন্তু আপনি যদি হেফাজত বা তাদের সাথে অন্যান্য ধর্মীয় মৌলবাদীদের পারস্পেক্টিভ দেখেন তাইলে দেখবেন তাদের পয়েন্ট হইল,

কই, আমরা তো তোমাদের কোন ডিস্টার্ব করি নাই। তোমরা কত নাচ গান ফুর্তি কর—কই আমরা গিয়া তোমাদের বাধা দেই নাই। তোমরা তোমাদের মতো ছিলা, আমরা আমাদের মতো ছিলাম। এখন আমার নবীরে নিয়া কেন তোমরা এই ধরনের নোংরা কথা লিখলা। এরপর যখন শাস্তি দাবি করলাম, তোমরা কেন, আমাদের গুলি করলা। শেখ হাসিনারে নিয়ে কটূক্তি করলে জেল এ গিয়ে ডিম থেরাপি, আর আমার নবীরে নিয়া কটূক্তি করলে আমরা যদি শাস্তি চাই তো আমাদের উপর গুলি?

তাদের প্রাথমিক ন্যারেটিভ ঠিক এই রকম। সিম্পল।

প্রগতিশীল রাষ্ট্রের মুক্তবুদ্ধির চর্চার পারস্পেক্টিভে এই ন্যারেটিভ এ বেশ কিছু সমস্যা আছে। কিন্তু কথা হইল এইটা তো মুক্ত আলোচনার দেশ না। এইখানে কার্টুনে মখার ছবি থাকলে, মিছিল থেকে ধরে নিয়ে জেল এ নেয়া যাওয়া হয়। এই ধরনের রাসুলের নামে যাচ্ছে তাই কথা লিখে সামাজিক অশান্তি সৃষ্টি করাটা আইনের আওতায় আনতে সমস্যা কি? ফ্রিডম অব স্পিচের আওতায় অফেন্স প্রিন্সিপলে এইটাতে কোন দ্বন্দ্ব নাই।

কিন্তু ন্যারেটিভটা জটিল হয় আপনি যদি হেফাজতের তেরটা দাবি কে কনটেক্সটে নিয়ে আসেন।

প্রথমত তারা শুরু করছিল রাসুলের উপর খুবই নোংরা কথার শাস্তি দাবি করে,

কিন্তু এই সুযোগে তারা তাদের সকল মনোবাসনা দাবি করে ফেলছে। এবং ঢাকা শো ডাউনের সাকসেসের গরমে চরম রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ দেখাইছে। তারা এমনও বলছে যে ৫ তারিখের পর দেশ চলবে আল্লামা শফির কথায়। নিজের স্পেসটা থেকে এইভাবে বেরিয়ে এসে হঠাৎ এত উচ্চাভিলাষ দেখানোটা একটা হঠকারি সিদ্ধান্ত ছিল।

কিন্তু তাদের পর্যালোচনা করলে দেখবেন এরা মূলত প্রতিক্রিয়াশীল গ্রুপ। তারা ঘুমিয়ে থাকে। কিন্তু যখন ক্ষমতার ক্রীড়ানকরা তাদের নিয়ে নাড়া চাড়া করে তখনি তারা প্রতিক্রিয়া দেখায়।

এবং তাদের প্রতিক্রিয়া ব্রুট এবং ভায়োলেন্ট। তাই তাদের সেন্সিটিভলি দেখতে হবে। এবং তারা কি চায় সেইটাও একটু দেখা দরকার।

হেফাজতের ১৩ টা দাবিরে আমি তাই একটু পর্যালোচনা করব।

এই দাবিগুলোর মধ্যে দুইটা রাজনৈতিক।

২টা তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা করতে আইনি সংস্কার কামনা করে দাবি।

৫ টা তাদের নিজস্ব ধর্ম পালনের অধিকার সুরক্ষার দাবি এবং

৪ টা সমাজ সংস্কার করে সমাজের উপর তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ চাপিয়ে দেয়ার দাবি।

এই চারটি সামাজিক দাবিই কিন্তু ভণ্ড প্রগতিশীল এবং সত্যিকারে এর প্রগতিশীল উভয় এর মূল আপত্তির কারণ।

হেফাজতের প্রবলেম হইল তারা সামাজিক ভাবে তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে না পেরে রাসুলের-এর নামে আজে বাজে কথা বলাতে ক্ষুব্ধ মুসলমানদের ক্ষোভকে পুঁজি করে তাদের এত দিনের সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য এজেন্ডাকে বাস্তবায়নের আবদার করছেন।

ফলে যেই মানুষটা হেফাজতের মিছিলে গেছে রাসুল এর অপমান এর প্রতিবাদ জানাতে বা ফেসবুকে হেফাজত কে সাপোর্ট দিচ্ছে সেও বুঝতে পারতাছেনা যেই সব সামাজিক সংস্কারের দাবিকে সে সাপোর্ট দিচ্ছে—সেইগুলো সে কখনো নিজেই মেনে নেয়না। কারণ তার নিজের মা, বোন, স্ত্রী শাড়ি পরে ঘুরে বেড়ায়, নাক, কান, ফুটা করে, যেই কান ফুটানি অনুষ্ঠানে সে নিজেই পাড়ার লোককে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ায় মৌলভি দিয়ে দোয়া খায়ের করে।

হেফাজত বুঝতে চান না যে তাদের সামাজিক দাবিগুলোর আদায়ের দায়িত্ব

রাষ্ট্র কখনও নিতে পারে না। সমাজ যেইটা এত দিন ধরে যা গ্রহণযোগ্য মনে করে নাই এবং তাদের এত বছরের চেষ্টা সত্ত্বেও সমাজ যেইটা মেনে নেয় নাই, এখন হঠাৎ করে একটা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সুযোগ নিয়ে তারা এত বড় আবদার করে বসবে আর সেইটা মানতেই হবে তা কোনো যুক্তিপূর্ণ দাবি হইতে পারে না। আমি মনে করি এইটা তাদের বোঝানো অসম্ভব ছিল না।

কিছু আছে তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধের আইনি প্রতিরক্ষা কিছু আছে রাজনৈতিক। এইগুলোর ফ্রিডম অব স্পিচ এর হার্ম এবং অফেন্স প্রিন্সিপল এর আলোকে বিবিধ ইন্টারপ্রিটেশান আছে। ফলে কেন কোনোটা মানা যাবে না, তারও সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। আবার কোনটা যে একেবারেই মানা যাবে না তাও না। কারণ গত ২০ বছরে টেকনোলজির আগমন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তনের সাপেক্ষে কিছু আইন যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা এমনিতেই ছিল।

কিন্তু আমি অনেক সময় বুঝতে অক্ষম বাংলাদেশ রাষ্ট্রে কেন সংবিধান, নারীনীতি, শিক্ষানীতি, আমনীতি, জামনীতি এইসব বই এ কি লেখা আছে তা নিয়ে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যুদ্ধের ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়। এইসবে কি লেখা আছে তা দিয়ে কে কার গোপন চুল ছিঁড়ে।

এই দেশের সংবিধান আছে রাষ্ট্র প্রতিটা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, নিশ্চিত করবে—আর এই দেশে ক্ষুধার জালায় মা দুই সন্তানসহ মেঘনায় আত্মাহুতি দেয়। ছেলের স্কুলের খরচ দিতে না পেরে বাপ ছেলেকে ভিক্ষুক বানানোর জন্যে দা দিয়ে হাত কেটে দেয় আর সেই সময় শিশুটি প্রশ্ন করে, 'বাবা, আমি ভাত খাব কেমনে?'

তো এই সব নীতিতে কি লিখা আছে তা দিয়ে কি হয়? এই সব লিখা নিয়া এত মারামারির মানেটা কি?

আর তাদের নিজস্ব ধর্মীয় অধিকার রক্ষার যে চারটি দাবি তা ফ্রিডম অব স্পিচের টেনেন্ট মেনে অবশ্যি মানার বিষয়।

এইগুলো অধিকার-এর জন্যে যে তাদের দাবি তুলতে হচ্ছে তাতে বোঝা যায়, তাদের উপর রাষ্ট্রীয় ভাবে কিছুটা হইলেও প্রসিকিউশন হচ্ছে যা তাদের ক্ষুব্ধ করছে।

৮। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমসহ দেশের সকল মসজিদে মুসল্লিদের নির্বিঘ্নে নামাজ আদায়ে বাধা-বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা অপসারণ এবং ওয়াজ-

নসিহত ও ধর্মীয় কার্যকলাপে বাধা দান বন্ধ করতে হবে।
১১। রাসুলপ্রেমিক প্রতিবাদী আলেম-ওলামা, মাদ্রাসা ছাত্র এবং তৌহিদী জনতার ওপর হামলা, দমন-পীড়ন, নির্বিচার গুলিবর্ষণ এবং গণহত্যা বন্ধ করতে হবে।
১২। সারা দেশের কওমী মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক, ওলামা-মাশায়েখ এবং মসজিদের ইমাম-খতিবকে হুমকি-ধামকি ও ভয়ভীতি দানসহ তাদের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র বন্ধ করতে হবে।
তাই আমি মনে করি ওদের সাথে বসা সম্ভব ছিল। ওদের কে ম্যানেজ করা সম্ভব ছিল।
কিন্তু সবকিছু পলিটিকালি দেখতে দেখতে একটা ডিসিশানও অনেস্টির সাথে নেয়া হয় নাই। সব ছিল স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশান। কিন্তু আপনি একটা মানুষ রে প্রথমে ইগনোর করলেন, তারপর সে জাগল, আপনি তার ভাই ব্রাদারদের গুলি করে মারলেন। তারপর তার জনশক্তির ক্ষমতা এবং ক্ষমতার রাজনীতির হিসাব মিলানোর জন্যে তারে বললেন, আসো বসি, কিন্তু তার দাবি পইড়াও দেখলেন না। তারপর তার মিছিলে আরও গুলি করলেন, তাদের বিক্ষোভে ১০,০০০ আর্মড বাহিনী দিয়ে আপনি বৃষ্টির মতো রাবার বুলেট ছুঁড়ে অজস্র মানুষকে আহত করে তারে আরও খেপায় তুললেন। এরপর আপনি কি একসপেক্ট করেন? সে ভাংচুর করবে না?
এখন কি করণীয়? আমার মনে হয়, এখন একটা জিনিস করণীয়, সেইটা হইল, অনেস্টি, সততা এবং র‍্যাশনাল থিঙ্কিং।
সততা দিয়ে ওদের সাথে ডিল করেন, ওরা ওদের সিম্পল জীবনে ফিরে যাবে। ওরা পসিবলি আপনার এই শহুরে হাইফাই, পোসপাস, বারবি ডল, সেক্সি কনজিউমারিজম চায়ও না।
ওরা অবশ্যই ছেলে মেয়ে নিয়া আপনার আমার মতো সুন্দর সমৃদ্ধ জীবন চায়। কিন্তু পার্থক্য হইল ওরা আল্লার রাস্তায় থাকতে চায়। ওদের সকাল বিকাল গালি দেয়া, ছোট করে দেখাটা বন্ধ করেন। ওরা ওদের পথেই থাকবে। আপনার সুশীলতায় ডিস্টার্ব করবে না।
আর ওদের যদি অনেক অনেক দাবি থাকে, তাহলে রাসুল কে নিয়ে অবমাননার মুল দাবিটা নিয়ে ফ্রিডম অব স্পিচের পারস্পেক্টিভে আরো ডিটেইলসে যান।
আর বাকি দাবিগুলো নিয়ে ওদের বলেন, দেশের মানুষ না মানলে দেশের

মানুষের উপর এই সব দাবি চাপানো যাবে না। এবং সমাজ কে সংস্কার করা সরকারের দায়িত্ব না। সরকার এর দায়িত্ব দারিদ্র্য বিমোচন আর রাস্তা ঘাট বানানো। সমাজ যেই জিনিস মেনে নেয় নাই সেই জিনিস রাষ্ট্র কেমনে মেনে নিবে?

ওদের বলেন তোমাদের দাবি যদি দেশের উপর চাপাইতে চাও তাইলেও মানুষের কাছে যাও। তোমাদের দাবির সেই গ্রহণযোগ্যতা থাকলে মানুষ তোমাদের নির্বাচিত করুক।

অনেক সুশীল এখন মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণ চাচ্ছেন।

এইটা এত দিন চাওনের দরকার পড়ে নাই, কারণ, এর আগে মাদ্রাসার পোলাপান ঢাকায় আইসা সব কিছু ভাইঙ্গা দিয়া যায় নাই। কিন্ত যারা ৬ মের এই হত্যাকাণ্ড, সে ৮ জন হোক আর ৪০৮ হোক—জাস্টিফায়েড মনে করছে, সেই সব সুশীলের ওয়াজ-নসিহত কি তারা মানবে?

ওদেরকে বুঝতে হলে ওদের আশি টাকার বাটা সেন্ডেল পরে আপনাকে ওদের কাতারে দাঁড়াতে হবে, তাদেরকে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আপনার সমান অধিকার দিয়ে—তাদের চোখে দুনিয়াটা দেখতে হবে। সে আপনার কথা শুনবে। দেখবেন সে আপনার মতো একটা মানুষ যে সাকিব আল হাসানের ফ্যান, যার মধ্যে প্রেম, ভালবাসা, সেক্স, ক্ষুধা, নিজের পরিবারের প্রতি ভালবাসা, দেশপ্রেম, প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বাসনা—সব আছে। সে আল্লাহ প্রেরিত বর্বর কোনো জন্তু না।

কিন্তু কলোনির রুলারের ভাব নিয়ে নিজের কালচারাল ক্যাপিটালের উপর ভর দিয়ে এই সাবঅল্টারন জনগোষ্ঠীর উপর বর্বরতা দূরীকরণের যে ওয়াজ নসিহত আপনি করবেন তা তারা লাথি দিয়ে আপনার মুখের উপর ছুঁড়ে দিবে।

ওদের সাথে ডিল করার সময় রেসপেক্ট এবং অনেস্টি দুটোই লাগবে। আপনি যারে ফকিরনির পুত মনে করেন, তারও সেলফ রেসপেক্ট আছে। তার ইজ্জত ধরে খোঁচাখুঁচি করবেন না। এবং আপনি নিজেও র‍্যাশনাল হন, সৎ হন। এক এক সময় এক এক স্ট্র্যাটেজি তে গুটি চালবেন না। যদি র‍্যাশনাল হয়ে অনেস্টির সাথে ওদের ডিল করেন দেখবেন তার মধ্যেও র‍্যাশনালিটি আছে। এবং র‍্যাশনালি তাকে বুঝান, দেখবেন, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে।

তার আইডিওলজিকাল চাওয়া আড়াল করে এই দেশের দারিদ্র্য মুক্তির সংগ্রামে

সেও আপনার সাথে পার্টিসিপেট করবে, যদি সেইটা সত্যি আপনার চাওয়া হয়ে থাকে।
এই লেখাটা ছিল ঠাণ্ডা মাথায়।
কিন্তু রাগের মাথায় আর একটা স্ট্যাটাস দিছিলাম সেইটায় পুরো ব্যাপারের আর একটা সামারি আছে।

যেইটার প্রকাশকাল ৮ মে।
আজকে চরম মেজাজ খারাপ হইতেছে আমার। সবাইরে গাইলাইতে ইচ্ছে করতেছে এবং আমার টার্গেট ফেসবুকাররা।
প্রথমে আসি যারা সকাল বিকাল হেফাজত প্রেমে মশগুল। ভাই জান, ৫ মে রাতের ৯ মিনিটের একটা ভিডিও আছে, আর একটা ছাদের থেকে তোলা ভিডিও আছে। যেই দুইটাতে শাপলা চত্বরের অপারেশানের লাইভ সিন দেখা গেছে। এই দুটাতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, হাজারে হাজারে মানুষ মোটেও লাশ হইয়া পইড়া নাই। অপারেশানের গোলাগুলি শুরু হওয়ার সাথে সাথে বেশিরভাগ মানুষ পালায় গেছে। শুধু মাত্র সোনালী ব্যাংকের ভেতরে কয়েকটা মানুষ এবং দরোজায় একটা ছেলের লাশ দেখা গেছে। কিন্তু এইগুলো দেখা সত্ত্বেও ২৫,০০০, ৩০,০০০ মরছে বলে গুজব ছড়াচ্ছেন কেন। যদি সত্যি ঘটনা হয়ে থাকে তো মানুষগুলোর পরিবার হাজির করেন, ভোটার আইডি কার্ড দেখান! হেফাজত নিগৃহীত হইছে, টর্চারড হইছে। কিন্তু তাই বইলা মিথ্যা দাবি তোলার তো কোনো দরকার নাই।
আর এতগুলো আন্ডারএইজ মাসুম বাচ্চারে কি অধিকারে এই ধরনের সিচুয়েসানে এত রাতের বেলা এইখানে রাইখা দিলো তারা এবং নিজেরা পালায়া পালায় থাকলো। এইটাও তাদের কাছ থেকে জাইনা নিয়েন।
হিটলাসিনার সরকার শরমহীন, ফ্যাসিবাদ, দাঙ্গাবাজ, খুনে। কিন্তু হেফাজতের কাজ-কাম এমন কি আক্কেলওয়ালা যে তাদের সাপোর্ট দিতে হবে?
রাসুলের অপমান নিয়ে ঢাকায় শো ডাউন করল, এই চান্সে তুলে ফেলল বাংলারে আফগানিস্তান বানানোর দাবি। ৪২ বছরে যে সব দাবি নিয়া বাংলার মানুষেরর দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেইল পায় নাই, এক মাসে সরকার সব পূরণ করে দিবে? বাংলাদেশ কি মামাবাড়ি নাকি? এমন রিপোর্টও আসছে বাসের ভেতরে

ঢুকে মাথায় কে ওড়না দিছে, কে দেয় নাই তা পর্যন্ত চেক করা শুরু করছিল হেফাজতিরা।

নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করেন, দেশের জনগণ যদি ভোট দেয়, যদি খেলাফত-এ জনগণকে রে রাজি করাইতে পারেন তো মাইন্যা নিব। কিন্তু একটা দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ নিয়া সরকারের কাছে আমাদের হাজার বছর সংস্কৃতিরে পাল্টাইয়া সোস্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কৈরা বাংলারে তালেবান বানানোর এজেন্ডা দিবেন আর তা না মানলে সব ভাইঙ্গা পুড়ায়া ছারখার করে দিবেন—সরি এইগুলা কোনো শুভশক্তির কাজ না।

আর একটা কথা বলি। স্টেট একটা ইন্সটিটিউশান। রাষ্ট্র জনগণের জানমাল রক্ষার জন্যে ভায়লেন্স করতে পারে। এইটা রাষ্ট্রের ইন্সটিটিউশনাল রাইট এবং একটা জাস্ট রাইট। জালেম শাসক দিয়ে পরিচালিত হইলেও সেটাতে যে একটা ইন্সটিটিউশান এবং তার যে আইন শৃঙ্খলা আছে তা যে আপনারে মানতে হবে সেইটা হাদিসেও আছে। সেই ইন্সটিটিউশান ভুল করলে প্রতিবাদ করার অধিকারও আপনার আছে।

কিন্তু প্রতিবাদের অনেক ভাষা আছে। মতিঝিল, স্টেডিয়াম, পল্টন এলাকায় বইয়ের দোকান, ব্যাংক, এটিএম, সাংবাদিক গ্যালারি হতে শুরু করে—এমন কি কোরান মজিদ পর্যন্ত পুড়ায়ে ফেললেন। এইটা কোনো প্রতিবাদের ভাষা হইতে পারে না। জানি জানি। মাথায় ক্যাপ পরা লোকটারে দেখা গেছিল পল্টন এ আওয়ামী লীগের সাথে, এরপর অন্য জায়গায় সেই আবার ভাংচুর করছে। মানলাম। কিন্তু বাকিরা? হেফাজত এতো বড় একটা মুভমেন্ট করবে কিন্তু আন্দোলনের সময় ঘটা কোন ঘটনার দায়িত্ব নিবে না! সব দোষ আওয়ামী লীগের। এই সব গান বললেই মেনে নিবে এতো বেকুব হয়া গেছি সবাই!

এরপর আসেন আওয়ামী মাস্তানরা। আপনাদের লগে পাকিস্তানী খান সেনাদের পার্থক্য আর আপনাগো নেতার লগে ইয়াহিয়া খানের পার্থক্য দিনকে দিন কইমা যাইতাছে। সেই সেম স্টাইল। রাইতের আন্ধারে হামলা। পুরা এলাকার কারেন্ট নিভায়া ব্ল্যাক আউট করা অপারেশান। বাছ বিচারহীন গোলাগুলি। অপারেশনের ভিডিওতে ঠিকই দেখলেন কতগুলো মানুষরে মইরা থাকতে।

না কেউ মরে নাই। রাবার বুলেট এ মানুষ মরে না। যান না, একটা পুলিশের কাছে গিয়া বলেন, একটা রাবার বুলেট আপনার চোখের মধ্যে বা সেই জায়গায়

গুলি করতে। দেখেন নাকি মরেন কিনা। তারপর একটা স্ট্যাটাস দিয়েন কেমুন লাগছে। আমি লাইক দিব।

আর যারা একটু সুশীল তিনারা ৫০ জন পর্যন্ত মানুষের মরণ মানতে রাজি। লজ্জা লজ্জা! আপনারা বলেন নিজেরা প্রগতিশীল। আপনারা চান যুদ্ধাপরাধীদের বিচার? নৈতিকভাবে এতো পচা আর গান্ধা কোয়ালিটির মানুষ হয়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আন্দোলনের মতো একটা হাই মরাল ভ্যালুর আন্দোলনের লগে আপনাদের স্পর্শই তো গন্ধ ছড়াইতেছে। স্বার্থের গন্ধ আর আওয়ামী লীগের দুর্নীতির মসনদ টিকায়া রাখার গন্ধ।

নিরস্ত্র মানুষের উপর এইভাবে পয়েন্ট ব্লাঙ্ক এ বৃষ্টির মতো বুলেট মারে পৃথিবীতে একমাত্র দেশ—ইসরায়েল। সেইখানেও কোনো ফিলিস্তিনির মৃত্যুর পর নাম কা ওয়াসেত্ম হইলেও একটা তদন্ত হয়। আপনাদের মতো ৫০ জন মরছে বেশি মরে নাই বইলা তারা পাবলিক স্পেসে এ শীৎকার দেয় না। এই ধরনের পারভারটেড এবং পাশবিক আলাপ নিজেদের মেসেজে চালাচালি করেন, পাবলিক পোষ্ট এ দিয়েন না। ভণ্ডামির মুখোশ খুলে পড়ে।

রানা প্লাজার মরা মানুষের লাশের গন্ধ মিলায়া যায় নাই, চোখের পানি ফেলতে ফেলতে কম্পিউটার ভাসায়া দিছেন, কিন্তু এখনও যারা লেঙ্গা লুলা হয়ে বাইচ্চা আছে, তাদের বিকলাঙ্গ অবস্থায় চাকরি না করার টাইমে বাচ্চার খাওনের টাকা নাই। রামপালের কন্ট্রাক্ট ঠিকই সাইন হইয়া গেছে। ইম্পোরট কমে গ্যাছে ২৫%। গার্মেন্টসের ধস নামতাছে, নীরব রিসেশান চলতাছে সেই শেয়ার মার্কেট পড়ার পর থেকে। দেশে চাকুরি নাই। মানুষের কাছে টাকা নাই। এইটা সেই দেশ যেই দেশে স্কুলের বাচ্চারে টাকার অভাবে স্কুল থেকে সরায়া ভিক্ষুক বানানোর জন্যে বাপ হাত কেটে দেওয়ার সময় ছেলে বলে, বাবা আমার হাত কাটলে ভাত খাব কেমনে? কি শান্তির দেশ। কিন্তু এই সব অবস্থা পরিবর্তনে আন্দোলন নাই।

আমরা কি নিয়ে পইড়া আছি? তত্ত্বাবধায়ক, ফরহাদ মজহার, সাঈদী, হেফাজত, হাসিনা, খালেদা, তারেক জিয়া, মহিলা স্পিকার এই নিয়া।

শুনেন, আমাদের যে পরিণতি তার জন্যে জীবনেও ভাগ্যরে দোষ দিবেন না। আমরা যেমন মানুষ ঠিক তেমন আমাদের নেতা। ঠিক তেমন আমাদের আন্দোলন ঠিক তেমন আমাদের পরিণতি। এই সিচুয়েশন আমাদের নিজেদের

হাতে বানানো। এর দায় আপনের, আমার, সবার। এইখানে ভাগ্যের কোন হাত নাই।

চ্যাপ্টার ৩৩. সমাপ্তি

দীর্ঘক্ষণ আমার সাথে ছিলেন। এর জন্যে থাঙ্কস। আমি অনেক প্যাচাল দিছি। এর জন্যে সরি।

শাহবাগ থেকে হেফাজত এই বইটাতে আমি আর সামারি দিব না। কারণ শাহবাগ আর হেফাজত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের এতো সম্ভাবনা আর হতাশা নির্দেশ করে যে এর সামারি হয় না। কারণ, এইগুলো কোন উত্তর নয়। বরং প্রশ্নের শুরু। আমি তাই সামারি করতে অসমর্থ।

এই বইটা শেষ। কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগছে। খুব খুব খারাপ লাগছে। এই বইয়ের পদে পদে আমি মৃতের সংখ্যা উচ্চারণ করেছি। কিন্তু নাম নিয়েছি মাত্র একজনের। আর বাকি মৃতরা ছিল সংখ্যা। এতজন মানুষ এই এক বছরে মারা গেল। এদের মধ্যে অনেকেই পুলিশ, হেফাজতি, গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ বা শহুরে নিম্নবিত্ত—বাংলাদেশের শ্রমজীবী শ্রেণি। তাদের পরিবারের জন্যে মৃত্যুর কোনো সামারি হয় নাই। সেই মৃত্যুর দায় তারা এখনো বয়ে চলেছেন। হয়তো কারো, পিতা, কোন আদরের বোনের একমাত্র ভাই, হয়ত বাপ-মা হারা এক লাজুক নববধূর প্রিয় স্বামী।

এই বেঁচে থাকা মানুষগুলোর জীবনে কেউ সামারি করে পরিসমাপ্তি টানতে পারবে না।

ইতিহাসের রাজসাক্ষী হিসেবে আমি জানি, এই যে শাহবাগ এই হেফাজতের আন্দোলনের সবকিছু ছিল গুটি। যেই গুটির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই যে নির্বাচন হয়ে গেল সেই ২০১৪ সালে নির্বাচনের উপরে নিজের দলের কন্ট্রোল নেয়া যাতে ক্ষমতা দখল করা যায়। এই পুরো বছরে যা হয়েছে আওয়ামী লীগ যা করেছে মাহমুদুর রহমান যা ঘটিয়েছে—আমি ইতিহাসের রাজসাক্ষী হয়ে বলছি সব ফাও, সব ভূঁয়া। সব ছিল এই যে নির্বাচন হবে এইটাকে দখল করার এক একটা ঘুঁটির চাল মাত্র।

আমি ইতিহাসের রাজসাক্ষী হিসেবে বলছি, আমি যে সারা বছর বসে বসে

ফেসবুকে স্ট্যাটাস মারছি, সময় নষ্ট করছি মাত্র। আমার জীবনের সব চেয়ে ফালতু কাজ করে পার হওয়া বছর হচ্ছে ২০১৩। এই যে এতগুলো মানুষ মরেছে সবাই বিনা কারণে মরেছে। এদের মৃত্যুর এক টাকাও দাম নাই।
আমার তাই এই সামারি করতে ইচ্ছা হচ্ছে না। এবং খুব খারাপ লাগছে। আমাদের জাতির জীবনে ২০১৩ সাল একটা অশুভ সাল। শয়তানের সাল। শাহবাগ থেকে হেফাজত সব ছিল রাজাদের সিংহাসনের ঘুঁটি। আমরা সবাই শুধু ব্যবহৃত হয়েছি। আমি আপনি, শাহবাগ, হেফাজত সবাই। ইতিহাসের রাজসাক্ষী হিসেবে এইটাই আমার মূল্যায়ন।
এই সব আর বলতে ভালো লাগছে না। আমি বলেছি। বলে শেষ করেছি। এক দিকে লাভ হয়েছে। আর বলতে হবে না। কেউ যদি বলতে বলে, বলেন, শাহবাগে আপনি কি দেখেছেন? কেউ যদি বলে ৫ মের রাতে কি হয়েছিল? বইটা বাড়িয়ে বলে দিব, পড়েন, আমার বলতে ইচ্ছা করেছে না। এই সব বলার কোন মানে নেই। ফুটেন!
আমি যাচ্ছি। এবং যেতে যেতে আমার একটা ফেইসবুক স্ট্যাটাস শেয়ার করে যাই। এইটাই আমার লাস্ট আরগুমেন্ট:
যে আপনারে যা বোঝাক, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূল সমস্যা হইল এইখানে ১৬ কোটি মানুষের তুলনায় সম্পদ অনেক কম। এবং অনেক অনেক টাকা কামানো একটা কঠিন কঠিন কাজ। এমনকি যদি আপনার সম্পদ থেকে থাকে সেই সম্পদকে আপনার লোভের সীমানা পূর্ণ করে আরো পরিপূর্ণ করাটা আরো কঠিন কাজ। এবং একদল মানুষ রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে কোটি কোটি টাকা কামানোর একটা সহজ রাস্তা খুঁজে পাইছে। এইটা তারা কোনমতে ছাড়বে না। এবং লুটপাট করা ছাড়া এদের আর কোন স্কিল নাই।
ফলে এই রাষ্ট্র যন্ত্রের ক্ষমতা ছেড়ে দিলে তাদের আর কোন টাকা কামানোর রাস্তা নাই। তাই এরা সিস্টেম বের করছে কেমনে এই জাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব বাঁধিয়ে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি বজায় রেখে লুটপাটতন্ত্র চালায়া রাখতে পারে।
এই যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, স্বাধীনতার পক্ষ বিপক্ষ, মুজিব, জিয়া, ইসলামি জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি ইত্যাদি সেই চালের গুটি। এইটা দেশে অনেক লোক খায়। কারণ আমরা জাতিগতভাবে বলদ এবং বেঈমান।
এই উপমহাদেশকে ইংরেজরা রাজত্ব করছে বাংলাদেশের এই অঞ্চলের

মানুষের লোভকে ব্যবহার করে সর্বপ্রথমে এই অঞ্চলে ক্ষমতা দখল করার মাধ্যমে। মীরজাফর জগত শেঠরা কেউ নিঃসন্তান ছিল না, তাদের রক্ত আমাদের ধমনীতে প্রবহমান।

আমাদের মূল ইস্যু এখনো দিনের শেষে ঘরে চাল আছে নাকি আর মাথার উপরে ছাদ আছে নাকি আর ব্যাঙ্ক এ মেয়ের বিয়ে বা ভবিষ্যতের অসুখ বা অন্য দুর্ঘটনার চিন্তায় কিছু টাকা জমানো। এই সব হেফাজত, জামায়াত, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, স্বাধীনতার ঘোষক জাতীয় কোনো আলোচনা কখনো আমরা দিনের শেষে স্ত্রীর সাথে, বন্ধুর সাথে, পিতার সাথে বসে করি না। আমরা চিন্তা করি কেমনে ফরমালিন মুক্ত খাবার খেতে পারব, কোন বাজারে দাম কম পাব, কোন হাসপাতালে চিকিৎসা ভালো পাব, কোন স্কুলে বাচ্চাকে দিব, কেমনে আরো বেশি টাকা কামাতে পারব যাতে ব্যাঙ্ক এ বিপদের সময়ের জন্যে কিছু সেভিং থাকে। এই চিন্তাগুলো করতে করতে আমরা বুঝি আমাদের সম্ভাবনা কিভাবে রাজনীতিবিদেরা কেড়ে নিচ্ছে।

একদল মানুষ তাই আমাদের এজেন্ডাকে পরিবর্তন করতে চায়। তাই ৭১ টেলিভিশনে সারাদিন গুজগুজ ফুসফুস করে ষড়যন্ত্রতত্ত্ব আর চেতনাতত্ত্ব আর ইন্ডিয়া আমেরিকা তত্ত্ব গাইতে থাকে যাতে আমরা সেইগুলোতে মজে থাকি।

আর লুটেরারা হাসতে থাকে। হাসতে থাকে। এই জাতিকে কিভাবে ছাগলের মতো বিভ্রান্ত করে, কি আরামে কোটি কোটি টাকা লুটপাট করছে সেইটা চিন্তা করে হাসতে হাসতে ওদের পেটে খিল ধরে যায়।

আর আমরা নিজেদের মধ্যে কাইজ্জা করে মরি। কারণ আমাদের শরীরে হয় মীরজাফর নয় রাজবল্লভের রক্ত প্রবাহিত হয়।

ভালো থাকবেন। আপনার সময় যদি নষ্ট করে থাকি তার জন্যে সরি। বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে স্রষ্টা সঠিক পথে নিয়ে আসুক। এই কামনা করে বিদায়।

হাস্তালা ভিসতা!

জিয়া হাসান।

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

True peace is not merely the absence of tension: it is the presence of justice.—Martin Luther King